ফলকর

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে
Late Superintendent of Gardens, Raj Durbhanga
Nizamat State Gardens, Murshidabad;
'Chaluvamba Vilas' Park, Mysore;
formerly of the Cossipur
Horticultural Institu
tion, Calcutta.

প্রণীত।

ভূমিকা

'ফলকর' পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বিংশতি বৎসরাধিক পূর্ব্বে ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম হইতে বর্ত্তমান সংস্করণ পর্য্যন্ত ইহা ১৪ ফর্ম্মার মধ্যে আবদ্ধ। সংস্করণ সমূহে কিছুই সংযোজিত করিতে কিম্বা পরিবর্ত্তন করিতে পারি নাই। বর্ত্তমান সংস্করণে অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইল, অনেক নূতন তথ্য সংযোজিত হইল। তথাপি সঙ্কল্পানুরূপ হইল না। কার্য্যক্ষেত্রে থাকিয়া মানুষ যত অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে ততই তাহার সূক্ষ্মদর্শন গভীর হয়, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। একটী প্রবাদ আছে যে, শতমারী বৈদ্যঃ, সহস্রমারী চিকিৎসকঃ। ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য। গ্রন্থকার ভরা-যৌবনে কৃষি ও উদ্যান চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়া ত্রিংশাধিক বৎসরকাল তাহাতেই অবিচ্ছিন্ন-ভাবে অতিবাহিত করিয়াছেন, সুতরাং বহুভ্রমণ, বহুদর্শনজনিত অভিজ্ঞতা যে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণ সকলের সহিত বর্ত্তমান সংস্করণের তুলনা করিয়া তিনি নিজেই তাহা উপলব্ধি করিতেছেন। কিন্তু পুস্তকের কলেবর এত অধিক বাড়িয়া গেল যে, অনিচ্ছা সত্ত্বে তাহা শেষ করিতে বাধ্য হইলেন।

কলিকাতা, গ্রন্থকারস্য।
শ্রাবণ, সন ১৩২১ সাল।

সূচীপত্র

ফলকর

প্রথম অধ্যায়

ফলকর আওলাত কেন ?

কার্য্যবিভাগানুসারে কৃষিমধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু বিভাগ আছে। ধান্য-গোধূম দাল-কলাই প্রভৃতি বহুবিধ শস্যের আবাদ হইতে আমাদিগের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য পরিধেয়ের ব্যবস্থা হইয়া থাকে বলিয়া এই বিভাগীয় কৃষি সমধিক প্রয়োজনীয়। অতঃপর নানাবিধ তরিতরকারী ও কন্দ-মূলাদি উৎপাদন করিয়া আমরা নিত্য ভোজ্য দ্রব্যের প্রকার বৃদ্ধি করি, সুতরাং ইহাকে দ্বিতীয় বিভাগ মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। প্রথম বিভাগ কৃষকদিগের প্রকৃতির অনুরূপ বলিয়া উহা কৃষক শ্রেণী মধ্যে আবদ্ধ। শেষোক্ত বিভাগের কার্য্য প্রণালী স্বতন্ত্র বলিয়া উহা উদ্যানকের হস্তগত কিন্তু তাহা হইলেও উক্ত বিভাগে গৃহস্থেরও অধিকার আছে।

অতঃপর ফলকর। ফলের উপাদেয়তা ও উপকারিতা আছে। ইহার জন্য সমধিক শ্রম বা ব্যয় নাই। এই কারণে ধনী নির্ধন

সকলের অঙ্গিনায় আনাচে-কানাচে, খিড়কীতে ও বাগিচায় ২।৫ টী আম, কাঁঠাল, নারিকেল, কদলী প্রভৃতি ফলের বৃক্ষ স্থান পাইয়া থাকে।

অনেক দেশে ফল-পাকুড় সহজে উৎপন্ন হয় না। সে সকল দেশে ফলের মূল্য অধিক, ফলতঃ সর্ব্বসাধারণের পক্ষে তাহা বিলাস দ্রব্য স্বরূপ। ভারতবর্ষের ন্যায় বিবিধ আবহাওয়ার দেশে শত শত প্রকার ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং এত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, রাশি রাশি ফলের ব্যবহার হয় না, গাছতলায় পড়িয়া নষ্ট হয়। ভারতে যত প্রকার ফল জন্মে, তাহাদের মধ্যে কয়েক প্রকার ফল যথা,—আম, কাঁঠাল, নারিকেল, কদলী,—ধান্য গোধূম, মাড়ুয়া, মকাই প্রভৃতি প্রধান খাদ্য শস্যের সমশ্রেণীর অন্তর্গত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে দ্রব্যের দ্বারা উদর পূর্ণ হয়, ক্ষুধা তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় এবং সেই সঙ্গে শরীরের পুষ্টি সাধিত হয় তাহাই অন্ন। অজন্মার দিনে অনেক গরীব-গৃহস্থ কয়েকটী আম্র বা কদলী, কয়েক কোষা কাঁঠাল কিম্বা একটী নারিকেল ভক্ষণ করিয়া সচ্ছন্দে দিনপাত করিতে পারে। এইজন্য এগুলি গৃহস্থপোষা আওলাত। কেবল তাহাই নহে। ফলভক্ষণে স্বাস্থ্যের উপকার হইয়া থাকে। পীড়িতাবস্থায় অন্নব্যঞ্জনাদির ব্যবহার নিষিদ্ধ কিন্তু ফলভক্ষণে নিষেধ নাই, উপরন্তু সে সময়ে অন্নাধিক ফলই ব্যবহার্য্য কারণ উহা মুখরোচক, কোষ্টবদ্ধতা নিবারক ও শোণিতশোধক। কিছুদিন গত হইল আমি মাসাধিককাল ফলমূল ভক্ষণ করিয়া দিনাতিপাত করিতাম তাহাতে শরীর ভালই ছিল। আজকাল এই মহার্ঘ্যের দিনে কলিকাতা সহরে উদর পুরিয়া ফল ভক্ষণ করা বহু ব্যয়-

সাধ্য ব্যাপার। কতকটা সেই জন্য, এবং কতটা অভ্যাস ধাতুগ্রস্থ হইবার ভয়ে ফল ভক্ষণ বন্ধ করিতে বাধ্য হই।

পল্লীগ্রামে সকল গৃহস্থের অল্পাধিক ফলের গাছ আছে। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা সহরের অনেক বাড়ীর খীড়কিতে বাগান ছিল, তাহাতে নানাপ্রকার ফলের গাচ স্থান পাইত, —কোন কোন বাড়ীতে আজও তাহার নিশানা দেখিতে পাওয়া যায়।

ফলের গাছপালা পল্লীগ্রামবাসীর বিশেষ আওলাত মধ্যে পরিগণিত। তাহা ব্যতীত উহা একটী নির্দ্দিষ্ট আয়ের পথ। গৃহস্থ বাড়ীতে অল্পাধিক ফলের গাছ থাকিলে আর্থিক লাভ আছে, অধিকন্তু ইচ্ছামত ফলপাকুড় ভক্ষণ করিবার সুবিধা হয়। এবিষয়ে সহরবাসী অপেক্ষা পল্লীগ্রামবাসী অধিক ভাগ্যবান। সহরবাসীকে সকল প্রকার ফল-মূল বা তরিতরকারী ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিতে হয় এইজন্য সহরবাসী ইচ্ছা করিলেই ফল ব্যবহার করিতে পারে না, তবে ধনীদিগের কথা স্বতন্ত্র। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রন্থকারের কলিকাতাস্থ প্রাচীন বাসভবনের বৃহৎ অঙ্গিনায় এবং খীড়কির বাগানে আঁম নারিকেল, কদলী, পেয়ারা, লেবু, জাম প্রভৃতি বহুবিধ ফলকর গাছ ছিল। সে সকল গাছের ফল ক্রয় করিতে হইত না, অথচ বাড়ীর মধ্যে সহজ প্রাপ্য ছিল। এই দুই কারণে আমরা যথেষ্ট ফল ভক্ষণ করিতে এবং প্রতিবেশীদিগকে বিতরণ করিতে পারিতাম। সে একটা সুখের দিন ছিল কিন্তু এখন সে রাম নাই, সে অযোধ্যাও নাই, কারন এখন বাড়ী ছোট, কোন গতিকে মন্ত্র করিয়া বাস করা যায়। আমরা বাল্যকালে যত ফল ভক্ষণ করিতে পাইতাম, আমা:

সন্তানসন্ততি তাহা পায় না। সহরে যে এত রোগের প্রাদুর্ভাব, তাহার অন্যতম কারণ ফলের অভাব।

তরিতরকারি অগ্নিতে পাক করিয়া ব্যবহার করিতে হয়, ফলতঃ তাহাদিগের মধ্যে যে দ্রব্যগুণ বিদ্যমান, তাহার অনেকটা নষ্ট হইয়া যায় কিন্তু ফল সম্বন্ধে সে কথা নহে কারণ ফল মাত্রই সদ্য ভক্ষণীয় সুতরাং ফলের তাবৎ গুণই আমরা উদরস্থ করিবার অবসর পাই।

আমরা কখন কখন আম্র বা কুলের অম্বল করিয়া খাইয়া থাকি, তাহা স্বাভাবিক নহে, তাহা আম ও কুলের প্রতি জুলুম। মহীশূরে অবস্থান কালে নানাবিধ ফল যথেষ্ট পাওয়া যাইত, পিয়ার, নাশপাতিরও অভাব ছিল না সুতরাং আলু বা উচ্ছে-ভাতের ন্যায় নাশপাতি-ভাতেও খাইয়াছি—ইহা নাশপাতির উপর জুলুম ভিন্ন আর কি?

গৃহস্থবাড়ীতে ফলকর বৃক্ষগণ যে কেবল ফল প্রদান করিয়া গৃহস্থের রসনা পরিতৃপ্ত করে তাহা নহে, ইহারা প্রকারান্তরে গৃহস্থকে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে—এই জন্য ফলকর বিভাগের প্রায় তাবৎ বৃক্ষই আয়কর এবং স্থায়ী আওলাত। ইহারা যে পরিমিত স্থান টুকু অধিকার করিয়া থাকে, তাহার অনুপাতে ইহারা প্রতিবৎসর যে ফল প্রদান করে তদ্দ্বারা গৃহস্থের যথেষ্ট আর্থিক উপকার হয়। ইহারা গৃহস্থের নাতোয়ান প্রজা নহে। ইহারা খাজনা টেক্‌স ও চৌকীদারী দিয়া গৃহস্থের সম্পত্তি রক্ষা করে। তাহা ব্যতীত, ইহাদিগকে একজন রোপণ করে কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী ৩৪ পুরুষ তাহাদিগের ফল ভোগ করে। যে গৃহস্থ বাড়ীতে কিম্বা

বাগান-বাগিচায় অল্লাধিক ফলকর আওলাত আছে সে জমির মালিককে খাজনা-টেক্স কিম্বা তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে ব্যয় তাহা অন্য তহবিল হইতে দিতে হয় না। ইহা বড় কম কথা নহে।

ফলকরের জমি

বিস্তৃত পরিমাণে ফলকরের আবাদ করিতে হইলে স্বতন্ত্র স্থান নির্ব্বাচন করা উচিত এবং উক্ত স্থান জঙ্গলময় না হয়, অথবা সে জমি বর্ষাতে না ডুবিয়া যায়, এজন্য বিশেষ বিবেচনাসহকারে জমি নির্ব্বাচন করিতে হইবে। সাধারণতঃ ফলকরের জন্য মাটি ঈষৎ এঁটেল অর্থাৎ দুধে-এঁটেল হওয়া আবশ্যক।

ফলের গাছ বারমেসে ও স্থায়ী সুতরাং যে জমির মাটি গভীর অর্থাৎ যে জমিতে আবাদের যোগ্য মাটির স্তর অন্ততঃ ৩।৫ ফুট গভীর তাহাই প্রশস্ত। ভূগর্ভের স্তর যদি ৮।১০ ইঞ্চ বা এক ফুট অন্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে এবং প্রথম স্তরের নিম্নেই যদি বালি বা কঙ্করের স্তর দেখা যায়, তবে তাহা পরিহার করা উচিত, কেন না, এরূপ জমি বড় শীঘ্র নীরস হইয়া যায় এবং বৃক্ষাদির শিকড় যতই অধিক নিম্নে যাইতে থাকে, ততই তাহার পোষণোপযোগী পদার্থ সমূহের অভাব অনুভূত হয়। জমির মধ্যে ক্রমান্বয়ে প্রথম স্তরেই যদি দুধে-এঁটেল মাটি তিন চারি ফুট নিম্ন পর্য্যন্ত এবং তন্নিম্নে বালি বা কঙ্কর পাওয়া যায়, তাহা হইলে এইরূপ জমিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রথম স্তর এঁটেল হইলেও

তাহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করতঃ কার্য্যক্ষম করিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু মাটি বেলে হইলে তাহাকে রূপান্তর করা ব্যয় সাপেক্ষ। এঁটেল জমির আবশ্যকী অংশ মাত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া লইলেই চলিতে পারে কিন্তু বেলে মাটিতে তাহা হয় না।

ফলের জমির মৃত্তিকায় সমধিক পরিমাণে হাড়-জান (Phosphoric acid) পটাস ও চুণ (Lime) থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। যে জমিতে স্বভাবতঃ ইহার অভাব দৃষ্ট হয়, তাহাতে উক্ত কয় প্রকার দ্রব্য প্রদান করা আবশ্যক। যে জমিতে উদ্ভিজ্জ পদার্থের প্রাদুর্ভাব তাহাতে গাছ পালা সমধিক বৃদ্ধিশীল হয় বটে, কিন্তু ফল অপেক্ষাকৃত অল্প হয়। হাড়-জান পটাস, ও চুণের পরিমাণ যে জমিতে অধিক থাকে, তাহাতে ফলন অধিক হয়। মৃত্তিকার পরিগঠন (texture) অনুসারে তাহার উৎকর্ষতা বিধান কিম্বা সংস্কার সাধনের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বনীয়, তাহা ইতঃপূর্ব্বে মৎ-প্রণীত 'কৃষিক্ষেত্র' ও 'মৃত্তিকা-তত্ত্ব' নামক পুস্তকদ্বয়ে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং সে সকল বিষয় ইহাতে পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

বাগানের উপযোগী ফলকর

বাগানের আয়তন বুঝিয়া গাছের সংখ্যা ও প্রকারের নির্দ্দেশ করা উচিত। ব্যবসায়ীগণ যে যে ফলের উদ্দেশ্যে বাগান প্রস্তুত করেন, তাহাতে সেই সেই বিশেষ ফলেরই আধিক্য দেখা যায়, কিন্তু গৃহস্থ ও সৌখীনগণের বাগানের পক্ষে সে নিয়ম

অবলম্বন করা যাইতে পারে না। ইহাদিগের বাগানের আয়তন এবং স্বীয় পরিবারবর্গের অভিরুচি এবং স্থানীয় জলবায়ু বিবেচনা করিয়া নানাবিধ ফলের গাছ রোপণ করিতে হয়। উদ্যানমধ্যে বারমাসই কোন-না-কোন রকম ফল যাহাতে পাওয়া যায়, এরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক নানাবিধ গাছ রোপণ করাই যুক্তিসঙ্গত। যে গাছ সহজে জন্মে না, বৃদ্ধি পায় না, অথবা জন্মিলে ফল প্রদান করে না, এরূপ গাছ রোপণ করায় লাভ নাই। সৌখীনগণ অনেক সময়ে দুর্ল্লভ এবং ভিন্ন দেশের ফলের গাছও রোপণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা কেবল তাঁহাদিগের কৌতুহল নিবারণের জন্য ; ব্যবসায় বা ব্যবহারের জন্য বাগান করিতে হইলে কৌতুহল পরিহার করিয়া যে সকল গাছে ফল পাওয়া যাইবে তাহারই সমধিক আবাদ করা উচিত।

সকল দেশে সকল প্রকার গাছ জন্মে না এবং জন্মিলেও আশাপ্রদ ফল প্রদান করে না, এইজন্য স্থানীয় জল-বায়ু ও মৃত্তিকার অবস্থা বুঝিয়া গাছ নির্ব্বাচন করিতে হয়।

ভারতবর্ষ একটী বিরাট দেশ, কিন্তু এসিয়ার ন্যায় মহাদেশের সঙ্গে সংলগ্ন থাকায় ইহা খণ্ড দেশ মধ্যে পরিগণিত। ইহার তিন দিকের পরিবর্ত্তে চারিদিক জলবেষ্টিত থাকিলে অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় একটী স্বতন্ত্র মহাদেশ বা continent-রূপে পরিগণিত হইত। যাহা হউক, ঈদৃশ মহাব্যাপ্ত দেশ কখনই সমতল বা সমআবহাওয়ার হওয়া সম্ভব নহে, ফলতঃ ভারতবর্ষের সাগরপৃষ্ঠতা (sea level) কিম্বা ভূপৃষ্ঠতা surface এবং বারিপাত সর্ব্বত্র সমান নহে। আসাম বা বাঙ্গালার ভূপৃষ্ঠ সমুদ্রের পৃষ্ঠ অপেক্ষা কিছু উচ্চ, পাঞ্জাবের ভূপৃষ্ঠ বাঙ্গালা অপেক্ষা অনেক উচ্চ, বাঙ্গালা

ও পাঞ্জাবের মধ্যবর্ত্তী যত জেলা বা দেশ আছে, তৎসমুদায়ই বাঙ্গালা হইতে উচ্চ, এবং পাঞ্জাব হইতে নিচু। মোট কথা আসাম হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ ভূমিখণ্ড হিমালয়ের অঙ্গচ্যুত পদার্থ রাশির মহাসমাবেশ ফল মাত্র। যে দেশের ভূমি যত নিচু, অর্থাৎ সাগর পৃষ্ঠের নিকটবর্ত্তী সে দেশ সেই অনুপাতে রসাত্মক। সেই জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বার্ষিক বারিপাত (rainfall) স্বতন্ত্র। ভূগর্ভের রসাত্মকতা এবং বৃষ্টি অনেক পরিমাণে আবহাওয়ায় (climate) পরিচালক। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী কারণ আছে এবং সেই সকলের সমাবেশ ফলে আবহাওয়া পরিচালিত। সেই সকল অবস্থা ভারতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান না থাকায় আসাম হইতে পঞ্জাব, পঞ্জাব হইতে বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও কন্যা কুমারিকা—এই বিশাল ভারতভূমির নানা স্থানের জলবায়ু বা আবহাওয়া বিভিন্ন। এই ভারতের কোন স্থানে বার্ষিক বারিপাতের পরিমাণ ১০।২০ ইঞ্চি, কোথাও ৫০।৬০ ইঞ্চি আবার কোথাও ৪০০ হইতে ৮০০ ইঞ্চি। এই জন্য এক দেশের গাছ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আবহাওয়ায় দেশে রোপণ করিয়া সুফল লাভ করিতে পারা যায় না। আসামের শ্রীহট্ট, ও ডিব্রুগড় প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে উত্তম কমলা জন্মে কিন্তু বাঙ্গালায় তাহা হয় না। গাছ জন্মে, ফলধারণ করে, কিন্তু তাদৃশ সুতারফল হয় না। অধিক কথায় কাজ কি, শীতকালের কপি, মটর, আলু প্রভৃতি বিলাতি বহুবিধ তরকারি বাঙ্গালা দেশে উৎপন্ন হয়, কিন্তু ফাল্গুন-চৈত্র মাসে—গ্রীষ্মের বাতাস দেখা দিলেই সে সকল তরকারী অন্তর্হিত হয়, কিন্তু শিলং, দারজিলিং, মহীশূর প্রভৃতি অনেক স্থানে বারোমাস সেই সকল তরকারি পাওয়া যায়।

অনেকের ধারণা মাটির দোষগুণে বা বিশেষত্বে এরূপ হইয়া

থাকে, কিন্তু তাহা নহে, আবহাওয়া ইহার মূল। কৃত্রিম উপায়ে মাটির প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায় কিন্তু আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন মানুষের হাত নহে। শার্সী নির্ম্মিত গৃহমধ্যে কৃত্রিম আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারিলে শীত গ্রীষ্ম নির্ব্বিশেষে সকল দেশের বৃক্ষলতাদি রোপণ করিতে পারা যায়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উদ্যান—বিলাতের (Kew Gardens)। সেখানে বাঙ্গালার পদ্ম কুমুদ কহ্লার ফুটিয়া থাকে, আম্রবৃক্ষে আম্র এবং আনারস গাছে আনারস ফলে। সে স্বতন্ত্র কথা, কারণ ব্রিটীশ রাজ-কোষের অর্থ, পৃথিবীর আদর্শ উদ্যান এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অনুশীলন ক্ষেত্র। স্বর্গের পারিজাত আনিবার উপায় থাকিলে সেখানে তাহাও থাকিত।

যাহা হউক, এই সকল কথার উল্লেখ করিয়া আমরা কাহারও উদ্যম ও উৎসাহ নষ্ট করিতে চাহিনা, তবে একমাত্র ব্যক্তব্য যে, যে সকল গাছ জন্মাইতে পারা যায় না, দেশের আবহাওয়ার অনুপযোগী তাহাদিগের জন্য ব্যগ্র হওয়া উচিত নহে।

বৃক্ষের আকার ও বৃদ্ধি অনুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক গাছ রোপণ করিতে পারিলে বাগানের দৃশ্যও মনোহর হইয়া থাকে। বিস্তৃত ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে খালি জমি ফেলিয়া মধ্যে মধ্যে কতকগুলি গাছের সমষ্টি, কোথাও তিনটী, কোথাও দুইটী, কোথাও বা একটি গাছ থাকিলে বাগানের বাহার হয়। একদিকে যেমন উল্লিখিত প্রথা স্পৃহণীয়, অন্য দিকে তেমনি বৃক্ষের সুরচিত শ্রেণীতেও বাগানের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বাগানের গমনাগমনের প্রশস্ত পথের দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ গাছ বসাইলে তাহার বড়ই বাহার হয়। এস্থলে বলা বাহুল্য যে, পথের দৈর্ঘ্য ও প্রশস্ততানুসারে

গাছ বসাইতে হইবে। সঙ্কীর্ণ রাস্তার ধারে বৃহজ্জাতীয় গাছ বসাইলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহা নিতান্ত ঘন হইয়া স্থানীয় আলোক রোধ করে এবং রাস্তাটীরও শ্রী নষ্ট করে। রাস্তার ধারে বা বিস্তীর্ণ ময়দানে গাছ বসাইবার যেমন একটা প্রণালী আছে, পুষ্করিণী, ঝিল ও প্রাচীর কিনারায় গাছ বসাইবার সেইরূপ একটী নিয়ম আছে। জলাশয়ের কিনারা হইলে ৮।১০ হাত অন্তরে মধ্যবিধ গাছ রোপণ বিধি। প্রাচীর বা বেড়ার পার্শ্বের জন্য ঘন ও বৃহৎ জাতীয় গাছ রোপণ করা উচিত। উক্ত বৃক্ষ সকল ঘন ও বৃদ্ধিশীল হইলে, বাহির হইতে বাগানের ভিতরে লোকের নজর পড়িতে পায় না, অথচ বহির্দ্দেশ হইতে সেই বৃক্ষশ্রেণীও দেখিতে মনোহর হয়। লিচু, কাঁটাল, সপেটা প্রভৃতি গাছ এজন্য বিশেষ উপযোগী।

গাছের নাম

বাগানে যে গাছই রোপণ করা যাউক, তাহার নাম জানা না থাকিলে নানাবিধ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্যই নামের সৃষ্টি হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর গাছ চিনিয়া রাখিলেই যে কার্য্য শেষ হইল তাহা নহে। প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তর্গত তাবৎ বৃক্ষকেই চিনিয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন। আম্রবৃক্ষ বলিলে নানা জাতীয় আম্রের গাছকে বুঝায়, ইহাতে ফজলিও বুঝাইতে পারে, আবার একটা জঘন্য গাছও বুঝাইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক গাছটী স্বতন্ত্রভাবে বুঝিতে হইলে, যাহাতে

সকল গাছের নাম স্বতন্ত্র থাকে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

নামের বিষয়ে নির্ভুল থাকিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ যে গাছ হইতে কলম করিবে অথবা যে গাছের বীজ হইতে চারা উৎপাদন করিতে হইবে, তাহার নাম ঠিক থাকা উচিত। গাছের নাম অনেক সময়ে গোলমাল হইয়া যায়, কারণ যে ব্যক্তি নাম অবগত তিনি স্থানান্তরে গমন করিলে অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে মরিয়া গেলে, নামও তাঁহার সহিত লুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং পরবর্ত্তী লোকেরা যদি সেই নাম জ্ঞাত না থাকে তাহা হইলে, হয় সে সকল গাছের আর নামোদ্ধারের চেষ্টা হয় না, কিম্বা তাঁহারা স্ব স্ব ইচ্ছাক্রমে যে-সে নাম দিয়া গাছ নির্দ্দেশ করিয়া রাখেন। এইরূপে একই গাছ ভিন্ন লোকের বাগানে স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, গাছ ক্রয় করিতে হইলে বিশ্বস্ত চারাওয়ালাদিগের নিকট হইতে লওয়া উচিত, কেন না নিম্নশ্রেণীর চারাওয়ালাগণ অর্থের লোভে ক্রেতার আবশ্যক মত নাম দিয়া গাছ বিক্রয় করে। এই সকল চারা ওয়ালাদিগের নিজস্ব কয়েকটী একজাতীয় গাছ থাকিলেই তাহারা ক্রেতার সমুদায় অভাব মোচন করিতে পারে অর্থাৎ ক্রেতার আবশ্যক গাছ না থাকিলেও তাহারা সেই অল্প সংখ্যক গাছের মধ্য হইতে সেই নাম দিয়া গাছ বিক্রয় করে। ইহা সচরাচর হইয়া থাকে। যাহারা সামান্য অর্থ সাশ্রয়ের জন্য এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীর নিকট হইতে গাছ খরিদ করিতে যান, তাঁহারা প্রতারিত হইবেন, ইহা জানা কথা। এই সকল কারণে জানা গাছ হইতে চারা করিতে হইবে এবং বিশ্বস্ত

লোকের নিকট হইতে গাছ খরিদ করিতে হইবে। তাহাতে যদিও আপাততঃ খরচা কিছু বেশী পড়ে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা কিছুই নহে। পয়সা দিয়া ফজ্‌লি আম্রের গাছ ক্রয় করিলাম, কয়েক বৎসর যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া গাছটিকে বড় করিয়া তুলিলাম, কিন্তু ফল হইল হয়ত অতি নিকৃষ্ট। ইহাপেক্ষা আর অধিক মনঃকষ্ট কিসে হয়! এইরূপে নিরাশ হওয়া অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক অর্থব্যয় করিলে যদি ঠিক জিনিষ মিলে, তাহা কি বাঞ্ছনীয় নহে?

ইহা ব্যতীত ঠিক নাম সমেত গাছ ক্রয় করিলেও অনেক সময়ে নাম ভুলিয়া যাইতে হয়। এইজন্য আমাদের মতে উদ্যান তৈয়ার হইলে তাহার একখানি নক্‌সা করিয়া যে স্থানে যে গাছ বসান হইল, তাহার নির্দ্দেশ রাখিবার জন্য সেই নক্‌সায় নম্বর এবং একখানি খাতায় সেই নম্বর ও গাছের নাম লিখিয়া রাখিলে, গাছ মরিয়া গেলেও নামের বৈলক্ষণ্য ঘটিতে পারে না। কার্য্যের আরও সুবিধা করিতে হইলে প্রত্যেক গাছের কাণ্ডে নম্বর খোদিত করিয়া রাখা উচিত।

লতানিয়া বা সরু কাণ্ড-যুক্ত গাছে এইরূপে নম্বর খোদাই করিবার সুবিধা হয় না, সুতরাং সেরূপ গাছে টিন কিম্বা দস্তার টিকিট বাঁধিয়া রাখিলেই চলিবে।

ফলকর বাগানের আবশ্যক যন্ত্রাদি

বাগান পত্তন করিবার সঙ্গে তাহার জন্য আবশ্যক সমুদায় যন্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ একবারে খরিদ করা উচিত, নতুবা

কার্য্যকালে কোন কোন যন্ত্রের অভাবে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে।

বাগানের উপযোগী যন্ত্রাদি কলিকাতার বড় বড় লৌহাদির কারখানা যথা,—টি, টমসন কোম্পানী, জেসপ্ কোম্পানী প্রভৃতি এবং কোন কোন উদ্ভিদ ব্যবসায়ীর নিকট পাওয়া যায়। এই সকল যন্ত্রের মধ্যে গার্ডেন নাইফ্ (Garden-knife), চোক-কলমের ছুরী (Budding-knife), গাছ ছাঁটিবার ছুরী (Pruning-knife), গাছ ছাঁটিবার কাঁচি (Pruning scissors), করাত, লাঙ্গল, কোদাল, নিড়েন, খুরপি, কাস্তে, কুঠার, গাঁতি, ঝাঁঝরা বা জলের বোমা, পীচকারী (Garden syringe), কলম বাঁধিবার জন্য নারিকেল ছোবড়া, দড়ী, ঝুড়ি, ফল পাড়িবার জালতী বা ঠুসি, জমি মাপিবার ফিতে (measuring tape) ইত্যাদি আবশ্যক হয়।

১। বৃক্ষলতাদির সরু শাখাপ্রশাখাদি কাটিবার জন্য এক প্রকার ছুরী তৈয়ার হয়, তাহাকে গার্ডেন নাইফ্ (Garden-knife) কহে। ইহার বাঁট ঈষৎ হেলান এবং ফলা বিপরীত দিকে হেলান। বাগানে এই ছুরী সর্ব্বদা সঙ্গে রাখা উচিত।

২। চোক-কলমের ছুরী।—ইহার ফলার শেষভাগ ঈষৎ বক্র এবং বাঁটের শেষাংশ খুব পাত্‌লা। ইহাতে সুশৃঙ্খলে চোক-কলম হইয়া থাকে।

৩। গাছ ছাঁটিবার বা ডালপালা কাটিবার জন্য গার্ডেন নাইফের ন্যায় এক প্রকার ছুরী আছে। ইহা মোটা কাজের বিশেষ উপযোগী।

৪। স্থূল ও কঠিন শাখা কাটিতে হইলে করাতের প্রয়োজন

হয়। কুঠার বা কাটারি দ্বারা সরলভাবে ডালপালা কাটা যায় না এজন্য করাত ব্যবহৃত হয়। উদ্যান-করাতের গঠন ও আকার স্বতন্ত্র।

৫। গাছ ছাঁটিবার কাঁচি (Pruning scissors)।—উক্ত কাঁচি ছয় ইঞ্চ হইতে ২॥ বা ৩ ফুট লম্বা হয়। সরু ডালের জন্য ছোট এবং বড় ডালের জন্য বড় কাঁচি ব্যবহৃত হয়। এই কাঁচির ধরিবার স্থানে স্প্রিং দেওয়া থাকে সুতরাং কোন বস্তু কাটিবামাত্রই ফলাদ্বয় পুনরায় আপনা হইতেই খুলিয়া যায়।

৬। লাঙ্গল (Plough)।—আজকাল অনেক রকমের লাঙ্গলের প্রচলন হইয়াছে। বাগানে ভাসা-চাষ (Shallow ploughing) দিতে হইলে দেশী লাঙ্গলেই কাজ চলিতে পারে কিন্তু তদপেক্ষা গভীর চাষের জন্য শিবপুর-লাঙ্গল (Sibpur plough) বা 'হিন্দুস্থান' লাঙ্গল আবশ্যক।

৭। কোদাল।—জমি কোপাইবার জন্য কোদাল আবশ্যক। দাঁড়া-কোদাল দ্বারা কাজ করিতে লোকজনের কষ্ট হয় না। সাবধানে গাছের গোড়া কোপাইবার জন্য হেলা-কোদাল আবশ্যক। তদপেক্ষা সাবধানে কাজ করিবার জন্য সরু কোদাল রাখা উচিত। ঢালাই করা লৌহের কোদাল মজবুত হয়। কিন্তু কঠিন আচোট মাটিতে সাধারণ কোদাল সহজে প্রবেশ করে না। এইজন্য ৩।৪ টী গজালের ন্যায় বিদ্ধকযুক্ত পাত-(Blade) বিশিষ্ট কোদাল রাখা উচিত, ইহাকে (Pronged hoe) বলে। মাটি কোপান, ঢেলা ভাঙ্গা প্রভৃতি কাজে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হয়।

চারা—নির্ব্বাচন

স্বচক্ষে দেখিয়া গাছ খরিদ করা উচিত। উদ্যান-স্বামীর বাসস্থান দূরদেশে হইলে এবং সেস্থান হইতে চারাওয়ালার কর্ম্মস্থান যদি দূরে হয় তথাপি কষ্ট স্বীকার করিয়া স্বয়ং সেই স্থানে গিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া গাছ মনোনীত করিয়া আনা উচিত। এ বিষয়ে অবহেলা বা তাচ্ছিল্য করা উচিত নহে। যেরূপ পরামর্শ দেওয়া যাইতেছে, তাহা কার্য্যতঃ সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না সুতরাং সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীর নিকট হইতে গাছ ক্রয় করা উচিত। ইহাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারা যায়। আজ কাল উদ্যান-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ অনেক ব্যক্তি বীজ ও উদ্ভিদের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাদিগকে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। বিদেশ হইতে চারা আনাইতে হইলে অধিক বড় গাছ অপেক্ষা মধ্যমাকারের গাছ সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয়। বড় গাছ স্থানান্তরকরণকালে অনেক আঘাত পায় ফলতঃ তাহাতে গাছের বৃদ্ধি আপাততঃ রুদ্ধ হয়, তন্নিবন্ধন অনেক সময় নষ্ট হয়। ছোট গাছ আনিলে রোপণের পর অল্পদিনের মধ্যেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা-লাভে সমর্থ হয়।

যে চারা ঊর্দ্ধে তাদৃশ লম্বা না হইয়া শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট হয় এবং যাহার শাখা-প্রশাখা কোমল ও ঈষৎ নতশীল হয়, ঊর্দ্ধ অপেক্ষা পার্শ্বদিকেই যে গাছের বৃদ্ধির গতি, ঈদৃশ গাছই বিশেষ ফলশালী হয়। এইরূপ গাছের পার্শ্বদিকে শিকড় বিস্তৃত থাকে বলিয়া নিরাপদে জমি হইতে উঠাইতে পারা যায়।

বড় অপেক্ষা ছোট চারা রোপণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

ইহার সপক্ষে কয়েকটী যুক্তি আছে। ১ম,—ছোট গাছের অপেক্ষাকৃত বড় শিকড় থাকে; ২য়,—মূল্য কম; ৩য়,—বিদেশ হইতে গাছ আনাইবার খরচা কম এবং সহজেই আনা যাইতে পারে; ৪র্থ,—এরূপ গাছ রোপণ করিতে পরিশ্রম অল্প; ৫ম,—প্রবল বায়ু বা ঝটিকায় গাছের গোড়া নড়িয়া যায় না, সুতরাং গাছের শিকড় ছিঁড়ে না; ৬ষ্ঠ,—উদ্যানস্বামী এরূপ গাছকে অল্পায়াসেই নিজের মনোমত আকারে পরিণত করিতে পারেন; ৭ম,—পরিমিত যত্নে অল্পদিন মধ্যে বড় গাছ অপেক্ষা সুশ্রী ও সবল হইয়া উঠে। বস্তুতঃ, ছোট গাছ শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, কারণ ইহাদিগের শিকড় অধিক থাকায়, স্বীয় পরিমিত অবয়বকে যথেষ্টরূপে পোষণ করিতে পারে এবং অবয়বে উপস্থিত অল্প কাষ্ঠ থাকায় শীঘ্র শীঘ্র নূতন শাখা-প্রশাখা নির্গত হয়। বড় চারার শাখা-প্রশাখা নির্গত হইতে যে বিলম্ব হয়, তাহারও কারণ উহার যে শিকড় থাকে তাহা দ্বারা যে রস সংগৃহীত হয়, তাহা উপস্থিত শাখা-প্রশাখাকে পোষণ করিতেই ব্যয়িত হইয়া যায়, সুতরাং নূতন শাখা মুখরিত হইবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে।

চারা-পালন

আজ কাল ভারতের নানা স্থানে গাছের কারবার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কলমের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের গবমেণ্ট বোটানিক গার্ডেন, এগ্রি-হর্টিকলচারল্ গার্ডেন এবং

ব্যবসায়ী চারাবিক্রেতাগণ বারোমাস নানাবিধ বৃক্ষলতাদির চারা উৎপন্ন করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলমের চারা শীঘ্র ফলে, এবং আসল গাছের অনুরূপ ফল প্রদান করে,—এই দুই প্রধান কারণ বশতঃ কলমের এত আদর। যে গাছের চারা, কলম দ্বারা উৎপন্ন করিতে পারা যায় সে গাছের চারা, বীজ হইতে উৎপন্ন করিবার কেহ বড় প্রয়াস পায় না। কতকগুলি গাছের কলম সহজে উৎপন্ন করিতে পারা যায় না, কেবল সেই সেই গাছের চারা বীজ হইতে উৎপাদিত হইয়া থাকে। আবার কতক গাছের জোড় কলম, চোক বা চোঙ কলম করিবার জন্য বীজুর আবশ্যক হয় বলিয়া বীজের চারা উৎপাদিত হয়।

বীজু হউক বা কলম হউক, প্রথমাবস্থায় তাহাদিগকে কিছু-দিন—উদ্ভিদানুসারে ২।৪ মাস বা ততোধিক কাল—হাপোর বা জখিরার রাখিয়া লালনপালন করিলে অল্প ব্যয়ে, অল্প শ্রমে ও অল্প দিনে অনেকগুলি গাছ একত্রে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। ফলতঃ গাছগুলি শীঘ্র সতেজ ও সবল হয়, অতঃপর যথাস্থানে স্থায়ী-ভাবে রোপিত হইলে শীঘ্রই জমিতে বদ্ধমূল হইতে পারে, তখন আর তাহাদিগকে অধিক দিন পরিচর্য্যা করিতে হয় না। সদ্যোজাত চারা কিম্বা কলম একবারে জমিতে পুঁতিলে প্রত্যেক গাছটীকে জলসেচন, নিড়ানী প্রভৃতির জন্য অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাতে মজুরী অনেক বাড়িয়া যায়। তাহা ব্যতীত, জখিরায় ঘন ঘন রোপিত হয় বলিয়া তাহাদের ছায়ায় মাটি ঠাণ্ডা থাকে, পরস্পর পরস্পরকে ছায়া দিয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। জখিরায় পালন করিলে উদ্যানস্বামীর সুবিধা, চারাগণেরও লাভ।

যথানিয়মে হাপোরে বীজ বপনপূর্ব্বক চারা উৎপন্ন করিয়া

নির্দ্দিষ্টকাল অপেক্ষা করিতে হইবে। ইতিমধ্যে আর একটি হাপোর প্রস্তুত রাখিতে হইবে। চারাগুলি ৪।৫টী হইতে ৭।৮টী পত্রযুক্ত হইলে যত্নসহকারে উঠাইয়া চারিদিকে ৮।১০ অঙ্গুলি ব্যবধান রোপণ করিয়া যথানিয়মে পালন করিতে হইবে। বাগানে বীজু গাছ রোপণ করিতে হইলে দুই বৎসর কাল হাপোরে পালন করিবার পর স্থায়ীভাবে যথাস্থানে রোপণ করা উচিত। চারাগাছ যাবৎ জমিতে রোপিত না হয়, তাবৎকালমধ্যে ২।৩বার এক জখিরা হইতে অন্য জখিরায় স্থানান্তরিত হইলে বৃদ্ধিশীল হয়। জখিরার মাটি উত্তম সারাল হওয়া উচিত। চারাবস্থায় যে গাছ তেজাল, পত্রপূর্ণ ও উজ্জ্বল-বর্ণ হয়, তাহার ভবিষ্যৎ শুভকর। এইজন্য 'উঠন্ত মূলের পত্তনেই জানা যায়'—এই প্রবাদটীর উৎপত্তি।

অনেক বাগানে প্রতিবৎসর কলম তৈয়ার করিতে হয় কিন্তু তৈয়ারী গাছ রাখিবার সুব্যবস্থার অভাবে বহু কলম মরিয়া যায়, কিম্বা শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া যায়। কলম তৈয়ার হইয়া গেলে জখিরায় আনিয়া পুঁতিয়া রাখিলে এবং যথাবিধি পাট-তদ্বির করিলে ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জখিরার মাটি উত্তম সারাল হওয়া উচিত। রোপিত কলম পরস্পর মধ্যে সমুচিত ব্যবধান থাকা উচিত। অনন্তর কলমগুলিকে বর্ষাকাল ব্যতীত অপর সময়ে প্রতিদিন প্রাতঃকালে কিম্বা অপরাহ্ণে নির্ম্মল বারি দ্বারা স্নান করাইয়া দিতে পারিলে আরও ভাল হয়। সকল স্থলচর জীব ও স্থলজাত উদ্ভিদ স্নাত হইলে স্নিগ্ধ হয় তাহা আমরা নিজে নিজে বুঝিতে পারি। অনেক সময় আহারাপেক্ষা স্নানের প্রয়োজনীয়তা অধিক উপলব্ধি হয়।

অনেকে চারা ও কলম টবে বা গামলায় রোপণ করিয়া পালন

করেন। ইহাতে ঝঞ্ঝাট অনেক, কারণ প্রায় প্রতিদিন জলসেচন করিতে হয়,কোনদিন তাহার ব্যতিক্রম হইলে গাছ ঝিমাইয়া যায়। তাহা ব্যতীত, টবের আবদ্ধ মাটি অনতিকাল মধ্যেই নিঃস্ব হইয়া পড়ে, ফলতঃ গাছ বিবর্ণ হয়, ক্রমে পাতার সংখ্যা হ্রাস হয়। অনন্তর ইহাও দেখা যায়, টবের উপরিভাগ ও চারিদিক দিয়া মাটির রস শুকাইয়া যায়। এইজন্য তাহাদিগের এত জলাভাব হয়। জমিতে রোপিত থাকিলে তাহা ঘটে না, অধিকন্তু শিকড় সমূহ ভূগর্ভের স্বাভাবিক মাটির রসাস্বাদন করিতে পাইয়া সুশ্রী ও বৃদ্ধিশীল হয়। টবে রোপিত গাছ জখিরাতে টবসহ প্রোথিত থাকিলে অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে, কারণ টবে অধিক রৌদ্র বা বাতাস লাগিতে পায় না। জখিরায় টব ডুবাইয়া রাখিতে হইলে পূর্ব্বাহ্ণে জখিরা হইতে মাটি বাহিষ্কৃত করিয়া সেই শূন্যস্থান ছাই বা কয়লার ঘেঁস দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। প্রয়োজন কালে ঘেঁস অপসৃত করতঃ টবগুলি তাহার মধ্যে বসাইয়া ঘেঁস দ্বারা পুনরায় ভরিয়া দিতে হয়। এরূপ করিলে টব ঠাণ্ডা থাকে, টবের গাত্র মৃত্তিকালিপ্ত হইতে পারে না এবং মনে করিলেই গামলা অনায়াসে তুলিয়া লইতে পারা যায়।

বীজ-জাত চারাদিগকে হাপোর হইতে তুলিয়া গামলায় রোপণ কিম্বা হাপোরান্তর করিবার সময় চারাসমূহের মূলশিকড় কাটিয়া দিতে হয়। মূল-শিকড় কাটিয়া দিলে গাছ প্রসারিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে খাসী-করণ কহে।

আমদানী চারার পাট

উদ্যানস্বামীর প্রয়োজনমত গাছ নিজ গ্রাম বা সন্নিহিত সহরে সকল সময়ে পাওয়া যায় না, এজন্য দূরদেশ হইতে আনাইতে হয়। বাঙ্গলাদেশ মধ্যে কলিকাতায় গাছের বিস্তৃত বাজার। মফঃস্বলবাসী অধিকাংশ ব্যক্তি কলিকাতা অঞ্চল হইতে বহু বৃক্ষলতাদির ছোট গাছ আমদানী করিয়া থাকেন।

কলিকাতা হইতে যে সকল গাছ রপ্তানী হয় তৎসমুদায় প্রায় কেরোসিন বাক্সে সজ্জিত, এবং বস্ত্র দ্বারা আবৃত হইয়া প্রেরিত হয়। ক্রেতাদিগের ব্যয় সঙ্কোচ করিবার জন্য উদ্ভিদ-ব্যবসায়ীগণ টবসহ গাছ না পাঠাইয়া কেবলই গাছের মূলগুলিকে মাটির দ্বারা থালা বাঁধিয়া দেন। টবসহ গাছ পাঠাইতে পথে বারম্বার বিচলিত হইয়া টব ভাঙ্গিয়া যায় তন্নিবন্ধন গাছের গোড়ার মাটি খসিয়া যায়, অনেক শিকড়ও নষ্ট হয়। তাহা ব্যতীত, প্রেরণে রেল বা ষ্টিমারে মাসুল অধিক লাগে, এক বাক্সের গাছ ৩।৪ বাক্সে দিতে হয়, ফলতঃ প্যাকিং ব্যয় ও, কুলি খরচা বেশী পড়িয়া যায়। বলা বাহুল্য, এ তাবৎ ব্যয়ই ক্রেতাকে বহন করিতে হয়। টব ছাড়িয়া গাছ প্রেরণে এইজন্য অনেক ব্যয় কমিয়া যায়।

সাধারণতঃ ব্যবসায়ীদিগের বিক্রেয় চারা সমূহ হাপারে পালিত হয়। ক্রেতার আদেশ-পত্র আসিলে তথা হইতে উত্তোলিত করিয়া দিতে হয়। উত্তোলন মাত্রই তদবস্থায় প্রেরণ করিলে গাছের গোড়া হইতে মাটি খসিয়া গিয়া শিকড় সকল বাহির

হইয়া পড়ে, শিকড়ে বাতাস ও রৌদ্র লাগে, তাহার ফলে গাছ দুঃখ ভোগ করে, অনেক গাছ পথিমধ্যে শুকাইয়া যায়! যাহাতে গাছের গোড়া হইতে অধিক মাটি না খসিয়া যায়, এই উদ্দেশ্যে চারা-ব্যবসায়ীগণ প্রত্যেক গাছের গোড়া অল্লাধিক এঁটেল মাটি-দ্বারা বাঁধিয়া দেন। ইহাতে গাছের গোড়া দৃঢ় হয় কিন্তু পরে সহজে তাহা পৃথক করিতে পারা যায় না। কলিকাতায় চারা-ব্যবসায়ীগণ প্রতিবৎসর হাপোরে এটেল মাটি দিয়া পরে তাহাতে চারা বসাইয়া রাখেন। এই কারণে সে সকল চারার মূল বৃদ্ধির উপায় থাকে না।

আবার কোন কোন ব্যবসায়ী এটেল মাটি ব্যবহার না করিয়া হাপোর হইতে চারা তুলিয়া সাধারণ মাটি দ্বারা থালা বাঁধিয়া তাহার উপর কদলী পেটো বা নারিকেল পাতা কিম্বা 'মস' অর্থাৎ পাহাড়ী শৈবাল বাঁধিয়া দেন।

যাহা হউক, চালানী গাছ যথাস্থানে আসিয়া পৌছিলে প্যাকিং বাক্সের মশারি উন্মোচিত করিয়া গাছ গুলিকে আপাততঃ গাছের ছায়ায় কিম্বা কোন অন্ধকার স্থানে রাখিয়া দিতে হয় এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে কোন ছায়াবিশিষ্ট স্থানে হাপোরে পুতিয়া গাছগুলিকে উত্তমরূপে স্নান করাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। আপাততঃ তাড়াতাড়ি না করিয়া ২।৩ সপ্তাহকাল হাপোরে রাখিয়া পালন করিলে চারাগুলির ক্লান্তি দূর হয় এবং ক্রমে নূতন পত্র-মুকুল দেখা দেয়। তদনন্তর যথাস্থানে রোপণ করিলে ভাল হয়।

হাপোরে রোপণ করিবার পূর্ব্বে গাছের গোড়াগুলিকে পুষ্করিণী কিম্বা জলপূর্ণ বড় গামলায় ডুবাইয়া রাখিলে একদিকে

যেরূপ গাছগুলি সজীব ও তাজা হইয়া উঠিবে, অন্যদিকে গোড়ার কঠিন মাটি আল্‌গা হইবে। অনন্তর জল হইতে গাছগুলিকে উঠাইয়া, জলে ২।৪ বার হেলাইলে অনেক মাটি সহজেই থালা হইতে খসিয়া পড়িবে। প্রয়োজন বোধ করিলে সাবধানে হস্ত দ্বারা আরও কিছু মাটি ভাঙ্গিয়া দিতে পারা যায় কিন্তু শিকড় নষ্ট না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অনেক সময় আমদানী চারার থালা না ভাঙ্গিয়া রোপণ করিয়াছি। এরূপে রোপণ করিলে দীর্ঘকালেও চারাগাছসকল মৃৎপিণ্ড (ball) ভেদ করিয়া শিকড় উদ্গত করিতে পারে না, ফলতঃ বর্দ্ধিত হওয়া দূরের কথা, ক্রমে গাছগুলি 'কুড়িয়ে' যায় অর্থাৎ মৃতপ্রায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যে সকল আমদানী-চারা রোপিত হইবার পর ৩।৪ সপ্তাহ মধ্যে সজীবতার লক্ষণ প্রকাশ না করে তাহাদিগকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিলে দেখা যাইবে যে, তাহাদিগের গোড়ায় শিকড় বাহির হয় নাই। শিকড় বৃদ্ধি পাইলে গাছ সজীব ও বর্দ্ধমান হইবে। যাহা হউক, মূলগুলি উল্লিখিত উপায়ে ধৌত করিয়া শুষ্ক বালুকামধ্যে একবার নিমজ্জিত করণান্তর রোপণ করিলে শীঘ্র নূতন শিকড় জন্মে।

হাপোরে রোপণকালে চারাদিগকে সমুচিত স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। এক গাছের পত্র-পল্লব অপর গাছের পত্র-পল্লবে স্পর্শিত না হয়—এরূপ ব্যবধানে রোপণ করিতে হইবে, এবং তাহা হইলে সকল চারাই আলোক বাতাস ও রৌদ্র পাইবে, গাছে কোনও কীট আসিবে না, হাপোরের মাটি ও স্যাঁতসেঁতে হইতে পারিবে না, ফলতঃ চারাগুলি শীঘ্রই বাড়িতে থাকিবে এবং নূতন পত্র-পল্লবে সুশোভিত হইবে। চারা অবস্থায় পালন

প্রণালীর উপর উদ্ভিদের ভবিষ্যজ্জীবন নির্ভরপর। মনুষ্যজীবনও এই নিয়মের অধীন।

হাপোরে রক্ষিত চারাদিগকে প্রতিদিন জলসেচনের প্রয়োজন হয় না। ঋতু ও মাটির অবস্থা বুঝিয়া জলসেচন করা উচিত। হাপোরে একদিন উত্তমরূপে জলসেচন করিলে ৫।৭ দিবসকাল মাটি আর্দ্র থাকে, অতিরিক্ত জলে মাটিতে সর্দ্দি জন্মে, তন্নিবন্ধন নূতন মূল সকল পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। গ্রীষ্মকালে হাপোরের মাটিতে জলসেচন করা হউক বা না হউক, তাহাতে তত আসে যায় না, কিন্তু বৈকালে উচ্চ হইতে গাছগুলির শিরোদেশে জল ঢালিয়া দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। গাছের স্নান হইলে, সেই জল মাটিতে পড়িয়া থাকে, সুতরাং স্নান দ্বারা দুই কাজই সারা হয়।

অনেক স্থলে দেখিয়াছি, বিদেশের চালান আসিবামাত্রই চারাদিগকে জমিতে স্থায়ীরূপে রোপণ করা হয়, তাহার ফলে অনেক চারা মরিয়া যায়, কিন্তু হাপোরে ২।৩ সপ্তাহ পালন করিয়া বাহিরে রোপণ করিলে সে আশঙ্কা থাকে না। হাপোরে রোপিত হইবার পর কোন গাছ মরিয়া গেলে তত কষ্টের কারণ হয় না, এবং পরিশ্রম পণ্ড হয় না। অল্প স্থান মধ্যে বহু চারা পালিত হইতে পারে বলিয়া সকল গাছকে নজরে রাখিতে পারা যায়, অথচ ব্যয় নাম মাত্র। পথে আসিবার কালে অনেক গাছ অবসন্ন ও মৃতপ্রায় হইয়া আইসে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌছিবার পর অত্যাধিক পরিচর্য্যা পাইলে বাঁচিয়া যায় এবং তাহা সত্ত্বেও যে গুলি মরিয়া যায়, গাছব্যবসায়ীকে লিখিলে অভিযোগ গ্রাহ্য হইতে পারে, এবং মৃত গাছের পরিবর্ত্তে নূতন গাছ পুনরায় পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা।

কোন গাছ ভূমি হইতে উত্তোলিত হইয়া অন্যস্থানে রোপিত হইলে শিকড়সকল অবিলম্বেই ভূমি হইতে রস আহরণ করিতে পারে না। ভূমিতে সংলগ্ন হইয়া কার্য্যোপযোগী হইলে তবেই মূলগণ মাটির রস শোষণ করিতে সক্ষম হয়, অন্যথা যথাপরিমাণ রসের অভাবে গাছের অবয়ব ক্ষীণ হইয়া পড়ে, সূর্য্যের কিরণ দ্বারা উদ্ভিদের বহু রস শোষিত হইয়া উদ্ভিদকে দুর্ব্বল করিয়া দেয় কিন্তু উদ্ভিদকে এই অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য রোপণের পূর্ব্বে বা পরে তাহার শাখাপ্রশাখার অল্পাধিক ছাঁটিয়া দিতে হয়। এক্ষণে শিকড়গণ যে রস আহরণ করে তদ্দ্বারা বর্ত্তমান অবস্থাপন্ন উদ্ভিদের যথেষ্ট হইতে পারে। স্থানান্তরিত হইয়া আপাততঃ মূলগণ উপনিবিষ্ট স্থান হইতে যেমন অধিক রস শোষণ করিতে পারে না, তেমনি শাখাপ্রশাখা কর্ত্তিত এবং পত্র সংখ্যা হ্রাস হইলে উদ্ভিদের তত রসেরও প্রয়োজন হয় না। এই গুহ্য সূত্রটী বিশেষরূপে স্মরণ রাখিলে অনেক স্থলে প্রয়োগ করিতে পারা যায়। গ্রীষ্মকালে গাছ আমদানী হইলে হাপোরে রোপণ করিয়া হাপোরের উপর নারিকেল, সুপারি, কিম্বা তাল পত্র, হোগলা, দরমা কিম্বা ঘাসের চালা বা ঝাঁপ বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। এ সময়ের রৌদ্রের উত্তাপ ও গরম বাতাস স্থানান্তরিত আহত চারা গাছের বিষম অনিষ্টকর। দিবাভাগে, অন্ততঃ প্রখর রৌদ্রের সময়, ঢাকা রাখিয়া সায়ংকালে আবরণ উন্মোচিত করা উচিত। আবরণ এরূপ ভাবে নির্ম্মাণ করিতে হইবে যে, তাহা ভেদ করিয়া ভথিরা মধ্যে অল্পাধিক রৌদ্র, বৃষ্টি, বাতাস, শিশির যেন প্রবেশ করিতে পারে। ইহাদিগের প্রবেশের পথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করিয়া দিলে চারা মরিয়া যায় কিম্বা আউড়ে যায়। আওতায় গাছ রৌদ্রাভাবে পত্রহরিৎহীন

হয়, শাখাপ্রশাখা অযথা দীর্ঘ হয়। অনন্তর ইহাও দেখা যায় আওতার গাছে ছত্রকের আবির্ভাব হয়।

হিমময় দেশে গাছ আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বে যদি তুষারপাত হইয়া থাকে কিম্বা পৌঁছিবার পরে বরফপাতের আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে গাছগুলিকে আপাততঃ ভূমিতে গর্ত্ত করিয়া মাটি চাপা দিয়া রাখিলে কোন ক্ষতি হয় না এবং পরে উঠাইয়া লইলেই চলে। উষ্ণপ্রধান দেশেই আমাদিগের বাস, সুতরাং গরমের প্রতিবিধান করাই আমাদের প্রয়োজন, তুষারপাতে কি করিতে হয় না হয়, কাযাতঃ আমরা তাহার আবশ্যকতা অনুভব করি নাই। তবে এ সম্বন্ধে আমেরিকার প্রসিদ্ধ ও বিচক্ষণ ফলতত্ত্বজ্ঞ Mr. S. P. W. Humphreys যাহা লিখিয়াছেন, এ স্থলে তাহাই উদ্ধৃত করা গেল :—

"If the trees have been received from the nursery rather earlier than you expected them, and you fear that they have been frosted on the way, place them all in a trench, roots, tops and all, and let them remain covered with soil until they are free from frost and it is time to plant them."*

জমিতে চারা রোপণের সময়।

প্রচণ্ড গরম, প্রখর শীত, তুষারপাত বা অতিরিক্ত বর্ষার সময়ে জমিতে গাছ রোপণ করা কোন মতে বিধেয় নহে। প্রচণ্ড

* The May Flower, April 1863.

রৌদ্রের দিনে জমিতে রোপণ করিলে গাছ যে মরিয়া যায় তাহার প্রধান কারণ, নব রোপিত চারা ভূমি হইতে আপাততঃ রস পরিশোষণ করিতে পারে না, অন্যদিকে উহার শরীরস্থ রস প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে বায়ুমণ্ডলে আকর্ষিত হইতে থাকে। নূতন চারার শিকড় ভূমিতে সংলগ্ন হইলেও রৌদ্রোত্তাপে যত রস উহার অবয়ব হইতে বাষ্পাকারে বহির্গত হইয়া যায়, তত রস শিকড় সকল আহরণে সমর্থ হয় না। ফলতঃ পরিশোষণ, বহিরাকর্ষণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না।

অতিরিক্ত শীতে গাছের শিরা ও স্নায়ু সকল কুঞ্চিত হইয়া থাকে, রস ঘন হয়, রসের প্রবাহ মন্থর হয়। মোট কথা—তখন প্রায় সকল উদ্ভিদের বিরাম বা নিদ্রাকাল সুতরাং সে সময়ে জমিতে রোপিত হইলে চারা সকল অধিকতর নির্জীব হইয়া পড়ে।

সমধিক বর্ষার দিনেও জমিতে গাছ রোপণে আপত্তি আছে। এ সময় মাটি সঞ্চালিত হইলে কাদা উৎপন্ন হয়। ঈদৃশ অবস্থায় কোনও গাছ সুচারুরূপে রোপণ করা চলেনা। গোড়ায় অধিক জল জমিয়া শিকড় পচিয়া যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত, সে সময় ভূগর্ভ রসে দল্‌দল্‌ করিতে থাকে এবং মাটিতে উত্তাপ থাকে না। সিক্ত মৃত্তিকা বিচলিত হইলে কাদাটে হইয়া যায়, মাটি অঁটিয়া যায়, ফলতঃ ভূগর্ভ মধ্যে বায়বীয় পদার্থের প্রবেশাধিকার বিলুপ্ত হয়। জমাট মাটির মধ্যে গাছের কোমল শিকড়ও প্রবেশ করিতে পারে না।

এই সকল বিষয় ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া, যে সময়ে মাটি ঈষৎ সরস ও ঝুরা থাকিবে এবং রৌদ্র, বৃষ্টি বা শীতের প্রাবল্য না থাকিবে এমন সময়েই জমিতে গাছ রোপণ করা

পরামর্শসিদ্ধ। এই জন্যই জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগ হইতে আষাঢ়ের শেষ পর্য্যন্ত এবং আশ্বিন হইতে কার্ত্তিক মাস গাছ রোপণের উত্তম সময়। এ সময়ে মাটি রসা অথচ ঝুরা থাকে এবং বাতাসও সরস থাকে। মাটি হাল্‌কা হইলে পূরা বর্ষাতেও গাছ বসান যাইতে পারে, কিন্তু মাটির যো বুঝিয়া তাহা করা উচিত।

গাছের ও জমির প্রকৃতি বুঝিয়া বর্ষায় বা বর্ষার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে গাছ রোপণ করিতে হইবে। বর্ষাকালের বৃষ্টিতে যে সকল গাছের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাহাদিগকে বর্ষার পূর্ব্বে জমিতে রোপণ করিলেই ভাল হয়। যে সকল গাছ টবে জন্মিয়া আছে, তাহাদিগকে অতিরিক্ত বর্ষা ভিন্ন যে-কোন সময়েই জমিতে রোপণ করা যাইতে পারে।

রোপণীয় গাছ সকল পূর্ব্বাহ্ণে আয়ত্ত মধ্যে রাখিলে ঋতু ও মৃত্তিকার অবস্থা বুঝিয়া উপযুক্ত সুযোগে রোপণ করাই বিচক্ষণতার কার্য্য।

রোপণ-প্রণালী

একই শ্রেণী বা চৌকায় বিভিন্ন জাতীয় ফলের গাছ রোপণ না করিয়া প্রত্যেক ফলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দেশ করিলে ভাল হয়। ইহাতে কার্য্যের অনেক সুবিধা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত যে-গাছের যে-সময়ে যে-পাট করা আবশ্যক, তাহা সহজ হয়, নতুবা একটী গাছের পাট করিবার জন্য পরিশ্রম অধিক হয়। আমগাছের চৌকা মধ্যে পীচগাছ থাকিলে অথবা পীচগাছের শ্রেণীমধ্যে কুলবৃক্ষ থাকিলে যদি সকল গাছকে

প্রভৃতি যে সকল ফসলের শস্য জমিতে পাকিয়া থাকে, এরূপ ফসলে মৃত্তিকা ক্ষীণতেজ হইয়া পড়ে। অতএব ফলকরের জমিতে ঈদৃশ ফসলের আবাদ না করিয়া শাক-সব্জীর আবাদ করা উচিত। শাক-সব্জীর আবাদ করিলে জমি নিস্তেজ হয় না, কারণ সব্জীর আবাদে প্রভূত পরিমাণে সার নিয়োজিত হইয়া থাকে, জমির যথেষ্ট পরিচর্য্যা হয়। এতদ্ব্যতীত সব্জীর ফসল জমি হইতে শীঘ্র উঠিয়া যায় ফলতঃ তাহাতে বীজ জন্মিতে পায় না। মাটি হইতে শিকড় দ্বারা সার পদার্থ সংগৃহীত হইতে অনেক সময় লাগে এবং সেই দীর্ঘ সময় পাইবার পূর্ব্বেই সব্জী সকল ব্যবহারোপযোগী হইয়া উঠে, সুতরাং নিয়োজিত সারের অধিকাংশ সব্জীতে প্রবেশ করিতে পায় না। সব্জীর মধ্যে জলের অংশই অধিক থাকে। আর প্রথমোক্ত শস্যের আবাদে গাছ ও শস্যকে পুষ্ট করিতে অনেক সময় লাগে এবং শস্য পোষণে সার পদার্থের আবশ্যক হয়। এই সকল কারণে মেঠো-ফসল অপেক্ষা সব্জীর আবাদ করিলে ফলকরের জমি ভাল থাকে।

জমি হইতে চারা উঠাইয়া উহার গোড়ায় যে মাটি বাঁধিয়া দেওয়া যায়, তাহাকে 'থলে' কহে। গোড়ার মাটি খসিয়া যাইবার ভয়ে থলে করিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু চারাওয়ালাগণ এত কঠিন ও এটেল মাটি দ্বারা থলে বাঁধে যে, সহজে তাহা ভাঙ্গিতে পারা যায় না। এইরূপ মাটিবিশিষ্ট থলে সমেত গাছ পুতিলে, জমিতে শিকড় প্রবেশ করিতে অনেক বিলম্ব হয় এবং তাহাতে গাছ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, অনেক স্থলে মরিয়া যায়। গর্ত্তে গাছ বসাইবার পূর্ব্বে

থলের উপরিভাগের মাটি ঈষৎ ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত তাহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি।

প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক গভীর করিয়া গর্ত্ত করিলে গাছের কাণ্ডাংশও কতক পরিমাণে জমির ভিতরে থাকে, সুতরাং তাহা না করিয়া শিকড় ও কাণ্ডের সম্মিলনস্থল অর্থাৎ নাভী (Apex) অবধি ভূগর্ত্ত মধ্যে রাখিয়া চারা রোপণ করিতে হইবে। জোড় বা চোক কলমের গাছ পুতিবার সময় একটা বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, জমি হইতে জোড় বা চোক অধিক উচ্চে না থাকে। চোক বা জোড়ের স্থান অধিক উচ্চে থাকিলে প্রবল বাত্যায় ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে এবং সেই জোড় বা চোকের নিম্নস্থিত কাণ্ডাংশ হইতে শাখাপ্রশাখা নির্গত হইয়া কলমটীকে বিনাশ করিতে পারে। নিম্নদেশে শাখাদি জন্মিলে কলমের রসাভাব হয়, সুতরাং তাহার অনিষ্ট হয়। মুরসিদাবাদ মালদহ প্রভৃতি অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে যে, কাণ্ডের অনেক উপরে জোড় থাকে। এরূপ গাছকে অগত্যা জোড় উপরে রাখিয়াই মাটিতে পুতিতে হয়।

গর্ত্ত মধ্যে গাছটী ঠিক মধ্যস্থলে রাখিয়া মাটি চাপা দিবে। বলা বাহুল্য, গর্ত্তের মাটি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া দেওয়া উচিত এবং তৃণাদির শিকড় বাছিয়া ফেলা আবশ্যক। উক্ত মাটির সহিত পাতাসার বা অন্য কোন ঝুরা সার মিশাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। মাটি, সারমিশ্রিত হইলে আল্‌গা হয় এবং তাহাতে শিকড় অতি সহজে প্রবেশ করিতে পারে। শিকড়ে কোনরূপ আঘাত না লাগে, এরূপ যত্নসহকারে গর্ত্তমধ্যে চারা বসাইয়া মাটি দ্বারা উহা পূর্ণ করিবে এবং ধীরে ধীরে হস্ত দ্বারা মাটি চাপিয়া দিবে।

অতিরিক্ত চাপিয়া দিলে মাটি জমাট বাঁধিয়া যায় এবং মৃত্তিকার ছিদ্রপথ সমূহ (Capillary tubes) রুদ্ধ হইয়া যায়। তাহা ব্যতীত, মাটি চাপিবার সময় কোমল ও সূক্ষ্ম শিকড়ও ছিঁড়িয়া যায় এবং চতুর্দ্দিক হইতে মৃত্তিকা পেষিত হওয়ায় শিকড়গুলি সহজে তাহা ভেদ করিতে পারে না।

বর্ষাকালে বৃক্ষ রোপণ করিলে গোড়ায় জল না জমিতে পারে, এজন্য গোড়ায় মাটি উচ্চ করিয়া দিতে হইবে, কিন্তু অন্য সময়ে রোপণ করিলে গাছের গোড়ায় থালা করিয়া দিতে হয়। থালা করিয়া না দিলে সেচিত জলে মাটির উপরিভাগ ভিজিয়া থাকে মাত্র, কিন্তু থালা করা থাকিলে উক্ত জল থালার মধ্যে ক্ষণকাল আটক থাকিয়া ক্রমশঃ ভূগর্ভ মধ্যে প্রবেশ করে।

হাপোরের চারা ও তাহার পাট

যে সকল চারা হাপোরে বসান থাকে তাহাদিগের উপর বিশেষ লক্ষ্য না রাখিলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। চারার আকার ও বৃদ্ধি অনুসারে হাপোর মধ্যে নিয়মিত পরিমাণ স্থান ব্যবধানে গাছ বসান গিয়া থাকে, এই জন্য হাপোরে কোন চারা অধিক দিন একভাবে থাকিতে পারে না।— অধিক দিন এক স্থানে হাপোর দেওয়া থাকিলে চারাগণের শিকড় বাড়িয়া যায় এবং তাহাদিগকে তুলিবার সময় অনেক শিকড় কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ, শাখাপ্রশাখা বাড়িয়া গিয়া হাপোর ঘন ও আলোকহীন হইয়া পড়ে, তন্নিবন্ধন গাছগুলি রুগ্ন হইয়া

পড়ে। এই নিমিত্ত একস্থানে এক বৎসরের অধিক কাল না রাখিয়া বর্ষার প্রারম্ভে স্বতন্ত্র সারাল হাপোরে অপেক্ষাকৃত অধিক অাঁতর ব্যবধানে পুঁতিয়া দিতে হইবে। মাটি হইতে তুলিবার সময়ে যেন উহাদিগের গোড়া হইতে মাটি না খসিয়া যায়। মাটি খসিয়া গিয়া শিকড় বাহির হইয়া পড়িলে গাছ ঝিমাইয়া পড়ে এবং জমিতে পুনঃ সংলগ্ন হইতে বিলম্ব হয়। হাপোরের মাটি নীরস হইয়া থাকিলে গাছ তুলিবার সময়ে মাটি খসিয়া যায় সুতরাং এ অবস্থায় গাছ তুলিতে হইলে ২।৩ ঘণ্টা পূর্ব্বে হাপোরে উত্তমরূপে জলসেচন করিয়া রাখিতে হইবে। সেই জল টানিয়া গেলে তবে গাছ উঠাইতে হইবে। ইহাতে আর সহজে মাটি খসিয়া যাইতে পারে না।

হাপোরে অবস্থানকালীন কলমের গাছের নিম্নভাগস্থিত বীজ চারার অংশ (Stock) হইতে শাখাপ্রশাখা নির্গত হইলে তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে হয় অন্যথা উহা বাড়িয়া গিয়া তদুপরিস্থ পোষ্যশাখা বা (Scion) কলমটাকে নিস্তেজ করিয়া ফেলে।

হাপোর সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হইবে। তৃণ-জঙ্গলাদি জন্মিলে তাহা মুক্ত করিয়া সময়ে সময়ে মাটি খুসিয়া দেওয়া আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে হাপোরে সার ছড়াইয়া দিলে গাছগুলি সবল ও সুশ্রী হইয়া থাকে। যথাসময়ে হাপোরে জল দেওয়া আবশ্যক একথা বলা বাহুল্য।

গাছ ফলশালী হইবার উপায়।

নানা কারণে গাছে ফল আইসে না। গাছ রুগ্ন বা পীড়িত হইলে অথবা অতিরিক্ত তেজাল হইলে গাছে ফল হয় না, একথা নূতন নহে। রুগ্ন গাছের রোগের কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিবিধান করা নিতান্ত প্রয়োজন। গাছের গোড়ায় জল জমিলে বা মাটি খারাপ হইয়া গেলে, গাছের শিকড়ে বা অবয়বে নানা কীটের আবাস হয়। আকার দেখিয়া যদি বোধ হয় যে গাছটী রুগ্ন হইয়াছে, তাহা হইলে প্রথমতঃ উহার অবয়ব পরীক্ষা করিতে হইবে এবং কোন কীট বা তাহার বাসা কিম্বা ডিম্ব দেখিতে পাইলে তাহা অবিলম্বে নষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। কীটগণ গাছের কাণ্ড ও শাখা ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে বাসা করে। পত্রেও বহুকীট বাস করে। এইরূপ কীটাক্রান্ত স্থান কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। পীচ, আম্র, লিচু প্রভৃতির কাণ্ড হইতে সময়ে সময়ে আটা নির্গত হয়। বৃক্ষাবয়বে কীট প্রবেশ না করিলে প্রায় আটা বাহির হয় না। যে গাছে আটা বাহির হইতে দেখা যাইবে, তাহার সেই অংশ সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা কেবল কাটিয়া দিলে চলিবে না,—যতদূর সেই গর্ত্ত বা কীট প্রবেশের দাগ দেখা যাইবে, ততদূর কাটিয়া বারম্বার উষ্ণ জল দ্বারা ধৌত করিয়া দিতে হইবে। অতঃপর চারিভাগ রঞ্জনের সহিত একভাগ মসিনার তৈল অগ্নির উত্তাপে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ভবিষ্যতে আর তথায় কীটের ভয় থাকে না। যে কীট দষ্ট গাছে এইরূপে ছুরি প্রয়োগ অসম্ভব, তাহাতে সূক্ষ্ম মুখবিশিষ্ট পিচকারী সাহায্যে কার্ব্বলিক সাবান ও তামাকের জল দিয়া ধৌত করিয়া

পরে ঐরূপ প্রলেপ দিতে হইতে। এইরূপে পিচকারী প্রয়োগে যদি ক্ষতস্থান হইতে কীট না বাহির হয়, তাহা হইলে কোন ফলই হইল না। গাছের মধ্যে কীট রাখিয়া প্রলেপ দিলে উক্ত কীট অন্যদিক দিয়া বাহির হইবে এবং বৃক্ষের মধ্যে অধিকতর ক্ষতি করিবে।

গাছের শিকড়ের কোন অংশে কীট দষ্ট হইলে তাহারও এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং গাছের গোড়ার মাটি তুলিয়া কয়েক দিবস তাহাতে রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইয়া যথানিয়মে নূতন মাটি দ্বারা গোড়া পুনরায় ঢাকিতে হইবে।

পাতায় পোকা লাগিলে পাতাগুলি ভাঙ্গিয়া একেবারে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলা আবশ্যক। নানাবিধ কীটের আক্রমণ হইতে গাছ রক্ষা করিতে হইলে বাগানে আদৌ জঙ্গল হইতে দিবে না—গাছের গোড়ায় জল বসিতে দিবে না। মধ্যে মধ্যে মাটি কোপাইয়া আলগা করিয়া দিবে এবং মাটি খারাপ হইয়া গেলে উহার কতকাংশ একেবারে তুলিয়া ফেলিয়া দিয়া নূতন মাটি দ্বারা সেই স্থান পূর্ণ করিয়া দিবে। ইহা ব্যতীত গাছকে নীরোগ করিবার আমরা কোন উপায় দেখি না। রোগ প্রশমিত করিবার চেষ্টা অপেক্ষা রোগোৎপত্তির কারণ নিবারণ করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কার্য্য।

অনেক গাছ মুকুলিত হয় কিন্তু ফল ধারণ করে না। এইরূপ গাছে মুকুল ধরিলে গোড়ায় উত্তমরূপে সার প্রদান ও জল সেচন করা আবশ্যক। এই সময়ে সহসা গাছে শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারিলে ফল হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। বিনা উপাদানে যেমন কোন সামগ্রী নিয়মিতরূপে নির্মিত হইতে পারে না, সেইরূপ

কোন সার ব্যতিরেকে গাছে যথেষ্ট বা ভাল ফল হইতে পারে না। জল ও বাতাসে গাছ জীবিত থাকিতে পারে কিন্তু তাহাকে ফলশালী করিতে হইলে যথোপযুক্ত সার দেওয়া উচিত। সার সংযোগে গাছ পুষ্ট হয় ও ফল ধারণ করে। ফলকর গাছের জন্য ক্ষার, মাছের কাঁটা ও অস্থিসার বিশেষ ফলপ্রদ।

শতকরা ৮ ভাগ যবক্ষারজান এবং ১২ ভাগ ফস্‌ফরিক এসিড বিশিষ্ট সার গাছে প্রদান করিলে তাহার ফল সুমিষ্ট ও সুগন্ধ যুক্ত হয়। আবার শতকরা তিনভাগ যবক্ষারজান, ৯ ভাগ ফস্‌ফরিক এসিড এবং ১১ ভাগ ক্ষারবিশিষ্ট সারে অধিকতর মিষ্ট ও সুগন্ধযুক্ত ফল হয়। মিঃ লুকাস (Mr. F. Lucas) নামক একজন বিচক্ষণ ফলতত্ত্বজ্ঞ সাহেব বলেন যে, যে সারে ১৬ ভাগ সুপার-ফসফেট আছে, তাহা ফলের গাছে দিলে ফল অতি মিষ্ট ও সুঘ্রাণ হয়।* পেইল বা জীব-জন্তুর মলমূত্রের সহিত ৪৮ ভাগ সাজি মাটি ও ৪৮ ভাগ ফসফেট থাকিলে ফলের মধ্যস্থিত অপ্রিয় আঘ্রাণ দূর হইয়া ফল মিষ্ট হয় এবং তাহার সৌরভ মধুর ও প্রিয় হইয়া থাকে।

সার প্রয়োগে গাছ ফলশালী হয়, কিন্তু অপরিমিত সার দিলে আবার ষাঁড়াইয়া যায়। গাছ অতিশয় তেজাল ও ফলহীন হইলে, তাহাকে ষাঁড়া বা ষাঁড়া গাছ কহে। ফলকরের গাছ রোপণ করিবার উদ্দেশ্য ফল উৎপাদন করা, সুতরাং তাহাতে অতিরিক্ত শাখা প্রশাখা জন্মিলে লাভ না হইয়া ক্ষতি হয়। অকর্ম্মণ্য শাখা প্রশাখাগুলিকে একেবারে ছেদন করিয়া দিলে বৃক্ষের অপরাপর অংশে সেই রস গিয়া থাকে, ফলতঃ বৃক্ষের

* Gardener's Chronicle

উপকার হয়। অকর্ম্মণ্য শাখা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত, উদ্ভিদ মধ্যে অতি শীর্ণ, ক্ষুদ্র ও বৃদ্ধিহীন নিস্তেজ শাখা প্রশাখা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগেরও বিনাশ সাধন করা উচিত। অনেক বৃক্ষের নিম্নদেশস্থ শাখা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া ভূমিতে সংলগ্ন হইয়া থাকে, তন্নিবন্ধন বৃক্ষের তলদেশে আদৌ রৌদ্র বা বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। এই জন্য নিম্নদেশস্থ শাখাপ্রশাখা এরূপ করিয়া ছাঁটিয়া দিতে হয় যে, একজন লোক অনায়াসে গাছের নিম্নে যাইতে পারে ও তথাকার ভূমি কুদ্দালিত করিয়া দিতে পারে। এ প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমি সহস্র আম্র, নীচু, কাঁঠাল প্রভৃতি বৃক্ষকে ফলশালী করিতে সক্ষম হইয়াছি। ভাল ফল জন্মাইতে হইলে শাখা-প্রশাখার সংখ্যা হ্রাস করিয়া দিতে হয়।

কোন গাছ হইতে শীঘ্র ও অধিক ফল লাভের জন্য অন্যায় চেষ্টা করা উচিত নহে। গাছের যেমন বয়ঃক্রম ও শক্তি, সেই অনু-পাতে ফল হইতে দেওয়াই সর্ব্বতোভাবে উচিত। অল্পবয়স্ক গাছে তাহার শক্তির অতীত-পরিমাণ ফল উপর্য্যুপরি জন্মিলে, কয়েক বৎসর মধ্যেই তাহা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। উদ্যানকের উচিত, প্রকৃতির অনুসরণ করা, প্রকৃতিকে সাহায্য করা। বলপূর্ব্বক ফলোৎপাদনের চেষ্টাকে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক উপায় কহে। এরূপ অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করা বিচক্ষণ ব্যক্তির কার্য্য নহে। যে পরিমাণে সার দিলে, জল সেচন করিলে অথবা অপরাপর পাট করিলে প্রকৃতির সহায়তা হয় এবং গাছেরও উপকার হয়, সেইরূপ প্রণালীতেই উদ্যানের সকল কার্য্য সমাধা করা উচিত। শাক-সব্জী বা ধান্য, গোধূম প্রভৃতি মেঠো

ফসলের পক্ষে প্রচুর সার দেওয়ায় লাভ আছে, কেননা একবার ফসল প্রদান করিলেই উহাদিগের কার্য্য শেষ হইল কিন্তু ফলের গাছের যখন তাহা নিয়ম নহে, তখন রহিয়া-বসিয়া ফলভোগ করা উচিত। আশু লাভের লোভে ইচ্ছা করিয়া ভবিষ্যতের আশায় বঞ্চিত হওয়া উচিত নহে।

আম, কাঁঠাল প্রভৃতি অনেক বৃক্ষের ত্বক বিদীর্ণ হইয়া আটা বা রস নির্গত হয়। রসাতিশয্য ইহার কারণ। গাছের গোড়ার প্রশস্ত চক্রব্যাপী মাটি উত্তমরূপে কুদ্দালিত করিয়া দিলে আটা নির্গমন রোধ হইতে পারে।

অতি বৃদ্ধিশীল গাছ ফল ধারণ করে না। ইহাদিগের বৃদ্ধি স্থগিত করিবার জন্য ডাল পালা ছাটিয়া দিতে হয়, কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখার কোন কোন স্থানে কাটারির আঘাত করিলে রস নির্গমন হয় তাহার ফলে বৃদ্ধির গতি মন্থর হইয়া উদ্ভিদকে ফল ধারণে সক্ষম করে।

ফলোন্মুখী গাছের পাট

যে গাছে যে সময়ে মুকুল দেখা দেয়, তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাত থাকা উচিত, কেননা তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায়, কোন্ সময়ে কোন্ গাছের কিরূপ পাট করা উচিত। যে বৃক্ষ যে সময়ে মুকুলিত হয়, অন্ততঃ তাহার ২।৩ মাস পূর্ব্বে তৎসংক্রান্ত সমুদায় পাট শেষ করিতে হইবে। গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া, জমিতে হলচালনা করা, গাছ ছাঁটিয়া দেওয়া—এ সকল কার্য্যই ইতঃপূর্ব্বে

সম্পন্ন করিয়া রাখিতে হইবে। বিলম্ব হইয়া গেলে পরিচর্য্যার উপকারিতা উদ্ভিদগণ বুঝিতে পারে না। তাহা ছাড়া মুকুলিত হইবার প্রাক্কালে গোড়ার শিকড় কাটিয়া গেলে, অথবা তাহার ডালপালা ছাঁটিয়া দিলে গাছ জখম হইয়া পড়ে— এবং সেই চমকিত অবস্থা হইতে সহজ অবস্থা লাভ করিতে কিছু দিন সময় চলিয়া যায়, ফলতঃ হয়ত মুঞ্জরিত হইতে পারে না, কিম্বা মুঞ্জরিত হইলেও তেমন ফলদায়ক হইতে পারে না।

যে সকল গাছে জল দেওয়া হইয়া থাকে, ফুল ধরিবার কিছু দিন পূর্ব্বে তাহাতে জল সেচন করা একেবারে বন্ধ করিতে হইবে। জমি অতিশয় রসাল বা ভিজা হইলে মাটি বারম্বার উত্তমরূপে উলট-পালট ও চূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। গাছে ফুল ধরিলে শুষ্ক জমিতে একবার জল সেচন করা এবং ফল যত বড় হইতে থাকিবে, তত জলের পরিমাণ বৃদ্ধি ও সময়ের ব্যবধান হ্রাস করিতে হইবে। এ সময়ে মৃত্তিকায় রসাভাব হইলে মুকুল ঝরিয়া যায়, ফলও পড়িয়া যায়। ফল ঈষৎ বড় হইলে পিচকারী সাহায্যে সমগ্র গাছ মধ্যে মধ্যে ভিজাইয়া দিতে পারিলে গাছে ফল অধিক দিন স্থায়ী হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফলকর জমির পরিচর্য্যা

সাধারণ বাগান-বাগিচায় ঔদ্যানিক নিয়মের প্রতি কেহ বড় লক্ষ্য রাখেন না, তাহার ফলে অধিকাংশ গাছপালাই বন্ধ্যাবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া উদ্যানস্বামীর ভূমি অধিকার করিয়া থাকে, নিকটস্থ গাছপালার আওতা উৎপাদন করে, ভূগর্ভে শিকড় বিস্তার করিয়া অপরাপর বৃক্ষাদির শিকড় প্রসারণের পথ কণ্টকাকীর্ণ করে। ভূমির আয়তন বুঝিয়া গাছের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইলে সকল দিকেই সুবিধা হয় কিন্তু লোকের আকাঙ্খা সমুচ্চ, সখ ততোধিক কিন্তু আয়ত্তাধীন ভূমির আয়তন সঙ্কীর্ণ। এই কারণ বশতঃই ফলকরের বাগান করিয়া আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। কোন্ গাছের কত বৃদ্ধি, কোন গাছের প্রকৃতি কিরূপ, এ সকল প্রাথমিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যথেচ্ছভাবে গাছ রোপণ করা হয় বলিয়া সাধারণ বাগানের অবস্থা শোচনীয় হইয়া থাকে।

অল্পপরিসর বাগানের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের গাছ রোপিত হইয়া থাকে, অথচ বৃক্ষ বিশেষের জন্য যথাযোগ্য স্থান দেওয়া হয় না, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে বাড়ন্ত অর্থাৎ দ্রুতবৃদ্ধিশীল গাছগুলি মন্থর-বর্দ্ধকদিগকে ঢাকিয়া ফেলে। এইরূপে সমগ্র বাগান একটী বৃহৎ ঝোপে পরিণত হয়, সকল গাছই শীর্ণ হইয়া পড়ে। ঈদৃশ অকর্ম্মণ্য বাগানের সংস্কার করিতে হইলে কতকগুলি গাছ একবারে

কাটিয়া ফেলিতে হয়, কতকগুলি গাছের শাখাপ্রশাখা ছাঁটিয়া দিতে হয়। এইরূপে বাগানের মধ্যে যথেষ্ট রৌদ্র ও বাতাস প্রবেশের পথ করিয়া দিতে হয়। এই সকল উপায় অবলম্বন করিলে তবে গাছপালা ফল প্রদান করিতে সমর্থ হয়। গাছ কাটিতে মায়া করিলে চলিবে না।

অতঃপর স্বাস্থ্যহিসাবেও এরূপ ঘনান্ধকারময় বাগান স্পৃহনীয় নহে। বাস্তুভিটার মধ্যে গাছপালা রাখিতে হইলে অতি অল্প সংখ্যক গাছ,—এবং তাহাও খুব দূরে দূরে—রোপণ করা উচিত। বাসস্থানে বা তাহার নিকটে গাছ রোপণ স্বাস্থ্যের অনুকুল কিন্তু অতি-রোপণ সমধিক বিপজ্জনক। পল্লীগ্রামের সকল বাড়ীতেই সূর্য্যালোক ও বাতাসের পথ উন্মুক্ত থাকিলে সমগ্র গ্রামই স্বাস্থ্য-কর হইয়া উঠে।

যে ভূমিখণ্ডকে বাগানরূপে গ্রাহ্য করিতে হইবে তাহা সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হয়। উক্ত ভূমিখণ্ডে স্বভাবজাত আগাছা ও বন-জঙ্গল জন্মিতে দিলে ভূগর্ভ মধ্যে ইহাদিগের শিকড় সকল জালবৎ প্রসারিত হইয়া রোপিত গাছপালার শিকড় বৃদ্ধি হইতে দেয় না, তাহাদিগের খাদ্য অপহরণ করে। বৃক্ষলতাদির অবয়বে যথোচিত পরিমাণ শাখাপ্রশাখা এবং পত্রদল না থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, ভূগর্ভে উদ্ভিদ-খাদ্যের অসচ্ছলতা উপস্থিত হইয়াছে। মধ্যে. মধ্যে সেই সকল আগাছার ধ্বংস সাধন করিলে রোপিত বৃক্ষগণ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। বাগান পরিষ্কৃত হইবার ২।১০ দিন মধ্যেই উহাদিগের স্ফূর্ত্তির বিকাশ হয়, এবং অনুধাবন করিলেই স্পষ্টই তাহা উপলব্ধি হয়।

নীরস জমিতে গাছপালার বৃদ্ধি বড়ই মন্থর হয়, সর্দ্দিময় ভূমিতেও

তাহাদিগের স্বাস্থ্য ভাল থাকে না, সুতরাং নীরস জমিতে রস সঞ্চারিত করিবার জন্য যেরূপ বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়, সর্দ্দিময় জমির সর্দ্দি দূর করিবার উদ্দেশ্যে সেইরূপ বা ততোধিক চেষ্টা করা উচিত। ভূগর্ভের নীরসতায় কোন গাছ সহজে মরে না কিন্তু সর্দ্দিতে মরে। জীব জগতেও এ নিয়ম অবিকলিত ভাবে বিদ্যমান। সর্দ্দিতে আমরা দুঃখ কষ্ট ভোগ করি, তাহা হইতে নানা রোগের উৎপত্তি হয়, অবশেষে মৃত্যুও হয়, কিন্তু অনাহার বা অল্পাহারে শীঘ্র কেহ মরে না—ইহা নিত্য দেখিতেছি।

অনেক বাগানে বর্ষাকালের বৃষ্টিতে দীর্ঘকাল জল সঞ্চিত হইয়া থাকিতে দেখা যায়। সে সকল বাগানের—হয় জল নিকাশের উপায় নাই, কিম্বা তাহার সুব্যবস্থা নাই, না হয় জমি অসমতল বা এবড়ো-খেবড়ো বলিয়া উচ্চস্থান সমূহের জল ঢলিয়া নাবাল আবদ্ধ স্থানে সঞ্চিত হয়। উদ্যানতার মূল নীতি অনুসারে ইহার প্রতিবিধান করা উচিত।

মৃত্তিকায় জীবন আছে—একথা বলিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয় কিন্তু জীবনের লক্ষণ যদি কার্য্যশীলতা হয়, তাহা হইলে মৃত্তিকারও যথেষ্ট জীবন আছে। ভূগর্ভমধ্যে উত্তাপ, রস, বায়ু প্রভৃতির যোগে বহু কার্য্য সমাহিত হইতেছে এবং তাহারই ফলে ভূগর্ভমধ্যে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

নাবাল ভূমির বাগান হইতে সহজে জল নিকাশ হইতে পারে—তাহার সুব্যবস্থার জন্য বাগানের চৌহদ্দিবেষ্টিত পগার রাখা উচিত। তাহাতেও জমির সর্দ্দি বিদূরিত না হইলে বাগানের মধ্যে নিয়মিত অাঁতর ব্যবধানে দীর্ঘে ও প্রস্থে পগার খনন করিতে

হইবে। এতদুপায়ে জমির উপরিভাগের সর্দ্দি হ্রাস পায়, উপরন্তু পগারোত্থিত মৃত্তিকা দ্বারা জমিও উচ্চ হইয়া থাকে।

নাবাল ও সর্দ্দিময় জমির রসাতিশয্য দূর করিবার জন্য যেরূপ জল নিকাশের ব্যবস্থা করিতে হয়, উচ্চ কঠিন ও বন্ধুর জমিতে যাহাতে বারমাস রস থাকে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ সকল জমির গর্ভে বর্ষার তাবৎ জল ধরিয়া রাখিতে পারিলে মাটি বারমাস সরস থাকে। বাগানের সমগ্র জমি বারমাস সুকর্ষিত থাকিলে বৃষ্টির তাবৎ জল ভূমিতে শোষিত হইতে পারে, কিন্তু বাগান পরিত্যক্তভাবে থাকিলে অধিকাংশ জলই নিম্নতলে ধাবিত হয়। বাগান সুকর্ষিত থাকিলেও ঘন ঘন ও প্রবল বৃষ্টিতে মাটি বসিয়া যায় সুতরাং তখন মৃত্তিকা পূর্ব্ববৎ রস শোষণ করিতে পারে না, অগত্যা জল বাহিরে চলিয়া যায়। এইরূপে যাহাতে জল বাহিরে যাইতে না পায়, সেজন্য বাগানের চতুর্দ্দিকে এবং বাগানের মধ্যে দীর্ঘে প্রস্থে আল দেওয়া কর্ত্তব্য। বর্ষার জল ধরিয়া রাখিবার প্রথা এদেশে যে নাই তাহা নহে। কৃষক, উদ্যানক ও গৃহস্থ—সকলের নিকট ইহা বিদিত আছে। বর্ষাকাল সমাগত হইবার পূর্ব্বে, খরানির সময় অনেক বাগানের কেবল গাছের গোড়া কুদ্দালিত বা কর্ষিত হয়, আবার কোন কোন জেলায় গাছের গোড়ায় প্রশস্ত ও গভীর খাদ খোদিত হয় এবং বর্ষাকাল উত্তীর্ণ হইলে সেই খাদ পুনরায় মাটি দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। এ সকল প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য—ভূগর্ভে বর্ষার জল বাঁধিয়া রাখা।

কেবলই কুদ্দালন বা কর্ষণে সকল উদ্দেশ্য সফল হয় না। কুদ্দালন বা কর্ষণ—যাহাই হউক, মৃত্তিকা সঞ্চালনের পর বনজঙ্গলাদির

শিকড় সাধ্যমত বাছাই করিয়া ফেলিতে না পারিলে সেই সকল আগাছাদিগের বিনাশ সাধিত না হইয়া তাহাদিগের সমৃদ্ধির পথই প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়।

আগাছা ও পরগাছা

যাবতীয় আগাছার মধ্যে সর্ব্ব-ভারত উলু ঘাসের ন্যায় সর্ব্বনাশ-কারী উদ্ভিদ কুত্রাপি দেখা যায় না। কোনও গতিকে একটী উলুবীজ ভূমিতে স্থান পাইলে আর রক্ষা নাই। অনন্তর তাহাকে বীজ ধারণ করিতে দিলে দূরস্থ জমিতেও তাহার আবির্ভাব হয়। উলু,—তৃণ বর্গীয়, কিন্তু স্থায়ী উদ্ভিদ। ২।১টী গাছ আবির্ভূত হইলেই তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া না দিলে তাহারা ক্ষেত্রময় দিন দিন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, ভূমিকে নিঃস্ব করিয়া ফেলে, ফলতঃ সে জমিতে যে সকল গাছ-পালা থাকে তাহারা খাদ্য ও রসাভাবে বিবর্ণ হইয়া যায়, অল্পাধিক পত্রহীন হয়, ফলপুষ্প প্রদানে অসমর্থ হয়। যে বাগানে উলু প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহার আশা ত্যাগ করিতে হয়। পাদপরাজি যতই বৃদ্ধিশীল, সুশ্রী ও ফলশালী হউক, উলুর আক্রমণ নিরাপদে সহ্য করিতে পারে, এমন গাছ ত দেখি নাই। উলুঘাস একই স্থানে আবদ্ধ থাকে না। একবার বীজ ধারণ করিতে পারিলে ইহার বংশবৃদ্ধির আর সীমা থাকে না। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে উলুর শীষ উদগত হয়, তাহাতেই ফুল থাকে। অগ্রহায়ণের শেষভাগে বা পৌষ মাসে দানা পাকিয়া উঠে এবং উড়িয়া স্থানান্তরে ও গ্রামান্তরে গিয়া পড়ে এবং সুযোগমত তাহা

হইতে চারা উদ্গত হয়। যাঁহারা উলুখড়ের জন্য ইহার আবাদ করেন তাঁহারা শীষগুলি পাকিবার পূর্ব্বে যদি শীষ কাটিয়া লন তাহা হইলে উড্ডনশীল উলুবীজ প্রতিবেশীর বাগবাগিচায় উড়িয়া যাইতে পারে না কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, কি উলুচাষী, কি গ্রামবাসীগণ, কেহই সে বিষয়ে লক্ষ্য করে না। এই জন্যই ইহা ভারতব্যাপী জঞ্জালে পরিগণিত হইয়াছে।

এদেশে উলুর আবাদের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, কারণ সাধারণ ভারতবাসীর গৃহাদি ছাদনে ইহা নিয়োজিত হইয়া থাকে। ঘর ছাইবার ইহাই সাধারণ উপাদান। যাহা হউক, বাগানে যাহাতে উহা স্থান পাইতে না পারে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে বাগানে উক্ত দুর্দ্দমনীয় শত্রু উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাহার আমূল সংস্কারে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। উলুর উপদ্রবে বহু বাগান উৎসন্ন গিয়াছে এবং যাইতেছে। দীর্ঘকাল ইহার প্রতিকারে অবহেলা করিলে ভবিষ্যতে যখন তাহার সংস্কার করিতে হইবে তখন বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইবে, তথাপি আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে কি না, তথাপি তাহারা সমূলে বিনষ্ট হইবে কি না সন্দেহ। উলু চাষীগণ ক্ষেত হইতে উলু কাটিয়া লইবার পর ক্ষেতে আগুন জ্বালাইয়া দেয়, গাছের গোড়াগুলি পুড়িয়া যায়, কিন্তু একমাসকাল অতীত না হইতেই সেই সকল বিদগ্ধ গোড়া হইতে নূতন ফেঁকড়ি উদ্গত হয় এবং কিছু দিন মধ্যে পুনরায় সমগ্র ক্ষেত্র বৃহৎ বৃহৎ ঝাড়ে ভরিয়া যায়। যে গাছের পরিচর্য্যার উপাদান—অগ্নি, তাহার জীবন কত কঠিন, ইহা হইতে তাহা বুঝা যায়।

উলুর সমূলে বিনাশসাধন করিতে হইলে খড় কাটিয়া লইয়া

জমিতে আগুন জ্বালাইয়া দিতে হয়, পরে ভূমিকে উত্তমরূপে কুদ্দালিত ও মাটি চূর্ণ করতঃ সাধ্যমত শিকড় বাছিয়া ফেলিতে হইবে। অতঃপর দীর্ঘকাল লাঙ্গল দ্বারা জমি উত্তমরূপে কর্ষণ ও বিদে পরিচালন পূর্ব্বক পুনরায় শিকড় বাছিয়া ফেলিতে হয়। জমির এইরূপ পরিচর্য্যার পর তাহাতে কেন দাল কড়াই যথা,—অড়হর, বুট, মুগ, মটর বা অন্য কোন সৌম্বিক ফসলের বীজ ঘনভাবে বুনিয়া দিতে হয়। এইরূপ ২।১ টা আবাদ হইলে উলু অর্হিন্তত হয়। এস্থলে বলিয়া রাখি যে, যে কোন ফসলের আবাদ হউক, তাহার উদ্ভিদাংশ স্থানান্তর না করিয়া ভূমিতেই পতিত থাকিতে দেওয়া উচিত। ফসলের উদ্ভিদাংশ ভূমিতে পতিত থাকিলে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়।

বাগানের অন্য শত্রু, কয়েক প্রকার পরগাছা (Parasites)। তন্মধ্যে ছোটমন্দা (Loranthus globulus) ও বড়মন্দা (Loranthus longiflorus)—এই দুইটী পরগাছা অপর বৃক্ষের গলগ্রহ স্বরূপ। সচরাচর ইহারা বাঁন্জী নামে অভিহিত। বড়-মন্দার পাতা অনেকটা জামরুল পাতার ন্যায়, কিন্তু ছোট মন্দার পাতা কতক পরিমাণে মল্লিকা পাতার ন্যায় কিন্তু চিকণ নহে। উভয় জাতীয় মন্দা ঝাড়াল এবং কিয়ৎপরিমাণে লতিকাপ্রকৃতি। বড়মন্দার ফুল কমলাবর্ণের কিন্তু ছোটমন্দার ফুল অপেক্ষাকৃত ছোট এবং ফুলের বর্ণ ফিকে কমলা বর্ণের। বারোমাস ফল হয়। সেই ফল কাকপক্ষীগণ আহার করিয়া যেখানে মলত্যাগ করে, সেইখানেই গাছ জন্মে কিন্তু বড় বৃক্ষ ভিন্ন অপর কুত্রাপি ইহাদিগকে জন্মিতে দেখি নাই। কোনও গাছে একটী মন্দা জন্মিলে ক্রমে ক্রমে তাহা বিস্তার লাভ করে। ইহারা আশ্রয়-বৃক্ষের ত্বক

হইতে রস আহরণ করিয়া জীবিত থাকে কিন্তু আশ্রয়-বৃক্ষের শক্তি নাশ করে। ইহারা আশ্রয়-বৃক্ষের রস আহরণ করে কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্ত আমি মন্দাক্রান্ত কয়েকটী আম্রশাখা কাটিয়া আনিয়া গৃহমধ্যে রাখিয়াছিলাম। কয়েক দিন পরে দেখা গেল যে, আম্রশাখার সহিত মন্দাও শুকাইতেছিল। ইহা হইতে স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, আম্রশাখা হইতে রস আহরণ করিয়া মন্দা জীবিত থাকিত।

অনেক বড় বড় গাছে বিশেষতঃ আম্রবৃক্ষে, বিস্তর অর্কিড জন্মে। অর্কিড় গাছসহ আম্রশাখা কাটিয়া পূর্ব্ববৎ গৃহে আনিয়া রাখিয়াও দেখিয়াছি। ইহারা বাঁজির ন্যায় আশ্রয়-বৃক্ষের রস অপহরণ করে না কারণ যে কয়টী অর্কিড্-সহ আম্রশাখা আনিয়াছিলাম তাহারা সকলেই শুকাইতে লাগিল কিন্তু অর্কিডের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাহা ব্যতীত, আরও দেখিয়াছি, স্থানান্তর হইতে অর্কিড্ সংগ্রহ করিয়া শুষ্ক কাষ্ঠ খণ্ডে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিলে বর্দ্ধিত হয়, এবং ফুলধারণ করে। ইহারা তত অনিষ্টকারী নহে, কিন্তু বৃক্ষময় ব্যাপিয়া থাকিলে ইহারাও আশ্রয়-বৃক্ষের গলগ্রহ হইয়া পড়ে। এই জন্য কোনও ফলকর বৃক্ষে অধিক অর্কিড্ জন্মিতে দেওয়া ভাল নহে, আশ্রয়-বৃক্ষ ইহাতে ভার অনুভব করে। কিন্তু, গলগ্রহ বাঁজীদিগকে আদৌ স্থান দেওয়া উচিত নহে। ইহারা শাখাপ্রশাখার যে কোন স্থানে জন্মে যেখানে তাহারা আশ্রয়-স্থানের ত্বকের ভিতর সূক্ষ্ম কৈশিক-মূল প্রবিষ্ট করিয়া আনন্দে রস শোষণ করে সুতরাং ইহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিতে হইবে, এজন্ত উৎপত্তি-স্থানের ছাল চাঁচিয়া ইহাদিগকে নির্ম্মূল করিয়া দিতে হইবে। মন্দাগাছ ভূমিতে জন্মে না, বৃক্ষই ইহাদিগের যোগ্য স্থান। ইহাদিগকে নির্ম্মূল করিতে

অবহেলা করিলে ইহারা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া নিকটস্থ সকল বৃক্ষেই স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বৃক্ষ ও বাগানের সর্ব্বনাশ করে এবং প্রতিবেশীদিগের গাছপালায় আবির্ভূত হয়।

অন্য পরগাছা,—আলগুসি (Cuscuta reflexa)। ইহা একটী অদ্ভুত উদ্ভিদ। আলগুসি, লতিকা বিশেষ। ইহার মূল নাই, সুতরাং ভূমির সহিত সম্বন্ধ নাই, এবং পত্রবর্জ্জিত, সূতার ন্যায় দীর্ঘ ও বৃদ্ধিশীল লতা; বর্ণ হরিদ্রাভ। যে গাছে আশ্রয় লয় তাহাকে লতা দ্বারা জালবৎ এমনি ঢাকিয়া ফেলে যে, তাহার পাতাটী পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। আলগুসি অমরলতা। কোন বৃক্ষে আশ্রয় লইলে কালবিলম্ব না করিয়া তাহার বিনাশ সাধন করা একান্ত কর্ত্তব্য। আক্রান্ত বৃক্ষকে বাঁচাইতে হইলে আলগুসির টুকরা পর্য্যন্ত গাছে থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। কিঞ্চিন্মাত্রও গাছে থাকিয়া গেলে পুনরায় তাহা প্রসারিত হইয়া পূর্ব্ববৎ গাছ ঢাকিয়া ফেলে এবং সুবিধা পাইলে বৃক্ষান্তরে প্রসারিত হয়। আলগুসি যে কেবল বড় বড় গাছ আশ্রয় করে তাহা নহে। বেল, যুঁই প্রভৃতির ন্যায় ছোট গাছও ইহার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পায় না। ইহারা বায়ুমণ্ডল হইতে আহারীয় সংগ্রহ করিয়া জীবিত থাকে, মন্দার ন্যায় আশ্রয়-বৃক্ষের অবয়ব হইতে রস শোষণ করেনা কিন্তু বৃদ্ধিশীলতায়, ইহার নিকট উভয়ই পরাজিত।

অশ্বত্থ, বট, পাকুড় প্রভৃতি কোন কোন গাছে আশ্রয় লইয়া থাকে, তাহাতে গাছের অনিষ্ট হয়। কোন গাছ অপর কোন গাছের স্কন্ধে চাপিয়া থাকিলে শেষোক্ত গাছের কষ্ট হয় এবং তাহার ফলে মরিয়া যায়। এই কারণে বাগানের কোন গাছে

-বাজে গাছকে গলগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে দেওয়া উচিত নহে। ইহারা আর কোনও অপরাধ করুক আর না করুক, গাছের অভ্যন্তরাংশে বায়ু প্রবাহের পথ রুদ্ধ করে সে বিষয়ে সংশয় নাই সুতরাং তাহা ফৌজদারী অপরাধ।

অনেক স্থলে দেখা যায়, বড় বড় গাছে বৃহজ্জাতীয় লতা উঠিয়া তাহাদিগকে আবৃত করিয়া ফেলে। এইরূপে যে সকল বৃক্ষ আবৃত হয়, তাহারা শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া মরিয়া যায়। পত্র নিশ্চয়ই উদ্ভিদের নাসিকা স্বরূপ। পত্রের নিম্নতলে লোমকূপ সদৃশ অসংখ্য কূপ বা ছিদ্র (Stomata) আছে। সেই সকল ছিদ্রই বায়ুমণ্ডল হইতে বাষ্প (Carbonic acid gas) আহরণ করে এবং সেই বাষ্পের প্রয়োজনীয়াংশ,—অঙ্গার-বাষ্প (Carbon) শরীরে ধারণ করিয়া রাখে, অবশিষ্টাংশ,—অম্লজান (Oxygen) বর্জ্জন করে। উক্ত কার্ব্বন উদ্ভিদের পত্রে প্রবেশ লাভ করিলে সূর্য্যের কিরণসহযোগে পত্রহরিৎ (Chlorophyl) উৎপন্ন হয়। আওতার গাছ যে পাঁণ্ডুবর্ণ প্রাপ্ত হয় তাহার মূলীভূত কারণ—পত্রহরিতের অভাব। এ সকল কথা উদ্ভিদ-বিদ্যার অন্তর্গত, সুতরাং বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহা অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু নিতান্ত অবান্তর নহে। এ সম্বন্ধে মোট কথা এই যে, প্রাণী মাত্রই যেরূপ আলোক, উত্তাপ, ও বাতাস না হইলে বাঁচিতে পারে না, উদ্ভিজ্জীবনেও ঠিক এই নিয়ম বিদ্যমান *। এই জন্য কোনও লতাকে গাছে উঠিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

* মৎকৃত 'উদ্ভিজ্জীবন' পুস্তক দেখুন।

ফাও-ফসল

সাধারণতঃ লোকের ধারণা যে, বৃক্ষগণ দণ্ডায়মান থাকিবার যোগ্য পরিমিত স্থান পাইলেই যথেষ্ট, কিন্তু তাহা ভুল। উদ্ভিদগণ ভূপৃষ্ঠোপরি যেরূপ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া অল্পাধিক আকাশ অধিকার করিয়া থাকে, সেইরূপ ভূগর্ভমধ্যে শিকড় সকল জালবৎ প্রসারিত হইয়া অনেকখানি জমি দখল করিয়া রাখে এবং নিকটে প্রতিযোগী বা দাবীদার বৃক্ষলতা না থাকিলে উত্তরোত্তর আরও অধিক দূর বিস্তৃত হয়। কাণ্ডের পরিধিমত স্থানই উদ্ভিদের পক্ষে যথেষ্ট নহে। যে গাছের প্রকৃতি যেরূপ সে গাছ সেইরূপ স্থান অধিকার করিয়া থাকে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম, কিন্তু তাহার ব্যতিক্রম হইলে উদ্ভিজ্জীবনে আঘাত পড়ে। উদ্ভিদ সম্বন্ধে আমাদিগের যতদূর অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহা হইতে আমরা জানিয়া রাখিয়াছি যে, কোন্ গাছের বৃদ্ধি কিরূপ, কোন্ গাছের জন্য কতটা জমির প্রয়োজন, এবং এই জন্য বৃক্ষলতাদিগকে রোপণকালে পরস্পরমধ্যে একটা ব্যবধান বা আঁতের দিয়া থাকি। ঘন ভাবে রোপিত হইলে বৃক্ষগণ উর্দ্ধাংশে দীর্ঘ হয়, শাখাপ্রশাখারও বৃদ্ধি থাকে না। নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি উর্দ্ধবর্দ্ধক এক কাণ্ড উদ্ভিদ হইলেও আকাশ ও ভূমিতে যথাযোগ্য স্থান না পাইলে কতক উদ্ভিদ বৃদ্ধিশীল হয়, অপরগুলি অল্পাধিক আওতায় পড়িয়া খর্ব্বাকার হয়। এই সকল কারণে সকল বৃক্ষকেই যথোচিত স্থান দিতে হইবে।

রোপণকালে সকল উদ্ভিদকেই আমরা যথা পরিমাণ স্থান দিয়া থাকি, কিন্তু ফলকর বাগানের বৃক্ষতলটা খালি পড়িয়া না

থাকে, এই উদ্দেশ্যে অনেক বাগানে আর্দ্রক, হরিদ্রা, আনারস প্রভৃতি অল্পাধিক ছায়াপ্রিয় গাছের আবাদ হইয়া থাকে। এ প্রথার অনুমোদন করা যায় না। বিনা ব্যয়ে কিম্বা অল্প ব্যয়ে জমি হইতে ফাঁকতালে কোন ফসল আদায় করিয়া লওয়া পরিমিতব্যয়িতা মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহার পরিণাম অন্যরূপ হইয়া থাকে। ভূপৃষ্ঠে যে সকল গাছ বর্তমান, তাহাদিগের শিকড় সকল তলাচির (Sub-Soil) চারিদিকে ব্যাপিয়া থাকে, এবং সেই স্থান হইতেই তাহারা আহারীয় সংগ্রহ করে কিন্তু সেখানে অপর ফসলের আবাদ করিলে তাহারা সেই মাটি হইতেই আহারীয় সংগ্রহ করিয়া আসল বৃক্ষদিগের খাদ্যের হস্তারক হয়, ভূগর্ভে উত্তাপ, বাতাস প্রভৃতির গতি রোধ করে, শিকড় প্রসারণেরও ব্যাঘাত ঘটায়। এই সকল কারণে আওলাত-বৃক্ষের বৃদ্ধি ও ফলন কমিয়া যায়, ফলের স্বাদ বিকার প্রাপ্ত হয়, ফলের আকারও ছোট হইয়া যায়।

হরিদ্রা, আরোরুট, আনারস বা আদার ন্যায় ছায়াপ্রিয় কোন ফসলের আবাদ করিতে হইলে তাহার অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। ফলকরের মধ্যে তাঁহাদিগকে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া একবারেই গর্হিত কার্য্য।

যে কারণে ফলকর বাগানে হরিদ্রাদি ফসলের আবাদ নিষিদ্ধ, ঠিক সেই কারণেই গাছতলায় কোনরূপ স্বভাবজাত বনজঙ্গল জন্মিতে দিতে বারণ। ইহারাও ভূমি হইতে খাদ্য অপহরণ করে, শিকড় বিস্তারের স্থান আত্মসাৎ করে ইত্যাদি অনেক রকমে উপদ্রব করে।

গাছতলা আগাছা-জঙ্গলে পূর্ণ থাকিলে বর্ষাকালে মাটির রস শীঘ্র শুকায় না, ফলতঃ পাতালতা পচিয়া বাগানে অস্বাস্থ্যতা আনয়ন করে, ইহাও ভাবিবার কথা।

তৃতীয় অধ্যায়

বীজুর প্রয়োজনীয়তা

সাধারণঃ দেখা যায় কলমের গাছেরই আদর অধিক। কলমের গাছে আসল গাছের ঠিক অনুরূপ ফল হইয়া থাকে এবং অতি শীঘ্র ফল প্রদান করে সত্য, কিন্তু ইহাতে আর নূতন নূতন জাতির সৃষ্টি হইতে পারে না। বীজের গাছ যে সর্ব্বত্র বা সকল সময়ে নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইবে, ইহা মনে করা নিতান্ত ভুল। বীজের চারা না হইলে নূতন জাতি উৎপন্ন হইতে পারে না। একই ক্ষেত্রে ভিন্ন জাতির আম গাছ থাকিলে নানা কারণে বীজকোষে স্বজাতীয় অন্য গাছের গুণ আসিয়া সঞ্চিত হয়, কিন্তু সেই সকল বীজোৎপন্ন গাছ আমরা কলমের জন্য ব্যবহার করি কিম্বা হতাদর করিয়া ফেলিয়া দিই, সুতরাং তাহার ফল দেখিতে পাই না। আমরা যে এত প্রকার আম্র, লিচু, পীচ দেখিতে পাই, তাহাদিগের অধিকাংশই বীজোৎপন্ন গাছ, কিম্বা তাহাদিগের কলম। বীজের মধ্যে কি গুণ নিহিত আছে তাহা আমরা জানি না সুতরাং তাহার ফল কিরূপ হইবে তাহাও জানি না। ফজলী, লেঙড়া, কিষণভোগ প্রভৃতি আম্র উৎকৃষ্ট জাতীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আম্রও ত জন্মিতে পারে। এইরূপ সকল গাছেরই বীজোৎপন্ন চারায়

মিশ্রিত গুণ আসিয়া পড়িবেই। ফজলী ও বোম্বাই আম্র পরস্পর সন্নিকটে থাকিলে মুকুলের সময় মধুমক্ষিকাগণ একের রেণু লইয়া অপরের গর্ভকেশরে কেন না প্রদান করিবে? বায়ুভরেও পুংপুষ্পের বহু রেণু উড়িয়া নানা স্থানে গিয়া পড়ে। ইহাতে অনেক রেণু নষ্ট হয় কিন্তু নিকটস্থ স্বজাতীয় স্ত্রীপুষ্পে পতিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। বায়ু ও মক্ষিকা,—ইহারাই প্রধানতঃ স্ত্রী ও পুংপুষ্পের ঘটকালি করিয়া থাকে। এই উপায়ে স্ত্রীপুষ্পের গর্ভসঞ্চার হইলে তজ্জাত ফল কিরূপ হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। এই জন্য বীজজাত গাছের ফুল বা ফল কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। মক্ষিকা বা বায়ুর মধ্যস্থতায় পুষ্পের গর্ভসঞ্চার—দৈব ঘটনা, কিন্তু প্রতিনিয়ত তাহা সংঘটিত হইতেছে। এইরূপে একের গুণ অপরে গিয়া পড়িলে দ্বিতীয়ের বীজ অবশ্যই অপরের গুণ গ্রহণ করিবে, ফলতঃ সেই বীজোৎপন্ন গাছ ফজলী ও বোম্বাই বিমিশ্রণে এক নূতন প্রকার ফল প্রদান করিবে। বাগানে যে কেবলই ফজলী বা বোম্বাই আম রাখিতে হইবে তাহারও কোন নিয়ম বা আইন নাই। আমাদিগের মতে কোন বীজ হইতে,—অন্ততঃ ভাল গাছের বীজ নষ্ট না করিয়া, চারা তৈয়ার করিতে পারিলে বিশেষ লাভ আছে। বীজের গাছে ঈষৎ বিলম্বে ফল ধরে বটে, কিন্তু অধিক ফল হয় ও দীর্ঘকাল ফল দেয়। আর যদি একটা নূতন জাতির সৃষ্টি হয়, তবে উদ্যানস্বামীর গৌরবের বিষয়, অনেক সময়ে লাভের বিষয়।

বীজের গাছ ও কলম

বীজ হইতে চারার উদ্ভব ইহাই স্বাভাবিক। এতদ্ব্যতীত, যে কোনও উপায়ে চারা উৎপাদিত হউক, তাহা কৃত্রিম। প্রতিষ্ঠিত, মনোনীত বা বিশিষ্ট উদ্ভিদের বংশধারা যথাযথ অবিকৃত ও খাঁটি রাখিবার উদ্দেশ্যেই কৃত্রিম উপায়ে নানাবিধ কলম করিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। অনেক সময় বীজজাত চারার ফল ফুল শস্য, অধিক কি, তাহার আকার ও প্রকৃতি মাতৃবৃক্ষ সদৃশ না হইয়া, সম্পূর্ণ ভিন্ন কিম্বা অল্পাধিক সমভাবের হইয়া থাকে। স্থল বিশেষে মাতৃবৃক্ষে অবস্থান কালেই বীজস্থ ভ্রূণের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, সুতরাং তজ্জাত চারার প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের জন্য ভূমি বা আবহাওয়াকে অপরাধী করিতে পারা যায় না। পাট-তদ্বিরের দোষগুণে অনেক স্থলে চারার ও ফসলের তারতম্য হইতে পারে কিন্তু তাহা হইলেও ইহা স্বাভাবিক নহে।

বীজের অন্য এক বিশেষ গুণ এই যে, ইহা যে মাটিতেই রোপিত হউক, তাহাকে আপনার করিয়া লইতে জানে কিম্বা পারে, এই জন্যই বীজের গাছের প্রকৃতি এত পরিবর্ত্তনশীল। ঈদৃশ পরিবর্ত্তনশীলতা হেতু বীজের গাছ সর্ব্বসাধারণের অপ্রীতিকর হইয়াছে—কিন্তু ইহা একটী বিশেষ গুণ। মানুষের স্বার্থসিদ্ধির পক্ষে অসুবিধাজনক বলিয়া আমরা উক্ত গুণ অমার্জ্জনীয় অপরাধ মধ্যে পরিগণিত করিয়াছি।

আমরা পরমুখনিসৃত বাক্যকেই বেদবাক্য মনে করি কিন্তু সকল কথাই বিচার করিয়া যথাকর্ত্তব্য করিতে হয়। বীজের চারার যে অপবাদ রটিয়াছে তাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে কে চেষ্টা করিয়াছে?

বীজের চারা হইতে ফজলী, নেংড়া, বোম্বাই বা মালভোগের ন্যায় উৎকৃষ্ট আম্র উৎপন্ন হইতে পারিয়াছে, আর এখনই বা তাহা পারিবে না কেন? আমার মনে হয়, স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে পূর্ব্বতন চারাব্যবসায়ীগণ এই কথাটী প্রচার করিয়াছিল, ক্রমে তাহা সংস্কাররূপে জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। যদিই কোন ক্রমে কোন বীজের গাছ নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া বীজ বা আঁটি হইতে চারা উৎপাদনে নিশ্চেষ্ট হওয়া উচিত নহে।

আসল কথা, গাছ পুঁতিয়া কেহ দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে চাহে না। একদিকে বীজের গাছের একটা অপবাদ আছে যে, উহারা বিলম্বে ফল ধারণ করে, অন্যদিকে কলম অপেক্ষাকৃত অল্পদিন মধ্যে ফল প্রদান করে—এই জন্যই বীজের গাছের প্রতি এত অবজ্ঞা এবং কলমের প্রতি এত শ্রদ্ধা।

কলমের গাছ, তজ্জাতীয় কোন একটী বিশিষ্ট গাছের নিকট হইতে কর্জ্জ করা শাখা মাত্র। ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, বীজ ও কলমের ফসলের জন্য সমকালই অপেক্ষা করিতে হয়। আমরা কলম আনিয়া রোপণ করি বলিয়া রোপণের পূর্ব্ববর্ত্তী বয়ঃক্রম হিসাবের মধ্যে আনি না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—আম গাছের কথা বলিব। বীজ বপনের দিন হইতে কলমরূপে ব্যবহৃত হইবার যোগ্য হইতে দুইটী বৎসর সময় লাগে, ইহাপেক্ষা অল্প বয়স্ক চারায় আম্রের ভাল কলম হয় না। মুরসিদাবাদ, দ্বারভাঙ্গা, মালদহ, মহীশূর, পঞ্জাব প্রভৃতি অধিকাংশ দেশেই ৩।৪ বৎসর বয়ঃক্রমের চারা কলম করণে নিয়োজিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমরা দুই

বৎসর ধরিয়া লইলাম। অতঃপর যে শাখার সহিত উক্ত চারার জোড় বাঁধিতে হইবে কিম্বা যে শাখার চোক চারায় সন্নিবেশিত করিতে হইবে তাহার বয়ঃক্রম ন্যূন কল্পে এক বৎসর হইবেই, কারণ ইহাপেক্ষা কচি শাখায় বা চোকে তেজাল কলম হয় না। এক্ষণে চারার বয়সে শাখার বা চোকের বয়স যোগ করিলে তৈয়ারী কলমের বয়ঃক্রম তিন বৎসর হয়। এই তিন বৎসর-কাল আমরা হিসাবের মধ্যে আনি না, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, কলমটী যখন রোপণ করিলাম তখন তাহার বয়ঃক্রম তিনবৎসর বা তাহারও অধিক। এক্ষণে সেই কলম রোপিত হইলে ফলের জন্য উদ্যানস্বামীকে আরও পাঁচ বৎসর কাল অপেক্ষা করিতে হইবে। অতএব, ফল সমাগমের সময় কলমের বয়ঃক্রম আট বৎসর। এ স্থলে আরও একটী কথা বলিবার আছে। কলম তৈয়ার হইয়া গেলে সদ্য সদ্য স্থায়ীভাবে রোপিত না হইয়া কয়েক মাস হইতে দুই-একবৎসর কাল টাপোরে লালিতপালিত হয়--ইহা সাধারণ নিয়ম। সুতরাং স্থায়ীরূপে রোপিত হইবার সময় পর্য্যন্ত লালনপালন কালও কলমে যোগ করিতে হইবে। তাহা হইলে কলমের বয়ঃক্রম চারি বৎসর হইল। এতদ্দ্বারা বুঝা যায়, আম্র-কলম ৮।৯ বৎসরের পূর্ব্বে ফসলরূপে ফল প্রদান করিতে পারে না। ইতিমধ্যে কলমে দুই-দশটি ফল জন্মিতে পারে। তাহাকে আমরা ফসলরূপে গণ্য করি না। বৃক্ষপূর্ণ ফল না হইলে তাহাকে ফসল বলা যায় না। ক্ষুদ্র গাছে ২।৪ টী আম্র ঝুলিতে থাকিলে উদ্যানস্বামীর নয়নের সুখ হইতে পারে,—ক্ষুদ্র বৃক্ষে ফলের শোভা কৌতুহলোদ্দীপকও বটে।

যে সকল ফলকর গাছের চারাগাছ কলমের দ্বারা উৎপন্ন

হইয়া থাকে, তাহাদিগের বীজু রোপণ ইদানীং প্রায় একবারেই উঠিয়া গিয়াছে। যে কেহ ফলের গাছ রোপণ করিতে ইচ্ছা করেন তিনিই কলমের চারার সন্ধান করেন। বীজের চারা বাগান বা অঙ্গিনার জন্মিলে কেহ তাহার প্রতি নজর করে না. কিন্তু এখনও মাঠে বাটে, গৃহস্থের অঙ্গিনায়, নয়াঞ্জুলির পাড়ে অনেক আঁটির আঁব গাছ দেখা যায়। সে সকল গাছ কেহ রোপণ করে নাই, কেহ যত্নও করে নাই। কোন ক্রমে আঁটি পড়িয়া আপনা হইতে জন্মিয়াছে। এই সকল স্বরোপিত বৃক্ষের মধ্যে অনেক গাছের ফলই উপাদেয়, সুমিষ্ট, বেরেসা ও সুঘ্রাণ এবং তাহাদিগের অনেকের স্বতন্ত্র নাম আছে, সে নামগুলি মালিক প্রদত্ত। সে সকল গাছের চারা উৎপন্ন করিবার কেহ চেষ্টা করে না. ফলতঃ গৃহস্থের বাটীতে আবদ্ধ। আঁটির গাছ গৃহস্থ-পোষা, কারণ তাহা প্রচুর ফল প্রদান করে। বয়োবৃদ্ধি সহকারে ইহাদিগের বিস্তার যত বৃদ্ধি পায়, সেই অনুপাতে ফলনও অধিক হয়। আঁটির গাছ স্বভাবতঃ দীর্ঘপরমায়ু। আঁটির আম্রবৃক্ষ গৃহস্থের পাঁচ পুরুষকে ফল প্রদান করে। পাঁচ পুরুষকে ফলপ্রদান করিয়া এখনও দুই-এক পুরুষকে ফলপ্রদান করিতেছে এরূপ আম্রবৃক্ষ বিস্তর দেখা যায়। কলমের আম্রবৃক্ষ সৌখীনের জিনিস। ২০।২৫ বৎসর-কাল ফল প্রদান করিয়া উহারা নিরস্ত হয়, গাছের বৃদ্ধি স্থগিত হইয়া অবসাদের দশা প্রাপ্ত হয়, অথচ কলম, কলমে পরিণত হইবার পূর্ব্ব হইতে যত পরিচর্য্যা, যত যত্ন পায়, আঁটির গাছ তাহার ষোল আনার—এক আনা পায় না,—ইহা স্থির।

আঁটির গাছ দীর্ঘকাল বিলম্বে ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করে, এ সংস্কারের মূলে ভুল আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আঁবের

কলম ফলশালী হইতে ৮।৯ বৎসর সময় লয়। আঁটির গাছও ৮।৯ বৎসরের মধ্যে ফল প্রদান করে এবং কলমের ন্যায় যত্ন পাইলে আরও শীঘ্র এবং অধিক ফলপ্রদান করে। আমরা কিন্তু আঁটির গাছের তাদৃশ,—সচরাচর আদৌ—যত্ন করি না।

কলম অধিক উর্দ্ধগামী হয় না, এজন্য কলমের গাছ হইতে ফল সংগ্রহ করা অনেক সহজ কিন্তু আঁটীর গাছের মূল-কাণ্ডের কিয়দ্দূর উপর হইতে শাখা-প্রশাখা উদ্গত হয় এবং পার্শ্বদেশ অপেক্ষা উর্দ্ধভাগে বৃদ্ধি লাভ করিবার দিকে যেন চেষ্টা অধিক। সহজ ভাষায়, আঁটির গাছ ঢাঙ্গা, কলম খর্ব্ব হইয়া থাকে। আঁটির গাছ হইতে ফল সংগ্রহ করিতে অল্পাধিক কষ্ট আছে।

কেহ কেহ বলেন যে, কলম করিলে ফলের উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে, আবার কেহ কেহ বলেন যে, ভালজাতীয় আঁটির চারায় কলম বাঁধিলে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল ফল হয়। উক্ত মতদ্বয় একবারেই ভ্রান্তিমূলক। ফলোৎপাদন বিষয়ে আঁটির চারার কোন সম্বন্ধ নাই। আঁটির চারা সংযুক্ত শাখায় রস সরবরাহ করে মাত্র। আঁটির চারার দোষ বা গুণে কলমের কিছু আসিয়া যায় না, তবে বীজু অংশ রুগ্ন, নিস্তেজ, কীটদষ্ট বা আঘাত প্রাপ্ত হইলে রসের যোগান কম পড়ে, তন্নিবন্ধন জোড়ের উপরিভাগ শীর্ণ ও অবসন্ন হইয়া থাকে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। কোন কোন স্থলে দেখা গিয়াছে, মালিকের অনবধানতাবশতঃ নিম্নাংশের বীজু হইতে শাখা উদ্গত হইয়াছে, অন্য দিকে জোড়ের উপরিস্থ কলমের অংশও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং যথা সময়ে উক্ত বৃক্ষের উভয় অংশ ফলধারণ করিয়াছে কিন্তু উভয় অংশের ফলে কোনও সাদৃশ্য নাই,—কলমাংশ মাতৃবৃক্ষের ন্যায় এবং বীজুও স্বকীয় জাতিগত

ফল ধারণ করিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, দুইটী ভিন্ন গাছে কলম করিলে বৃক্ষগত কিম্বা ফুলফলগত কোনও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না। ইহা যে প্রকৃতির কি প্রহেলিকা তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ উদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই। আমরা এই মাত্র বুঝিয়াছি যে, মুলচারা (stock) এবং কজ্জীকৃত বা পোষ্যশাখা (scion) পরস্পর সংযুক্ত হইলেও, কেহ কাহারও প্রকৃতি বিকৃত বা সংস্কৃত করিতে পারে না—ইহা ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত।

কলমের গাছ অপেক্ষাকৃত অল্পস্থান এবং আঁটির গাছ তদপেক্ষা অনেক অধিক স্থান অধিকার করে। অল্পায়তন বাগানে বহু বৃক্ষ বা বহুবিধ বৃক্ষ রোপণ করিবার জন্যও অনেকে কলমের পক্ষপাতী কিন্তু কলমের গাছ দীর্ঘকাল ফলপ্রদান করিতে পারে না। জমিতে স্থায়ীভাবে রোপিত হইবার পর কিয়ৎকাল ইহারা তেজাল, ঝাড়াল থাকে। অতঃপর শ্রীহীন ও পাংশুবর্ণ হইয়া দিন দিন অন্তর্ধানাভিমুখে অগ্রসর হয়, ফলন হ্রাস হয়, কিন্তু বীজুগাছ দীর্ঘকাল ফলপ্রদান করে,—দীর্ঘকাল ছায়া প্রদান করে, অবশেষে উদ্ভিদলীলা সাঙ্গ হইলে ভূস্বামীকে যথেষ্ট কাষ্ঠ প্রদান করে।

আঁটির আম্রবৃক্ষ শতাধিক বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া উদ্যান স্বামী ও তাঁহার ৪।৫ পুরুষকে ফলপ্রদান করে কিন্তু কলম ২০।২৫ বৎসর মাত্র ফলপ্রদান করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে, ক্রমে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হয়। এইরূপ সকল গাছপালার বীজের গাছ ও কলমে প্রভেদ আছে। অতঃপর বীজের বা আঁটির গাছ কত উপকারী এবং তাহা কতদূর প্রয়োজনীয় প্রবান্ধন্তরে তাহা বলিব।

ফলকরের ক্রমোন্নতি

জীবজগৎ ও উদ্ভিজ্জগৎ ক্রমোন্নতি-সূত্রের অধীন। আমরা জলে স্থলে ও বায়ুমণ্ডলে অসংখ্য প্রকার জীব ও উদ্ভিদ দেখিতে পাই এবং তাহা ক্রমোন্নতি-সূত্রের ক্রিয়াফল মাত্র। সৃষ্টিকালে এত প্রকার জীব বা এত প্রকার উদ্ভিদ সৃজিত হয় নাই, বরং সেই সুদূর আদিমকালে যে সকল জীবজন্তু ও গাছপালা সৃজিত হইয়াছিল তৎসমুদায় বিশ্বসংসার হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে কিন্তু অনেকের বংশধারা অল্লাধিক পরিবর্ত্তিত আকারে ভিন্ন ভিন্ন যুগে আবির্ভূত হইয়াছে। আদিমাবস্থায় মানবের আকার কিরূপ ছিল তাহা আমরা জানি না কিন্তু পরবর্ত্তী—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের মানবের আকার পরস্পর তুলনা করিলে সত্যযুগের মানবকে আমরা বিরাট-মানব মনে করি। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি,—এই চতুর্যুগে মানবদেহ যথাক্রমে একবিংশতি, চতুর্দ্দশ, সপ্ত এবং সার্দ্ধ ত্রিহস্ত-পরিমিত বলিয়া উল্লিখিত। কালভেদে সকলই সম্ভব, সুতরাং প্রথম যুগত্রয়ের মানবদেহের আকার আশ্চর্য্যজনক বটে, কিন্তু অবিশ্বাস্য নহে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের মানবদেহ অপেক্ষা কলিযুগের মানব আমাদের আকার নিতান্ত খর্ব্ব। এতদ্দ্বারা মনে হয়, বর্ত্তমান মানবজাতি কোন দিন পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবে এবং ক্রমোন্নতির সূত্রানুসারে পুনরায় উত্তরোত্তর দীর্ঘকায় হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সৃষ্টির প্রথম দিন এত প্রকার জীব বা এত প্রকার উদ্ভিদ সৃজিত হয় নাই। ক্রমোন্নতি বিধানানুসারে জীব ও উদ্ভিদ ভেদ প্রাপ্ত হইয়া এক এক বর্গে বহু জাতি, এবং

তাহা হইতে বহু উপজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ক্রমোন্নতির মূলে কতকগুলি কারণ নিত্য ক্রিয়াশীলভাবে বিদ্যমান থাকিয়া জীব ও উদ্ভিদ বংশের ধারা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। দেশভেদ মৃত্তিকাভেদ, পানাহারভেদ, পরিচর্য্যাভেদ, যৌনাচার,—কারণ সমূহের মধ্যে এইগুলি প্রধান। বুদ্ধিমান মানবের নিকট অনেক সময় প্রকৃতির পরাজয় হইয়া থাকে। যে নিয়মের অধীনে জীব ও উদ্ভিদের বংশধারা নিরন্তর পরিবর্ত্তনের দিকে অগ্রসর, মানবকে তাহার ভিতর কিয়ৎ পরিমাণে প্রবেশ করিতে হইয়াছে। এই জন্য আমরা প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া জীব ও উদ্ভিদের ক্রমোন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছি।

ক্রমোন্নতির প্রথম নিয়ম বীজ নির্ব্বাচন। একই গাছের বংশপরম্পরাগত নির্ব্বাচিত বীজ লইয়া ৩।৪ পর্য্যায়কাল গাছ উৎপন্ন করিলে মূল গাছ হইতে পরবর্ত্তী পর্য্যায় সকলের ফুলফল উন্নতি লাভ করে। উৎকৃষ্ট গাছের, উৎকৃষ্ট ফল বপন করিলে যে গাছ উৎপন্ন হয় তাহার ফল অপেক্ষাকৃত ভাল হওয়া স্বাভাবিক। অতঃপর এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের উৎকৃষ্ট গাছের উৎকৃষ্ট ফল হইলে ততোধিক উত্তম ফলদ উদ্ভিদ জন্মিবে। প্রতি পর্য্যায় এই নিয়ম অবলম্বন করিলে আশাতীত ফল পাওয়া যায়, যাবতীয় ফলমূল, তরি-তরকারি ও শস্যাদির উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে, উপরন্তু নূতন নূতন জাতির সৃষ্টি হয়। অল্পজীবী উদ্ভিদে ঈদৃশ পরীক্ষার ফল শীঘ্রই দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি বীজ রোপণ করিয়া তজ্জাত আবাদে যত ফল হয়, তৎসমুদায়ের মধ্য হইতে ফল বাছাই করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে বীজগুলিকে পৃথক করিয়া লইয়া, পৃথক ভাবে চারা উৎপাদন করতঃ প্রত্যেক

প্রকার বীজোৎপন্ন চারাদিগকে স্বতন্ত্র চৌকায় আবাদ করিলে যে কয় প্রকার ফলের বীজ হইতে চারা উৎপাদিত হইয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। এক্ষণে সেই পৃথক পৃথক ফলের স্বতন্ত্র চারা হইতে পূর্ব্ববৎ স্বতন্ত্রভাবে চারা উৎপাদন করিলে উদ্ভিন্ন চারা হইতে যে ফল উৎপন্ন হইবে, তাহাদিগের মধ্যেও তারতম্য পরিলক্ষিত হইবে। যে কোন ফল বা ফুল হউক, তাহার বাহ্যিক আকার বা শ্রীর মধ্যেই যে, সকল পার্থক্য নিবদ্ধ তাহা নহে, তাহাদিগের গুণের মধ্যেও অনেক ভেদ দেখা যাইবে। সুতরাং আকারভেদ ও গুণভেদ বরাবর ঠিক রাখিতে পারিলে প্রত্যেক জাতি হইতে বহু প্রকারের উদ্ভব হইবে ইহা স্থির,—ইহা নিশ্চয়।

অতঃপর সঙ্কর জাতির উৎপত্তির কথা বলিব। সমজাতীয় স্ত্রী ও পুরুষজাত বৎস্য খাঁটি জিনিস। ইংরাজিতে ইহাকে (true to parents) কহে, কিন্তু স্ত্রী ও পুরুষ বিভিন্ন জাতীয় হইলে তজ্জাত সন্তানকে সঙ্কর (cross bred) বলিতে হইবে। উল্লিখিত দুইটী উপায় অবলম্বন করিয়া উদ্ভিদ ব্যবসায়ীগণ নিত্য ব্যবহার্য্য ও সৌখীন তরি-তরকারি ও ফল-ফুল গাছের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন, অনেক নূতন নূতন ফল-ফুলাদির প্রকার বৃদ্ধি করিয়া একদিকে যেমন আপনাদিগের অর্থোপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি মানব সমাজের কল্যান সাধন করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছেন। গৃহপালিত জীবজন্তুপালন-কারীগণও সেই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব পালিত পশুপক্ষীর উন্নতি সাধন করিয়াছেন, নূতন নূতন পশুপক্ষী সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের দেশে সে সকল পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে

কিন্তু আমাদিগের মধ্যে সে চেষ্টা, সে উত্তম, সে একাগ্রতা কোথায়? আমাদের দেশে যাহা নূতন হইয়াছে বা হইতেছে তাহার মধ্যে মানুষের চেষ্টা বিরল।

আমরা ইচ্ছা করিলে নানাপ্রকার উদ্ভিদ সৃষ্টি করিতে পারি। মনোমত স্ত্রী-পুষ্পের গর্ভাশয়ে মনোনীত পুংপুষ্পের রেণু সংক্রান্ত করিতে পারিলে অভিনব প্রকার উদ্ভিদের ভিত্তি হয়, কারণ সেই বীজ হইতে যে গাছ উৎপন্ন হয় তাহার ফুল ফল, গাছের আকার বা প্রকৃতি পিতৃমাতৃ গুণসমম্বিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

অনন্তর গাছের পরিচর্য্যা চাই। উৎকৃষ্ট জাতীয় গাছ হইলেও যথারীতি পাট-তদ্বিরের অভাবে নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইতে অধিক বিলম্ব হয় না। অপকৃষ্ট ফল ফুলের গাছ, প্রকৃষ্ট পরিচর্য্যায় গুণে উৎকৃষ্ট জাতিতে পরিণত হইয়াছে,—এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

অনেক উদ্ভিদ এক দেশ হইতে দেশান্তরে গিয়া স্থান পাইয়া তাহাদিগের প্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটে। অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা বা ফিলিপাইন দ্বীপ-পুঞ্জের গাছ ভিন্ন-জলবায়ু ভারতে আসিয়া স্বকীয় জাতিগত প্রকৃতি রক্ষা করিতে পারে না। ইহারা লাজুক (Shy) উদ্ভিদ। সুতরাং তথা হইতে কোন ফল ফুলের গাছ আমদানী করিতে হইলে জোড়-কলম বা চোক কলমের গাছ আনয়ন করাই শ্রেয়ঃ। জোড় বা চোক, চোঙ, জিব বা তজ্জাতীয় কলমে যে বীজু নিয়োজিত হইয়া থাকে, তাহারা কষ্টসহ বা hardy, এবং সেই জন্য এইরূপ বীজুর প্রয়োজন হয়। ইহারা প্রায় সর্ব্বস্থানের মৃত্তিকা ও জলবায়ুকে আপনার করিয়া লইতে সক্ষম। আমরা যে সকল বীজু কলমে নিয়োজিত করি

তৎসমুদায় প্রায় হীন জাতীয়, সেই জন্ত বাঙ্গালার আঁব লিচুর কলম আমেরিকা বা ফিলিপাইনে গিয়াও তাহাদিগের প্রকৃতি হীনতা প্রাপ্ত না হইয়া আবহাওয়ার বিশিষ্টতা ও সেবার বিশেষত্বহেতু উন্নতি লাভ করিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা উল্লিখিত দেশ সমূহে বহুবিধ ভারতীয় ফলের কলম পাঠাইয়াছি, এবং পরে জানিয়াছি যে, সে সকল উদ্ভিদ অতি আরামে আছে, এবং উত্তম ফল প্রদান করিতেছে। বীজের গাছ হইলে তাহারা স্থানান্তরিত হইবার ফলে বিকৃত হইয়া যাইত, হয়ত মরিয়া যাইত। সেই সকল কলমের ফল লইয়া তাহারা বীজ হইতে কিম্বা স্থানীয় বীজের চারায় সেই সকল কলমের কলম করিলে তাহাদিগের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে, ইহা স্থির। আরও এক কথা এই যে, নবাগত কলমের ফল হইতে চারা উৎপন্ন করিলে সে চারা স্থানীয় আবহাওয়া, অবস্থান প্রভৃতির সহিত সখ্যতা করিয়া লইবে এবং হয়ত রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া নূতন, সম্পূর্ণ-নূতন না হউক, পৃথক প্রকার ফসল প্রদান করিবে।

যাহা আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত আমরা তাহা না করি কেন? বঙ্গের, কেবল বঙ্গের বলি কেন, সমগ্র ভারতের উদ্যমশীল-দিগের জন্য, ফল ফুলের ক্রমোন্নতি সাধনরূপ অসীম ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার মধ্যে স্বদেশীয়তা হাড়ে হাড়ে নিহিত কিন্তু স্বদেশীবাজদিগের সে দিকে দৃষ্টি কই? উক্ত মহীরুহের সামান্য একটী শাখা প্রশাখা দূরের কথা, ফেঁকড়ি লইয়া কাজ করিলে পূরা জীবনে সে কাজ শেষ করিতে পারা যায় না।

বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে বীজের উৎপত্তি এবং বীজই

চারাগাছের মূল। বীজের মধ্যে ভাবী উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ-ভ্রূণ সঙ্কুচিত-ভাবে বিদ্যমান থাকে এবং অবসর ও সুযোগ পাইলেই অঙ্কুরিত হইয়া উদ্ভিদাকার ধারণ করে। বীজ হইতে যে চারা উৎপন্ন হয়, প্রকৃত পক্ষে তাহাকেই চারা নামে অভিহিত করা উচিত। অপর যে কোন কৌশলে চারা উৎপাদিত হয়, তাহা কৃত্রিম উপায়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কলমের চারা ও বীজের চারা স্বতন্ত্রভাবে বুঝিবার ও বুঝাইবার উদ্দেশ্যে, বীজজাত গাছ—চারা এবং কৃত্রিম উপায়লব্ধ গাছ—কলম নামে আখ্যাত। যেহারে বাজোৎপন্ন চারা বাজু নামে আখ্যাত। বীজু নামটী সহজ বলিয়া আমি উক্ত শব্দটী বীজের চারা জ্ঞাপকরূপে গ্রহণ করিয়াছি।

বাগান বাগিচায় রোপণের জন্য সাধারণতঃ লোকে কলমের পক্ষপাতী, কিন্তু এতদুভয়বিধ গাছের অনেক বিষয়ে পার্থক্য আছে ক্রমে তাহা বিবৃত করিব। বীজু বা বীজজাত চারা স্বাভাবিক, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বভাবতঃ উহা জীবের ন্যায় পিতৃমাতৃগুণসমন্বিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, শৈশবাবস্থা হইতে বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া বর্দ্ধিত হয় এবং জাতিগত প্রকৃতি অনুসারে যথা-বয়সে উপনীত হইলে পুষ্প, তথা ফল, ধারণের যোগ্য হয়। ইহার মূল-কাণ্ড কিয়দ্দূর সরল উঠিয়া পরে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। * ইহারা কলম অপেক্ষা দীর্ঘজীবী ও

* আমরা যে সকল শস্য ফল বা মূলের আবাদ করি তাহার অধিকাংশই একবীজদল (Monocotyledenous) কিম্বা দ্বিবীজদল (Dicotyle denous)। তাল, সুপারি, নারিকেল, এবং এই ধরণের গাছ সকল প্রথম বিভাগের, এবং আম, কাঁঠাল, লিচু প্রভৃতি শাখাপ্রশাখাযুক্ত উদ্ভিদ শেষোক্ত বিভাগের অন্তর্গত।

পুপ্রসার উদ্ভিদ হয়। ইহারা দ্বিবীজদলের অন্তর্ভুক্ত। এক বীজ দলের চারা একটী সরল কাণ্ড লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং শাখা প্রশাখা বিস্তার করে না। এই দুই শ্রেণীর গাছের পরস্পরে যেরূপ আকারগত পার্থক্য আছে, ইহাদিগের আভ্যন্তরীণ গঠনবিন্যাস মধ্যে সেইরূপ প্রভেদ আছে। এক কথায় উভয় জাতির মধ্যে আকার ও প্রকৃতি বিষয়ে বিশাল হ্রদ বা ব্যবধান আছে।

দ্বিবীজদল বিভাগীয় যাবতীয় বৃক্ষলতাগুল্মাদি বিবিধ কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত হইতে পারে এবং তাহারা 'কলম' নামে অভিহিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। একদলান্তবর্ত্তী কোন কোন গাছের কলম হইতে পারে, প্রয়োজন হইলে যথাস্থানে বলিব।

যে গাছের বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করা যায়, সে চারা যে সর্ব্বাংশে ও সর্ব্ববিষয়ে মাতৃবৃক্ষ বা আসল গাছের অনুরূপ হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। পিতামাতার সকল সন্তান সমপ্রকৃতির হয় না, পাঁচটী-সমপ্রকারের হওয়া দূরের কথা, দুইটী সমপ্রকারের হয় না, পিতামাতার কিম্বা পিতার বা মাতারও সমতুল্য হয় না। কোন কোন যমজ ভাই সমপ্রকারের হইয়া থাকে, কিন্তু বিচক্ষণতা সহকারে অনুসন্ধান করিলে তাহাদিগের মধ্যে ও পার্থক্য উপলব্ধি হইবে। কোনরূপ স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে পিতামাতাই বা কি প্রকারে তাহাদিগকে স্বতন্ত্ররূপে চিনিতে পারিবেন?

কলমের উদ্দেশ্য

বৃক্ষ বা গুল্মলতাদির কলম করিবার প্রথা এদেশে যে নূতন, তাহা নহে, তবে ইতঃপূর্ব্বে কৃষি বা উদ্যাকার্য্যের কোন একটা নিয়মিত পদ্ধতি না থাকায়, এই বিস্তৃত বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকের গাছে-পালার দিকে একটু দৃষ্টি পড়িয়াছে। বড় অধিক দিনের কথা নহে,—বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এই কলিকাতা মহানগরীতেও কেবল মাণিকতলা ভিন্ন অপর কোথাও গাছপালা বিক্রয়ের আড্ডা ছিল না, কিন্তু এক্ষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারাওয়ালা হইতে বৃহৎ বৃহৎ নর্সরী সকল দ্বারাও প্রতিবৎসর সাধারণের গাছের অভাব পূরণ হইয়া উঠিতেছে না। ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, দেশ মধ্যে বাগ-বাগিচার সখ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সেই সঙ্গে গাছের কলম করিবার চেষ্টা ও ইচ্ছা সকলের বাড়িতেছে। একদিকে যেমন কলম করিবার উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা জানিয়া রাখিলে কার্য্যকালে বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে, অন্যদিকে, চিরপ্রচলিত প্রথামত কলম করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু তৎসম্পর্কীয় শিল্প ও বিজ্ঞানের কোন উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে।

অনেকে অনেক রকম উদ্দেশ্যে কলম করিয়া থাকেন। কেহ গাছের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য, কেহ বা গাছের আকার সুঠাম করিবার জন্য, আবার কেহ বা অল্প দিন মধ্যে গাছকে ফলশালী করিবার জন্য, কলম করিয়া থাকেন। যিনি যে উদ্দেশ্যেই কলম করুন তাহাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু কলম করিবার প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য কি,—তাহা জানিয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

বীজের চারা সকল সময়ে বা সকল স্থানে স্বীয় জাতিগত প্রকৃতি ও গুণ রক্ষা করিতে না পারিয়া প্রকারান্তর প্রাপ্ত হয়। এ স্বভাবটী প্রায় বীজ মাত্রেরই দেখা যায়।

বীজের প্রকৃতি যে নিতান্ত পরিবর্ত্তনশীল তাহার কয়েকটী বিশেষ কারণ আছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রথমতঃ দেখা যায়, গাছ যখন মুকুলিত হয় তখন স্ত্রী-পুষ্প সকল গর্ভবতী হয়, কিন্তু স্বজাতীয় পুং-পুষ্পের রেণু দ্বারাই যে গর্ভসঞ্চার হয় তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, কারণ মক্ষিকা ও বাতাস সাহায্যে এক গাছের রেণু অপর গাছের স্ত্রী-পুষ্পে সঞ্চারিত হইতে পারে এবং এইরূপে সঞ্চারিত গর্ভ হইতে যে বীজ জন্মে তাহাকে সঙ্কর-বীজ বলা যায়। সঙ্কর-বীজ পিতৃমাতৃকুলের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা ধারণকরতঃ তদনুরূপ ফল প্রদান করে. কিন্তু তাহা হইলেও সে ফলে পিতৃগুণের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এই উভয় কুলের শক্তির ন্যূনাধিক্য মত বীজের গুণের ন্যূনাধিক্য হয় অর্থাৎ কখন বা সেই বীজে পিতৃকুলের, কখনও বা মাতৃকুলের গুণ অধিকতর প্রবল থাকে। উৎকৃষ্ট আম্রের সহিত নিকৃষ্ট আম্রের সংযোগ হইলে খাঁটি উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট আম্র না হইয়া উভয়ের মধ্যবর্ত্তী কোন একটী নূতন জাতির সৃষ্টি হইবে। এইরূপে সকল গাছেরই রকম দিন দিন বাড়িতেছে সুতরাং বীজের গাছকে অবহেলা করা উচিত নহে বরং তাহাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা ও পালন করিয়া রাখিতে পারিলে নূতন নূতন রকম লাভ হইতে পারে। সেই গাছে ফল জন্মিলে যদি তাহা মনোমত না হয় তখন তাহাকে কাটিয়া ফেলিলে ক্ষতি নাই। উল্লিখিত প্রণালীতে যে গাছ জন্মে

তাহাদিগকে ইংরাজীতে হাইব্রিড (Hybrid) ও ক্রশ-ব্রিড (Cross-bred) অথবা স্পোর্ট (Sport) কহে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে মনুষ্যও উহাকে ইচ্ছাধীন করিয়াছে। অনেক ফল ফুল এইরূপে উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং করিতেছে।

এতদ্ব্যতীত স্বাভাবিক জলবায়ু ও মৃত্তিকাভেদেও বীজোৎপন্ন গাছের প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। দেশ, কাল ও সঙ্গ বিপর্য্যয়ে যেমন জীবের শারীরিক ও প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে, উদ্ভিজ্জগতের পক্ষেও অবিকল তাহাই হয়। মদীয় শ্রদ্ধেয় বন্ধু মিঃ টি, এন, মুখার্জির নিকট শুনিয়াছি যে, এডেন বন্দরে ও তৎসন্নিকট স্থানে যে বকফুলের গাছ জন্মে, তাহা ৫।৬ হস্তের অধিক উচ্চ হয় না এবং তাহাও সুপুষ্ট হয় না কিন্তু বাঙ্গালা দেশে সেই বকফুলের গাছ ২০।৩০ হাত উচ্চ হইয়া শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট হয় এবং প্রচুর পরিমাণে পুষ্প প্রদান করিয়া থাকে। বাঙ্গালার অনেক গাছ ব্যাঙ্গালোরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। তথাকার রামকৃষ্ণাশ্রমে একটী বকুল বৃক্ষ আছে। তাহার পত্র নিচয় এত স্থূল এবং পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, তাহাকে বকুল বৃক্ষ বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। ভারতীয় গাছপালা বিলাতে কাচ-নির্ম্মিত গৃহমধ্যে জন্মে, কারণ তথাকার আব-হাওয়া এত ঠাণ্ডা যে, ভারতের ন্যায় উষ্ণ দেশের গাছ তথায় সহজে তিষ্ঠিতে পারে না। অধিক দূরের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা আসাম, দারজিলিং সিমলা প্রভৃতি ঠাণ্ডা দেশের প্রতি লক্ষ্য করি তাহা হইলেও এই পরিবর্ত্তন বিশেষ উপলব্ধি করিতে পারিব। আসাম, দারজিলিং প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে চা'র আবাদ হয়, কিন্তু

বাঙ্গালায় তাহা জন্মে না কেন? ঐ সকল স্থানে কমলালেবু যথেষ্ট জন্মে, কিন্তু বহু যত্নেও বাঙ্গালায় তদনুরূপ ফলন বা ফলের আস্বাদ হয় না কেন? ইহার একমাত্র কারণ,—আবহাওয়া ও মৃত্তিকাভেদ।

ঈদৃশ পরিবর্ত্তন রোধ করিবার উপায়, সম্পূর্ণরূপে না হইলেও কতক পরিমাণে, সাধ্যায়ত্ত। কলমই একমাত্র উপায়, কিন্তু সকল রকম কলমই পরিবর্ত্তন রোধক নহে। জোড়-কলম এবং চোক-কলম এতৎপক্ষে বিশেষ উপযোগী।

বীজোৎপন্ন চারা গাছের যেমন স্বভাব পরিবর্ত্তনের দিকে অতিদ্রুত গতি, কলমের গাছের কিন্তু সেরূপ নহে। কলমের গাছের স্বভাব প্রায় মূলগাছের ন্যায় থাকে, এইজন্য আসল গাছ (Mother plant) বা আদর্শ গাছের (Specimen plant) সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার পক্ষে কলম তৈয়ার করাই সুবিধা। এক দেশের বীজোৎপন্ন চারা স্থানান্তরে গিয়া প্রকারান্তর প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু কলমের গাছে সে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবার তত আশঙ্কা থাকে না।

কলমকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, ১ম—কেবলমাত্র গাছের কোন অংশ হইতেই চারা জন্মান; ২য়—এক গাছের চারার সহিত অপর গাছের কোন অংশের সম্মিলন।

কলম-সম্ভব উদ্ভিদ

বৃক্ষ, লতা বা গুল্ম নির্ব্বিশেষে কলম দ্বারা সকল গাছের চারা জন্মে না। উদ্ভিদশাস্ত্রে, উদ্ভিদের অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে যে দুইটী বৃহৎ আছে তাহার একটীর কলম হইতে চারা জন্মে এবং অপরটীর বীজ বা মূল ভিন্ন অন্য কোন কৃত্রিম উপায়ে চারা হয় না। এই দুইটী শ্রেণীর মধ্যে একটীর নাম Exogenous; এবং অপরটীর নাম Endogenous। এই দুই জাতীয় গাছের স্বাভাবিক পরিগঠনের বিভিন্নতা হেতু গাছ দেখিবামাত্রই তাহা কোন জাতীয়, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

বহির্ব্বর্দ্ধক (Exogenous) শ্রেণীর উদ্ভিদের পত্রস্থ শিরা সকল অসরল এবং জালবৎ (Reticulated)। শিরা সকল —পরস্পরের সহিত সংযুক্ত; গাছের পাতা শুষ্ক হইলে বা পাকিয়া গেলে একবারে গাছ হইতে খসিয়া পড়ে; কাণ্ডের শিরা ও প্রণালী সমুহ পত্র-মধ্যাস্থিত শিরা সমুহেব ন্যায় জালবৎ বিন্যস্ত। আম্র জাম, কাঁটাল, লিচু প্রভৃতি বৃক্ষ এবং লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা প্রভৃতি লতা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সকল জাতীয় বৃক্ষ লতাদির কলম হইয়া থাকে।

অন্তর্ব্বর্দ্ধক (Endogenous) শ্রেণীর বৃক্ষাদির পত্র ও কাণ্ডস্থ শিরা সমুদয় পরস্পর সমান্তরাল (Parallel) বাহু রূপে অবস্থিত। পত্রের শেষাগ্রভাগ সুচাগ্রবৎ। গাছ হইতে পাতা সহজে খসিয়া না পড়িয়া অনেকদিন কাণ্ডে শুষ্কাবস্থায় সংলগ্ন থাকে এবং অবশেষে খসিয়া গেলে কাণ্ডে একটা স্থায়ী দাগ থাকিয়া যায়। নারিকেল, সুপারি বা তাল গাছে তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। উক্ত বর্গের

অন্তর্গত বৃক্ষ সমূহে প্রায় গ্রন্থি থাকে না। নারিকেল, সুপারি, তাল, কদলী, খর্জ্জুর, আর্দ্রক, হরিদ্রা, দশবাইচণ্ডা দুব্বা ঘাস, ধান্য, গোধূম প্রভৃতি এই শ্রেণীর গাছ। ইহাদের কলম হয় না। আর্দ্রক সদৃশ মুলবিশিষ্ট গাছের গেঁড় স্বতন্ত্র করিয়া রোপণ করিলে গাছ জন্মে, কিন্তু তাহাকে কলম বলা যায় না। ইহাকে মূল-বিভাগ কহে। উক্ত প্রণালীকে ইংরাজিতে (Division of roots) বলা যায়।

উপরোক্ত দুইটী শ্রেণীর গাছ দেখিয়া যাহাতে সহজে চিনিতে পারা যায় তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা করা উচিত, নতুবা যে-সে গাছে কলম করিয়া অনর্থক পরিশ্রম ও সময় নষ্ট করা কোন মতে বিধেয় নহে। এই অভিজ্ঞতা লাভের জন্য বিশেষ কোন উপায়াবলম্বনের আবশ্যকতা দেখা যায় না। উল্লিখিত কয়েকটি লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিলেই অভিজ্ঞতা সহজেই জন্মিতে পারে। আরও একটী সহজ উপায়—গাছের একটী পত্র সূর্য্যের দিকে বা আলোকের সম্মুখে ধরিলে উহা কোন বর্গের গাছ তাহা সহজে বুঝা যায়। *

* স্থানান্তরে একবীজদল (Monocotyledenous) ও দ্বীবীজদল (Dicotyledenous) উদ্ভিদের উল্লেখ করিয়াছি। ইহাদিগের মধ্যে একবীজদল বর্গীয় উদ্ভিদ মাত্রই অন্তর্বর্দ্ধক (Endogenous) এবং দ্বিবীজদলগণ বহির্বর্দ্ধক (Exogenous)।

কলমের প্রকারভেদ

আজকাল অনেক রকম কলম-প্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার অধিকাংশই প্রাচীন কয়েকটির অল্লাধিক সংস্করণ বা প্রকারান্তর মাত্র। ইতঃপূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, কলম করিবার প্রধানতঃ তুইটী রকম আছে ;—১ম রকম, গাছের অংশ মাত্র লইয়া, এবং ২য়, চারার সহিত অপর গাছের অংশের সংযোজনা দ্বারা। প্রথম প্রকারের অন্তর্গত,—কাটিং বা ডাল-কলম (Cutting), 'গুল' বা 'গুটি'—কলম এবং দাবাকলম (Layering)। দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্গত—চোক (Budding), জিহ্বা বা 'জিভ্' (Tongue Graft), জোড়-কলম (Inarch) ইত্যাদি।

উল্লিখিত কয়েকটি রকম ব্যতীত অনেক গাছের পাতা হইতেও চারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল গাছ গুল্মজাতীর এবং অতিশয় স্থূলপত্রক ও কোমলস্বভাব। ইকিভেরিয়া (Echeveria), বিগোনিয়া (Begonia), জেসনিয়া (Gesnera), হিমসাগর (Bryophyllum) প্রভৃতি এই শ্রেণীর উদ্ভিদ। ফলকরের মধ্যে এ শ্রেণীর গাছ না থাকায় পাতা হইতে কলম করিবার কথা এ পুস্তকে উল্লেখ করিলাম না।

ডাল-কলম, গুল-কলম, বা চোক-কলম করিতে হইলে শাখা ও কাণ্ডটি বিশেষরূপে নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া আবশুক। সাফল্যলাভের ইহা একটি গুহ্য উপায়। অতিরিক্ত স্থূল, পুরাতন ও রুগ্ন শাখায় শীঘ্র অথবা ভাল কলম হয় না। অর্দ্ধ পরিপক্ক কোমল কাণ্ড যেমন বৃদ্ধিশীল রসাল ও স্থূল, রুগ্ন বা পুরাতন শাখা সেরূপ নহে। এজন্ত শেষোক্ত প্রকার শাখা

পরিহার করিয়া অৰ্দ্ধপরিপক্ক তেজাল শাখাতে কলম করিতে হয়। আবার অতিরিক্ত কোমল ও নূতন শাখাতেও কলম করিবার পক্ষে অনেক ব্যাঘাত আছে, কারণ এরূপ শাখার রস এত তরল যে উহাতে অস্ত্রাঘাত করিবামাত্র রস নির্গত হইয়া শাখাটিকে ঝিমাইয়া দেয় এবং অবশেষে সূর্য্যোত্তাপ ও আলোকের সংস্পর্শে ক্রমশঃ শুকাইয়া যায়। এই কারণে অৰ্দ্ধ পরিপক্ক শাখাই কলমের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অৰ্দ্ধ পরিপক্ক শাখা বা কাণ্ডের রস অতিশয় ঘন বা তরল নহে অথচ সূর্য্যোত্তাপ ও আলোক অনেক পরিমাণে সহ্য করিতে পারে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, অনেকে অনেক রকম কলম বাঁধিয়া থাকেন এবং ইহাও দেখিতে পাই—অনেক সময়ে তাঁহাদিগের শ্রম ব্যর্থ হইয়া থাকে। ইহাতে কিন্তু আশ্চর্য্য হইবার কোন কথা নাই কারণ আনুসঙ্গিক সকল বিষয়ে দৃষ্টিহীন হইয়া কার্য্য করিলে এরূপ ব্যর্থ-মনোরথ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। উদ্যান-কলা বা কৃষিকার্য্যে যত সামান্য বিষয়ে পর্য্যন্ত বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে পারা যায়, সাফল্যলাভের আশা তত অধিক ও নিশ্চিত। সাধিলেই সিদ্ধি আছে, ইহা মহাজনের কথা। মহাজনের কথা বৃথা হয় না। সাধকের সাধনার উপরে ফলাফল নির্ভর করে।

ডাল-কলম

CUTTING

গাছ হইতে শাখাকে ছোট ছোট কাঠির আকারে কাটিয়া যে কলম হয়, তাহাকে ডাল-কলম বা শাখা-কলম কহে। কোমল

ও রসাল কাণ্ড বা শাখাবিশিষ্ট গাছের (exogenous) ডাল-কলম হইয়া থাকে। কঠিন কাণ্ড ও ঘন রস বা আটা-বিশিষ্ট গাছের ডাল-কলম শীঘ্র জন্মে না, উপায়ান্তর হইয়া অপরাপর প্রণালীর আশ্রয় লইয়া কলম করিতে হয়।

কলমোপযোগী শাখার বয়ঃক্রমের কথা ইতঃপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রোজন। কলম করিবার পূর্ব্বে উহাকে বসাইবার জন্য কোন ছায়াবিশিষ্ট ঠাণ্ডা জায়গায় হাপোর বা জখিরা করিয়া রাখিতে হইবে। তদনন্তর উপযুক্ত শাখা কাটিয়া আনিয়া, প্রত্যেক শাখাকে ৬ হইতে ৯ ইঞ্চ দীর্ঘ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিবে। এইরূপে খণ্ড খণ্ড করিবার কালে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক খণ্ডের উভয় পার্শ্বে যেন একটি চোক্ বা গ্রন্থি থাকে, এবং ইহাও দেখিতে হইবে যে, সেই উভয় শেষাংশ লিখিবার কলমের ন্যায় ঈষৎ হেলাইয়া কাটা হইয়াছে।

১ ২
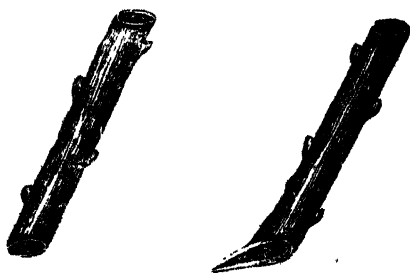
কলমগুলিকে এক্ষণে পুতিয়া দিতে হইবে। অনেকে কলমগুলিকে পাতাসমেত রাখিয়া থাকেন কিন্তু তাহাতে এক দোষ

হয় এই যে, পাতাগুলি কলমে সংলগ্ন থাকায় কলমটি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তবে কলমের উপরিভাগে দুই একটি পত্র থাকিলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কলমগুলিকে জমিতে ঈষৎ হেলাইয়া বসাইলে শীঘ্র শিকড় জন্মে। ডাল-কলম কাটিবার রীতি ও জমিয়াতে বসাইবার পদ্ধতি বুঝিতে হইলে চিত্র (নং ১ ও ২) দেখুন।

দ্বিতীয় প্রকারের ডাল-কলম যে প্রণালীতে কাটিতে হয় তাহাও ২ নম্বর ছবি দৃষ্টে বুঝা যাইবে। উক্ত কলমের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয়ই অনুসরণীয়, তবে ইহার জন্য যে শাখার আবশ্যক হয় তাহা কাণ্ড বা শাখাপার্শ্বস্থ হওয়া চাই। ইহাকে ফেঁকড়ি, Off-shoot, বা Side-shoot কহে। মূল গাছ হইতে উক্ত শাখাটিকে এরূপ সাবধানে স্বতন্ত্র করিয়া লইতে হইবে যে, তাহার গোড়ায় মূল-শাখা বা কাণ্ডের ত্বক কিয়ৎ পরিমাণেও সংলগ্ন থাকে। ইহাতে পাণ্ডিত্য বা কারুকার্য্য কিছুই নাই, তবে ২য় চিত্রের নিম্নভাগ দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উহার পাদদেশে যেন জুতার গোড়ালী সংলগ্ন, এই জন্য উক্ত অংশকে 'গোড়ালী' বা heel কহে। কিঞ্চিৎ সাবধানতা ও অভিজ্ঞতা আবশ্যক।

জোড়-কলম

GRAFT

জোড়-কলম, চোক-কলম প্রভৃতি নানা প্রকার কলম আছে; তদ্দ্বারা মনোনীত গাছের সংখ্যা শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হওয়া ব্যতীত

আরও একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, এরূপ কলম রোপিত হইবার পর অপেক্ষাকৃত শীঘ্র ফলশালী হয়। চারা বা মূল-গাছের (Stock) শিকড় ও কাণ্ড সাহায্যে পোষ্যশাখা বা চোকের পোষণোপযোগী কোন পদার্থের অভাব না হয়, ফলতঃ শীঘ্র বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই কারণে অনেক বড় বড় গাছও অল্পদিন মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। কোন একটি অপ্রীতিকর কুল বা পীচ গাছকে ইচ্ছা করিলে তাহার শাখাপ্রশাখা কাটিয়া ফেলিয়া, মূলকাণ্ডে যদি ভাল জাতীয় কোন কুল বা পীচের শাখার জোড় লাগাইয়া দেওয়া যায় কিম্বা চোক বসান হয় তাহা হইলে সে বৃক্ষে আর তাদৃশ জঘন্য ফল না হইয়া অল্পদিন মধ্যেই অভিজাত ফল উৎপন্ন হইতে থাকিবে।

জোড়-কলমের জন্য বীজু অথবা ডাল কলমের (Cutting) আবশ্যক হয়। উক্ত চারা অন্ততঃ দুই বৎসরের হওয়া উচিত কারণ তাহা না হইলে উহার কাণ্ড কোমল থাকিবে। এইরূপ এক বা দুই বৎসরের চারা যদি টবে বা গামলায় থাকে ত ভালই নতুবা তাহাকে টবে তুলিয়া রাখিতে হইবে। পরে যে বীজুর সহিত জোড় বাঁধিতে হইবে, তথায় তাহাকে লইয়া গিয়া, যে শাখাটীর সহিত জোড় বাঁধিবে সেই থানে তাহাকে ভালরূপ স্থাপন করিতে হইবে। শাখাটী যদি উচ্চে থাকে অর্থাৎ জমিতে টব রাখিলে বীজু ও শাখায় সহজে সংলগ্ন হইবার সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলে মাচান করিয়া তাহার উপরে চারাটীকে রাখিয়া, বীজু ও শাখায় জোড় বাঁধিতে হইবে। চারা অপেক্ষা শাখাটীর বয়স বা স্থূলতা অধিক না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

জোড় বাঁধিবার সময় বীজু ও শাখার কাণ্ডের ত্বক সহ তীক্ষ্ণ

কাষ্ঠ ছুরীদ্বারা ঈষৎ পরিমাণে তুলিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপে কাটিবার পূর্ব্বে বীজু ও শাখাকে ধীরে ধীরে টানিয়া পরস্পর সংলগ্ন করিয়া দেখিতে হইবে যে, ঠিককোন্ স্থানে উভয়ে ভালরূপ সম্মিলিত হইতে পারে। এইরূপে যে স্থানে সম্মিলন হওয়া সম্ভব, বীজু ও অভিজাত শাখার সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে ছুরী দ্বারা দাগ দিয়া উভয়কে স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিতরূপে কাটিতে হইবে। কলম কাটিবার ছুরী তীক্ষ্ণ হওয়া আবশ্যক। এতদর্থে (Budding Knife) প্রশস্ত। সাবধান, কর্ত্তনকালে যেন কাণ্ড বা যোজ্য শাখা না ভাঙ্গিয়া যায় অথবা অতিরিক্ত না কাটিয়া যায়। যে স্থান কাটা যাইবে তাহা ৩।৭ অঙ্গুলি দীর্ঘ হইলেই চলিবে, কিন্তু গভীরতা সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, কাণ্ডের স্থূলতার সিকি অংশ হইতে এক তৃতীয়াংশ কাটিলেই যথেষ্ট কিন্তু তথাপি শিল্পীকে এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হইবে। তদনন্তর বীজু ও শাখার কর্ত্তিকাংশ একত্রে সম্মিলিত করিয়া ধীরে অথচ দৃঢ়তা সহকারে এরূপভাবে বাঁধিতে হইবে, যেন সেই জোড়ের ভিতর দিয়া বায়ু সঞ্চালিত হইতে না পারে। বায়ু ও আলোক প্রবেশের পথ রোধ করিবার জন্য জোড়ের উপরে এঁটেল মাটি উত্তমরূপে লেপিয়া দিতে হয়। ইহাতে কার্য্য সিদ্ধি হয় বটে, কিন্তু অনেক সময়ে বৃষ্টিতে তাহা ধৌত হইয়া যায়, এজন্য রজন ও টার্পিনতৈল একত্রে অগ্নিতে গলইয়া সমগ্র জোড় ঢাকিয়া ঘন প্রলেপ দিলে ভাল হয়। জোড় বাঁধিবার জন্ত কঠিন দড়ির পরিবর্ত্তে পাট, শণ, পশম বা কলার ছোটা ব্যবহার করা ভাল কারণ ইহারা একদিকে যেমন শক্ত, অন্যদিকে তেমনি কোমল ; সুতরাং ঈদৃশ রজ্জু দ্বারা বাঁধিলে গাছে আঘাত লাগে

না এবং সহজে ছিঁড়িয়া বা পচিয়া যায় না।

আষাঢ় মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত জোড় কলম বাঁধিবার উত্তম সময়। উক্ত কয়েক মাস উদ্ভিদের শিরা সমুদায় এবং কাণ্ড শাখাপ্রশাখাদি রসে পূর্ণ থাকে, রসের প্রবাহ দ্রুত থাকে এবং রস তরল থাকে। এই সকল কারণে অতি সত্বরেই বীজু ও শাখার জোড় লাগিয়া যায়। শীতকালে গাছ-পালা জড়সড় হয়, শিরাসমূহ কুঞ্চিত এবং রস ঘন হয়, ফলতঃ জোড় মিলিত হইতে বিলম্ব হয়। গ্রীষ্মকালে বৃক্ষলতার শিরাদি আলগা এবং রস পাতলা থাকে বটে, কিন্তু এ সময়ে কলম বাঁধিলে ক্ষতস্থান হইতে অনেক রস শুষ্ক হইয়া যায়, এইজন্য এ সময়েও জোড়-কলম করা প্রসিদ্ধ নহে।

বীজু ও শাখার স্থূলতা ও কোমলতা, ঋতুর অবস্থা ও শিল্পীর কার্য্যকুশলতা অনুসারে উক্ত জোড় সম্মিলিত হইতে ১০ দিন হইতে একমাস সময় লাগে। জোড় সম্মিলিত হইলে জোড় স্থানের চারা গাছের উপরিভাগস্থিত অংশটী কাটিয়া ফেলিতে হয় এবং তাহা হইলে বীজু গাছের সমুদায় রস ও শক্তিসংযুক্ত শাখাংশে ধাবিত হইয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পোষণ করে। বীজুর শিরো-ভাগ কাটিয়া দিবার ১০।১২ দিবস পর হইতে ১৪।১৫ দিনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে শাখাটীকে মূল গাছ হইতে কাটিয়া স্বতন্ত্র করিতে হইবে। ক্রম-কর্ত্তনকে 'ছে' কহে। একেবারে কাটিয়া দিলে পাছে শাখাটী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এইজন্য ক্রমে ক্রমে 'ছে' দিবার ব্যবস্থা আছে। মূল-গাছ হইতে শাখাটীকে কাটিবার পরেও অনেকে বীজুর শিরোভাগ কাটিয়া দিতে সঙ্কুচিত বা ভীত হয়েন কিন্তু ইহা বিজ্ঞান ও ব্যবহার বিরুদ্ধ। বীজুর

উর্দ্ধদেশ ছেদিত না হইলে উহার রস উহাতেই অধিক ব্যয়িত হয় সুতরাং শাখাংশ-সবল হইতে পায় না।
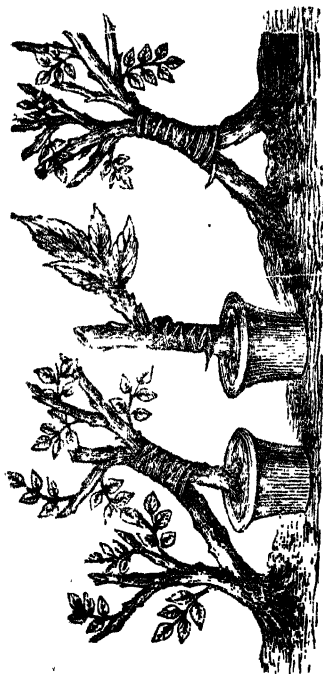
চিত্র নং ৩

রীজু ও শাখায় সম্মিলিত হইবার পর মূল গাছ হইতে শাখাটী ছেদিত হইলেই জোড়-কলম প্রস্তুত হইল। এক্ষণে উহাকে ছায়াযুক্ত হাপোরে রোপণ করতঃ কিছুদিন লালনপালন করিয়া যথাসময়ে ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। (পার্শ্বে চিত্র নং ৩ দেখুন)।

জিব-কলম

TONGUE-GRAFT

চারা গাছে যে জিব বসাইতে হয়, তাহার আকার জিহ্বা সদৃশ, এই জন্য ইহাকে জিব-কলম কহে। 'জিব' কথাটী জিহ্বা শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। যে উদ্দেশ্যে জোড়-কলম করা গিয়া থাকে সেই একই উদ্দেশ্য সাধনার্থে বীজু গাছের নানা স্থানে নানাপ্রকার অন্য গাছের অংশ সংযোজিত করা যায়। সেই সকল কলমের নামকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় পরিণত করা একরূপ অসাধ্য না হইলেও শব্দগুলি দুর্ব্বোধ্য হইবে ইহা নিশ্চয়। সুতরাং সে চেষ্টা না করিয়া ইংরাজি শব্দগুলিই এ স্থানে প্রকটিত হইল। সেগুলি এই :—

Crown or Rind-grafting ও Whip-grafting—শেষোক্ত হুইপ-কলমের অন্তর্গত অনেক প্রকার কলম হইয়া থাকে যথা,—Cleft-grafting, Saddle-graftting, Side-grafting, Wedge-grafting, Bud-grafting, Bark-grafting, Root-grafting, Herbaceous grafting ইত্যাদি।

জিব-কলমের নিয়ম এই যে বীজু গাছের মস্তকটী কাটিয়া ফেলিয়া তাহার উপরিভাগে ইংরাজি V অক্ষরের ন্যায় কাটিতে হইবে। তদনন্তর যে গাছের কলম উহাতে বসাইতে হইবে তাহার ৩।৪ অঙ্গুলি পরিমাণ শাখা কাটিয়া লইয়া তাহার নিম্নাংশ এরূপ ভাবে কাটিতে হইবে যে, উহা সেই চারার কর্ত্তিত স্থানমধ্যে উত্তমরূপে বসিতে পারে। সাবধান, যেন কলম বসাইবার সময় চারার কর্ত্তিত মুখ না কাটিয়া যায়। তদনন্তর

জোড় কলমের স্থায় বাঁধিয়া দিতে হইবে। যে কলমটী লাগাইতে হইবে তাহাতে ২।৩টী চোক থাকা আবশ্যক, কারণ সেই চোক মুকুলিত হইয়া শাখা প্রশাখায় পরিণত হইবে।

চিত্র নং ৪

পূর্ব্বে যেরূপ চারাকে V অক্ষরের স্থায় কাটিয়া কলমকে তাহার উপযোগী করিয়া কাটিবার কথা বলা হইয়াছে, তদ্রূপ কলমটীকেও সেই অক্ষরের স্থায় কাটিয়া চারাতে বসাইয়া দিতে পারা যায়। উপরে চিত্র (নং ৪) দেখুন।

ছড়ি-কলম (Whip) বা পাশ-কলম (Side) করিতে হইলে চারার শিরোভাগ কাটিয়া তাহার গাত্রে এক বা ততোধিক কলম লাগাইতে পারা যায়, তবে চারা গাছের কাণ্ডের স্থূলতার উপর তাহা নির্ভর করে। সরু চারা হইলে তাহাতে একটীমাত্র কলম বাঁধিতে পারা যায় কিন্তু মূল গাছের কাণ্ড অধিক মোটা হইলে সেই কাণ্ডের চারিদিকে দুইটী হইতে যত স্থান পাওয়া যায়, ততই কলম লাগাইতে পারা যায়। একই কাণ্ডে এক শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গাছের কলম লাগাইতে পারা যায়।

চোক-কলম

BUDGRAFT

পীচ, কুল প্রভৃতি ফলের আঁটি বা বীজ অতিশয় কঠিন, এজন্য ইংরাজীতে ইহাদিগকে সাধারণতঃ (Stonefruit) কহে। যে সকল ফলের বীজ এইরূপ কঠিন, তাহাদিগের কলম করিবার পক্ষে চোক-কলম প্রশস্ত। তাহার কারণ এই যে, ঐ সকল গাছ অতিশয় আটাময় এবং কীটের আবাস স্থান বলিলেও হয়। ফলকর গাছের পক্ষে আটা নির্গমনের ন্যায় আর কোন কঠিন রোগ নাই, সুতরাং যখন ইহা নিবারণ করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ তখন আর ইহাদিগকে অধিক পরিমাণে ক্ষত করিয়া সেই রোগকে আনয়ন করা কোনমতে উচিত নহে। যেখানে ক্ষত ও অস্ত্রাঘাত, সেইখানেই এই রোগ উপস্থিত হইবার চেষ্টা করে এবং ক্ষত বা আঘাত যত অধিক ও গভীর হইবে, ততই ইহার প্রাদুর্ভাবের বিশেষ সম্ভাবনা। এই কারণে উল্লিখিত জাতীয় ফলকর গাছের জোড়-কলম বা তজ্জাতীয় কোন প্রকার কলমাপেক্ষা চোক-কলম করাই অনেকটা নিরাপদ। এতদ্ব্যতীত অন্য-জাতি অপেক্ষা এই জাতীয় গাছ হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে রস নির্গত হইয়া থাকে এবং তন্নিবন্ধন জোড় বাঁধিবার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত হয়। এইরূপ অপরিমিত রসপ্রবাহে কলম প্লাবিত হয় সুতরাং জোড় লাগিতে অধিক বিলম্ব হইলে কলমটী ক্রমশঃ শুকাইয়া যায়।

চোক-কলমের আর একটী সুবিধা এই যে, প্রত্যেক চোক হইতেই এক একটী স্বতন্ত্র গাছ হইতে পারে এবং একই গাছে

যত প্রকার বা যতগুলি ইচ্ছা চোক বসাইলে অতি অল্পদিন মধ্যে সেই গাছ ঝাড়বিশিষ্ট হইয়া নানাবিধ ও বিস্তর ফল প্রদান করিবে। একটী পীচ বা কুল গাছের শাখাপ্রশাখা ছাঁটিয়া যদি প্রত্যেক শাখাপ্রশাখায় নানা জাতীয় পীচ বা নানা জাতীয় কুলের চোক বসাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে একটী পীচ গাছে নানা জাতীয় পীচ অথবা একটী কুল গাছে নানা জাতীয় কুল ফলিবে। মুরসিদাবাদে থাকিতে রৈইসবাগের কয়েকটী গাছে আমি এইরূপে চোক বসাইয়াছিলাম। তন্মধ্যে দুই একটির নাম করিতেছি,—পীচ ও গোলাপ ফুলের গাছ। প্রথমতঃ একটী পীচ গাছে তিন জাতীয় তিনটী পীচের চোক বসাইয়াছিলাম। প্রায় ২০ দিন মধ্যে সেইগুলি মুকুলিত হইয়া শাখায় পরিণত হইল। এক বৎসর মধ্যে তিনটী শাখায় তিন রকম ফল হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ ২।৩টী গোলাপের গাছে যথাক্রমে দশ কি বারটী করিয়া উৎকৃষ্ট জাতীয় গোলাপফুলের চোক বসাইয়াছিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ সকলগুলিই ক্রমে ফুলপ্রদান করিয়াছিল এবং একটী গোলাপ গাছে নানা জাতীয় গোলাপ ফুটিতেছে দেখিয়া দর্শক মাত্রেই, বিশেষতঃ মহামান্য নবাব ছোট-সাহেব (Fluk kudr Nawab Syed Nasir-Ali Mirza Bahadur) বাহাদুর বিশেষ বিমোহিত হইয়াছিলেন।

ফাল্গুন মাস হইতে আশ্বিন মাসের শেষ পর্য্যন্ত চোক-কলম করিবার সময়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেও আবার ইতরবিশেষ আছে। এই সময়ে উদ্ভিদ সকল শীতের সংকোচভাব ত্যাগ করিয়া নূতন মুকুলে শোভিত হইতে থাকে। বসন্ত সমাগমে গাছের শিরা বিন্যাস রসে পূর্ণ হয়, রস অপেক্ষাকৃত তরল ও

গতিশীল হয়। আরও দেখা যায়, শীতকালে গাছের কাষ্ঠ ও ত্বক পরস্পর দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ থাকে, ফলতঃ কাষ্ঠ হইতে ত্বক পৃথক করিতে পারা যায় না কিন্তু বসন্ত কাল হইতে গাছের রস তরল হয়, রসের পরিমাণ ও প্রবাহ অধিক হয়। তাহা ব্যতীত কাষ্ঠ হইতে ত্বক সহজেই পৃথক করিতে পারা যায়। এই সকল কারণে বসন্ত কালই কলম করিবার, বিশেষতঃ চোক বা চোঙ করিবার, উত্তম অবসর।

চৈত্র-বৈশাখ মাসেও চোক-কলম করিতে পারা যায় কিন্তু সে সময়ের প্রচণ্ড রৌদ্রে চোকগুলি শুকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা, সুতরাং এই দুই মাস মধ্যে চোক-কলম করিতে হইলে ছায়াযুক্ত স্থান আবশ্যক। রৌদ্রের দিনে জমিতে রোপিত গাছে চোক বসাইতে হইলে,—সম্ভব হইলে গাছটীকে,—নতুবা কলমের স্থানটীকে উত্তমরূপে দিবাভাগে ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক

চোক-কলমের জন্য ইতিপূর্ব্বে যে ছুরীর কথা বলা হইয়াছে এক্ষণে তাহা আবশ্যক হইবে। ছোট বড় নির্ব্বিশেষে সকল গাছেই চোক (bud) বসান যাইতে পারে। প্রথম ছোট চারার কথা বলা যাউক। চারা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে সকল কলমেরই এক নিয়ম। গাছটী অন্ততঃ এক বৎসরের এবং যে যে স্থানে চোক বসাইতে হইবে তাহা অর্দ্ধ পরিপক্ক হওয়া আবশ্যক। স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়া অপর গাছ হইতে সুপুষ্ট ও অর্দ্ধ-পরিপক্ক চোক তুলিয়া আনিতে হইবে। চোক তুলিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত ছুরী লইয়া মনোনীত শাখার পরিপুষ্ট চোকের উপরে ও নিম্নভাগে অর্দ্ধ ইঞ্চ ত্বক বা কাষ্ঠসমেত ছাল, লিখিবার কলমের ন্যায় ঈষৎ হেলাইয়া কাটিয়া তুলিয়া লইতে হইবে। তদনন্তর

চোকটী লইয়া ভিজা কাপড় বা জলপূর্ণ কোন পাত্র বা মুখের মধ্যে রাখিয়া কলম করিবার স্থানে আসিয়া চারাকে কাটিতে হইবে। চোক উঠান অপেক্ষা কলম বসাইবার স্থানটী কাটিতে বিশেষ নৈপুণ্য আবশ্যক। চারা-গাছের যে স্থানটিতে চোক বসিবে তাহা নিতান্ত নূতন অথবা রুগ্ন বা শুষ্কপ্রায় না হয়। এই স্থানটীকে ছুরীর দ্বারা ইংরাজি T অক্ষরের ন্যায় ছালের উপরে সাবধানে দাগ দিতে হইবে। পরে ছুরীর সূক্ষ্ম বাঁট দ্বারা ধীরতার সহিত কাষ্ঠ হইতে ছাল খুলিয়া তন্মধ্যে চোকটীকে সাবধানে বসাইতে হইবে। অনেকে গাছ হইতে চোক তুলিয়া লইয়া ছালের পশ্চাদ্ভাগস্থিত কাষ্ঠাংশ স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া চোক সমেত ছালটীকে বসাইয়া দিয়া থাকেন। আবার অনেকে কাষ্ঠসমেতও বসাইয়া দেন কিন্তু ফলে কোনবিশেষত্ব নাই, তবে কাষ্ঠ হইতে ছালকে স্বতন্ত্র করিতে পাছে চোকের কোন অনিষ্ট ঘটে এই কারণে কাষ্ঠসমেত ছাল বসান গিয়া থাকে। কেহ কেহ বা চোক বসাইবার জন্য গাছে T অক্ষরের ন্যায় দাগ না দিয়া কেবল একটী লম্বা সরল দাগ দিয়া উভয়পার্শ্বের ছাল উঠাইয়া তন্মধ্যে চোক প্রবেশ করাইয়া দেন। শেষোক্ত মতে সরল দাগ দিয়া তাহার ছাল উঠান এবং তন্মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে চোক প্রবেশ করান অধিকতর নৈপুণ্য ও সাবধানতার কার্য্য। কিন্তু এই প্রথাই যে প্রকৃষ্ট তাহা আমি স্বীকার করি, কারণ লম্বাভাবে চিরিলে গাছের শিরা অতি অল্পই কাটিবার সম্ভাবনা; কিন্তু প্রথমোক্ত প্রণালীতে কাটিলে অনেকগুলি শিরা কাটিয়া যায় এবং বর্ষায় জল তাহাতে অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিবার পথ পায়। যাহা হউক, চোকটীকে কাষ্ঠ ও ছালের ব্যবধান মধ্যে উত্তমরূপে প্রবেশ

করাইয়া, তাহার উপরে ছালটী ভালরূপে পাতিয়া দিবে। তদ্নন্তর কোমল রর্জ্জু অর্থাৎ পশম, বা নরম সূতা দ্বারা সেই স্থানটী জড়াইয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, বন্ধনকালে চোকটি ছাল দ্বারা না ঢাকিয়া যায় অথবা বন্ধন মধ্যে না পড়ে। কলম বাঁধা হইয়া গেলে, সেই স্থানটীতে কলমের মলম লাগাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। মলমের প্রস্তুত প্রণালী জোড়-কলম প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

কোন্ স্থানে চোক (leaf bud) থাকে, ইহা জানিয়া রাখা আবশ্যক। প্রত্যেক পত্র-গ্রন্থির ক্রোড়ে চোক থাকে এবং প্রত্যেক
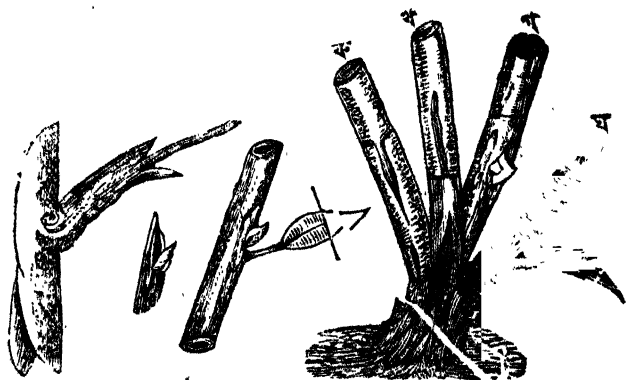
চিত্র নং ৫

চোকই ভাবী শাখা। অনেকে পত্রসম্বলিত চোকও উঠাইয়া চোক-কলম করেন। ইহাতে চোকের পক্ষে একটা বিড়ম্বনা বলিয়া আমার মনে হয়, কারণ স্বয়ং চোকই প্রথমাবস্থায় অপর গাছের সাহায্যাভিলাষী, তখন আবার তাহার সহিত পত্র থাকিলে তাহাকে পোষণ করা ক্ষুদ্র ও কোমল চোকের পক্ষে অসম্ভব।

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত চোক-কলমের কার্য্য সুশৃঙ্খলে সমাধা করিতে পারিলে ১০।১২ দিনের মধ্যে উহা ফুটিয়া পল্লবিত হইবার উপক্রম করে। চোক বসাইবার পরে যাবৎ উহা সজীব হইয়া না উঠে, তাবৎকাল মধ্যে সূর্য্যোত্তাপ প্রখর হইলে কলমের স্থান তুলা বা শৈবাল (Moss) দ্বারা ঢাকিয়া রাখায় লাভ আছে। নং ৫ দেখুন।

চোঙ-কলম

TUBE-GRAFT

চোঙ-কলমকে ইংরাজিতে Tube, Ring বা Flute graft কহে। যে উদ্দেশ্য সাধনার্থে চোক্ কলম করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্যেই ইহাও চলিত হইয়াছে। চোক ও চোঙ-কলম করিবার রীতি প্রায় একই রকম। কুল গাছের জন্য প্রায়ই চোঙ-কলম করিতে হয়। মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র, এই তিন মাসই চোঙ-কলম করিবার প্রশস্ত সময়।

এক গাছের শাখা হইতে চোঙ বা নলের আকারে ছাল তুলিয়া অপর গাছের কাণ্ড বা শাখার ত্বকবিরহিত কাষ্ঠে যথানিয়মে বসাইতে হয়। যে গাছ হইতে চোঙ তুলিতে হইবে সে গাছটি বা তাহার কোন শাখার মস্তকটি একেবারে কাটিয়া ফেলিয়া সেই কর্ত্তিত স্থান হইতে এক বা দুই ইঞ্চ নিম্নে ছালটি বেষ্টন করিয়া ছুরী দ্বারা কাষ্ঠ স্পর্শ করতঃ দাগ দিতে হইবে।

তদনন্তর সেই স্থান-পরিমিত ছাল দুইটী অঙ্গুলি দ্বারা ধরিয়া দুই চারিবার ঘুরাইতে চেষ্টা করিলে কাষ্ঠ হইতে ছাল পৃথক্ হইয়া পড়িবে। তখন তাহাকে উঠাইয়া লইতে হইবে। তৎপরে যে ডালে সেই চোঙটী বসাইতে হইবে, সেই ডালের মস্তক কাটিয়া ফেলিয়া কর্ত্তিত স্থানের উপর হইতে চোঙের পরিমাণমত নিম্ন দিকে বেষ্টন করিয়া একটী দাগ দিয়া, সেই স্থানের ত্বক সাবধানে তুলিয়া ফেলিয়া কাষ্ঠের উপরে চোঙটী প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, চোঙে একটী বা দুইটী চোক থাকা নিতান্ত প্রয়োজন।

অন্য এক প্রণালীতে গাছ হইতে চোঙ তুলিতে পারা যায় এবং তাহা অপেক্ষাকৃত সহজ। এই প্রণালীমতে চোঙ তুলিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত চোক-গাছের মস্তক কাটিয়া ফেলিয়া শাখা বেষ্টন করতঃ যথারীতি একটী দাগ দিতে হইবে। পরে, উপরিভাগ হইতে দাগ পর্য্যন্ত ছুরী দ্বারা লম্বাভাগে আর একটী দাগ দিয়া চোক-কলমের ছুরী সাহায্যে ধীরে ধীরে ছাল খানি খুলিয়া লইয়া অন্য চারার বা শাখার মস্তকহীন কাণ্ডের কাষ্ঠে যথানিয়মে বসাইয়া দিতে হইবে। যে গাছে চোঙ বসাইতে হইবে তাহার কাণ্ড যদি চোঙ অপেক্ষা ঈষৎ মোটা বা সরু হয় তাহাতে ক্ষতি নাই। চোঙ অপেক্ষা কাণ্ড মোটা হইলে কাণ্ডের সমুদায় ছাল না তুলিয়া নিম্নলিখিত প্রকারের কাটা চোঙটী তাহাতে প্রবিষ্ট করিয়া দেখিতে হইবে যে তাহাতে চোঙটীর সঙ্কুলান হয় কি না। যদি না হয়, তাহা হইলে যত টুকুতে সঙ্কুলান হয়, ততটুকু স্থানের ত্বক কাণ্ড হইতে তুলিয়া বসাইয়া দিতে হয়। আবার যদি চোঙ, কাণ্ড অপেক্ষা স্থূল হয়, তাহা হইলে উহার

একদিক লম্বাভাগে চিরিয়া কাণ্ডের কাষ্ঠে বসাইয়া ছালের অতিরিক্ত অংশ ছালের উপরে রাখিতে হইবে।

যে কোন প্রকারে হউক, চোঙ বসান হইলে চোক্‌-কলমের ন্যায় যথানিয়মে বাঁধিয়া কার্য্য শেষ করিতে হইবে। চোঙ যে কেবল কোন চারা বা শাখার শিরোদেশে অথবা তাহার শিরশ্ছেদন করিয়া তাহাতে বসাইতে হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। শাখাপ্রশাখার যে কোন অংশেই চোঙ বসান যাইতে পারে। তবে শিরোদেশ ভিন্ন অপর কোন স্থানে বসাইলে তাহাকে প্রায় অঙ্গুরীয় বা (Ring graft) কহে। অঙ্গুরী বসাইতে হইলে শেষোক্ত প্রণালীতে চোঙ চিরিয়া শাখায় প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে হয়। আর যে স্থানে উহাকে বসাইতে হইবে তথাকার চোঙ-পরিমিত স্থানের ছাল তুলিয়া ফেলিতে হয়।

গুটী বা গুল-কলম

GOOTEE

যে সকল কঠিন ও অর্দ্ধ-কঠিন কাষ্ঠবিশিষ্ট গাছের অন্যবিধ কলম করিবার সুবিধা হয় না, এইরূপ গাছেরই গুটী-কলম হইয়া থাকে। অতিরিক্ত ঘন আটাবিশিষ্ট গাছের কলম গুটীতে সহজে জন্মে না। তাহার কারণ শাখাপ্রশাখায় অস্ত্রাঘাত করিবামাত্র অপরিমিত আটা নির্গত হইয়া ত্বকের শিরানিচয়ের

মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, তাহাতে আর শিকড় নির্গমনের পথ থাকে না। কোমল ত্বক ও কাষ্ঠযুক্ত গাছের গুটী-কলম অতি শীঘ্র তৈয়ার হয়।

বর্ষাকালই গুল কলম করিবার প্রশস্ত সময়। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষ বা আষাঢ় মাসের প্রথম হইতে শ্রাবণ মাস মধ্যে গুটী বাঁধিলে, উদ্ভিদ অনুসারে ১৫ দিন হইতে একমাস মধ্যে, গুটী ভেদ করিয়া শিকড় উদ্গত হইয়া থাকে।

অর্দ্ধ পরিপক্ক শাখাতে গুটী বাঁধিতে হয়। শাখাপ্রশাখার সমধিক নিম্নাংশে গুটী বাঁধিলে শিকড় জন্মে সত্য, কিন্তু মূল গাছ হইতে কলম স্বতন্ত্রীকৃত হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমল মূলগণ তাহাকে আপাততঃ যথোচিত পরিমাণ রস যোগাইতে পারে না, সুতরাং নবজাত কলম সমুচিত পরিমাণ রসের অভাবে শীর্ণ হইয়া যায়, অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে কোন্ স্থানে গুটী বাঁধা উচিত, প্রথমে তাহাই জানা আবশ্যক। শাখাটী রুগ্ন, শীর্ণ বা উর্দ্ধগামী না হয়,—অতিশয় নূতন বা কচি পাতাবিশিষ্ট না হয় ইত্যাদি দেখিয়া শাখা নির্ব্বাচন করিতে হইবে। উর্দ্ধগামী শাখার কলম তৈয়ার হইতে ঈষৎ বিলম্ব হয় এবং সেরূপ কলমে ফল হইতেও বিলম্ব হয়, সুতরাং মূল-কাণ্ডের শাখাপ্রশাখাতেই কলম বাঁধা উচিত। ঈদৃশ শাখাপ্রশাখার মধ্যে আবার যে গুলি নতমুখী, তাহাতে গুটী বাঁধিলে অতি শীঘ্র শিকড় জন্মে এবং অল্পদিন মধ্যে ফলধারণ করে।

উল্লিখিত বিষয় সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শাখা নির্ব্বাচন করতঃ কলম বাঁধিতে অগ্রসর হইতে হইবে। গুটী-কলম

বাঁধিবার জন্য ছুরী, দড়ি বা সূতা, নারিকেল ছোবড়া কিম্বা তাল, নারিকেল বা সুপারির জাল্‌তি এবং ভাল মাটির আবশ্যক। ছোব্‌ড়া, জাল্‌তি ও শৈবালের কার্য্য একই, তবে প্রথমোক্ত দ্রব্যগুলি সহজ প্রাপ্য বলিয়া তাহাদিগের ব্যবহার সমধিক প্রচলিত। পাহাড় হইতে যাহারা শৈবাল সংগ্রহ করিতে পারেন তাহাদিগের পক্ষে মস্ (mos) ব্যবহার প্রশস্ত, কিন্তু সাধারণের পক্ষে মস্ সংগ্রহ করা সুবিধাজনক নহে।

গুল-কলমের জন্য বেলে মাটি একবারেই পরিহার্য্য। বেলে মাটির আঁট নাই। এই জন্য তদ্দ্বারা গুল বাঁধিতে পারা যায় না কিন্তু তাহার সহিত পঙ্কিল মৃত্তিকা কিম্বা পুরাতন গোময় মিশাইলে কার্য্যোপযোগী হইয়া থাকে। এটেল মাটিতে গুটী বাঁধিলে গুটী খুব দৃঢ় ও মজবুদ হয় কিন্তু সে মৃৎপিণ্ড ভেদ করিয়া তন্তুসদৃশ সূক্ষ্ম ও কোমল মূলগণ বাহির হইতে পারে না। ঈদৃশ মৃত্তিকা নিয়োজিত হইলে গুটিকে সর্ব্বদা সিক্ত রাখিতে হয়, নতুবা যে কয়টি মূল উদ্গত হয় তাহারাও বৃদ্ধি পায় না। কেহ কেহ আড়ম্বর করিয়া গুটীর জন্য মাটি প্রস্তুত করিয়া থাকেন, যথা,—পচা-মাচ, খৈল-পচা, ভেড়া-সার ইত্যাদি মাটির সহিত মিশ্রিত করেন। গুটির পক্ষে এত সারাল মাটি আদৌ আবশ্যক হয় না, কারণ সারের লোভে অঙ্কুর নির্গত হয় না এবং কোমল শিকড়ের এক্ষণে উহা আবশ্যক হয় না। বিনা মাটিতে আমরা গুটি করিয়া চিরদিন সাফল্য লাভ করিয়াছি। বিনা মাটিতে যে গুটি করা যায়, তাহাতে নারিকেল

* শীত প্রধান দেশের পর্ব্বত ও বৃক্ষাদির গায়ে যে শৈবাল জন্মে তাহাকে 'মস্' বলে।

ছোব্‌ড়া বা মস্‌ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে আবশ্যক হয় এবং তাহাকে নিরন্তর ভিজাইয়া রাখা চাই। সর্ব্বদা যথেষ্ট পরিমাণে ভিজাইয়া রাখিতে সময়ে সময়ে ব্যতিক্রম ঘটে বলিয়া মাটি ব্যবহার করিতে হয়।

উদ্ভিদের কোনও অংশ আঘাত প্রাপ্ত হইলে সে স্থানের মেরামতি কার্য্যে উদ্ভিদ আপনা হইতে ব্যাপৃত হয়—ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। আমাদের শরীরে কোন ক্রমে অস্ত্রের আঘাত লাগিলে প্রথমতঃ সে স্থান হইতে শোণিত নিঃসারিত হয়, ক্ষণকাল মধ্যে শোণিত নির্গমন বন্ধ হয়, আহত স্থানে একটা আবরণ পড়ে। উদ্ভিদের কোন স্থান কর্ত্তিত হইলে তথা হইতে রস বা আটা নির্গত হয়, কিন্তু উদ্ভিদ সে আঘাত সারিয়া লয় অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মানুসারে ত্বকের বহিরাবরণের ঠিক নিম্নে কঙ্কাল আবরিত রাখিবার জন্য যে অন্তস্ত্বক (Bark বা Parenchyma) বিদ্যমান, তাহার মধ্যে উদ্ভিদের রস সঞ্চারিত হইবার জন্য শিরাবিন্যাস বর্ত্তমান এবং উক্ত শিরাবিন্যাস মধ্যবর্ত্তী স্থান শাঁসে পূর্ণ। উদ্ভিদত্বকের ইহাই পরিগঠন। এক্ষণে ত্বকে আঘাত লাগিলে শিরা নিচয় হইতে রস নির্গত হয় এবং বায়ু সংস্পর্শিত হইলে রূপান্তরিত হইয়া ঘনতা প্রাপ্ত হয়, অবশেষে সেই রসের জলীয় অংশ শুকাইয়া যায়, আহত স্থানে স্থূল আবরণ পড়ে।

এক্ষণে ত্বকের পরিগঠনের মূল তত্ত্ব বুঝিলাম। উক্ত শিরা-বিন্যাস মূল-শিকড় হইতে পত্রস্থ শিরা সমূহের সহিত সংযুক্ত। শিকড় যে রস শোষণ করে তাহা শিরা-বিন্যাস যোগে বাহিত হইয়া উদ্ভিদের সর্ব্বাঙ্গে প্রসারিত হয়। গুটির জন্য ত্বক কর্ত্তিত

ও কিয়দংশ পৃথক হইলে মধ্যে এক ব্যবধান হয়, শিরোবিন্যাসের উর্দ্ধ ও অধোভাগের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। উক্ত ব্যবধান-স্থানে গুটির পিণ্ড বা ball বাঁধিতে হয়। কর্ত্তমান্তর ব্যবধান হইলে উপরিভাগের শিরাগণ পিণ্ড হইতে রস আহরণ করিতে থাকে, এবং দিন দিন দীর্ঘ হইয়া পিণ্ড ভেদ করে। প্রকৃত পক্ষে ইহা পিণ্ড ভেদ নহে। বৃদ্ধিফলে শিরাগণ পিণ্ডের বহিঃসীমায়—উপনীত হয়, তখন আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই, এবং অবসর বুঝিয়া— মুল-গাছ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লই।

মৃৎপিণ্ড ভেদ করিয়া যে সকল মূলের উদ্ভেদ হয়, তৎসমুদায় গুটির উপরিভাগস্থিত উদ্ভিদের শিরা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ সম্বন্ধে কেহ সন্দিহান হইলে মূল-মুখরিত মৃৎপিণ্ডকে যত্ন সহকারে ভাঙ্গিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ত্বকবিরহিত শাখাংশের উপরিভাগ হইতে উক্ত মূল সকল নির্গত হইয়াছে— সেই সকল মূলই শিরাপ্রসার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

গুটি করণোদ্দেশে শাখার কর্ত্তিকাংশের শিরা সকল রস সন্ধানে কিম্বা নিম্নস্থ শিরাসন্ধানে মিলিত হইবার উদ্দেশে মুখায়। এইরূপ মুখানই গুটির মূলোদ্গম।

এক্ষণে গুটি বাঁধা যাউক। নির্ব্বাচিত শাখা বাম হস্তে ধারণ করতঃ দক্ষিণ হস্তে সুতীক্ষ্ণ ছুরী লইয়া তদ্দ্বারা উপযুক্ত স্থানের পরিধিবেষ্টিত ত্বকে দাগ দিয়া, সেই দাগের ১ বা ২ ইঞ্চ উচ্চে বা নিম্নে আর একটি সেইরূপ দাগ দিতে হইবে। অনন্তর উভয় দাগের মধ্যবর্ত্তী ত্বকের লম্বাভাগে তীক্ষ্ণ ছুরী দ্বারা আর একটি দাগ দিয়া ধীরে ধীরে সেই চিহ্নিত ত্বকখণ্ড তুলিয়া ফেলিতে হইবে।

ত্বক উঠাইতে কাষ্ঠে না আঘাত লাগে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এক্ষণে সেই নিস্ত্বক স্থানটি উত্তম দো-আঁশ মাটি দ্বারা এক ইঞ্চ আন্দাজ পুরু করিয়া ঢাকিয়া দিয়া, তাহার উপরে নারিকেলের ছোবড়া দিয়া কলা-গাছের ছোটা বা সরু লাক-লাইন দড়ি দ্বারা বাঁধিয়া দিলেই গুটি বাঁধা হইল। শাখার স্থূলতা ও গাছের প্রকৃতি অনুসারে—গুল ছোট বা বড় করিতে হয়। শাখা সূক্ষ্ম বা কোমল হইলে ছোট, এবং স্থূল ও কঠিন হইলে অপেক্ষাকৃত বড় পিণ্ড করিতে হয়। পিণ্ডের আকারের যে এরূপ তারতম্য করিতে হয়, তাহার দুইটি কারণ আছে। সরু শাখার—ছোট গুটিতেই কলমের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, পরন্তু উহাতে বড় গুটি করিলে তাহার ভারে শাখাটি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। স্থূল শাখা ও কঠিন গাছে ছোট গুটি হইলে কলমের রসাভাব হওয়া সম্ভব এবং রসাভাব হইলে গুল হইতে শিকড় নির্গমনও অসম্ভব। এই সকল কারণে শাখা বা গাছের প্রকৃতি ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া পিণ্ডের আকার ছোট বা বড় করিতে হইবে। শেষোক্ত প্রকার গাছের গুলকে সর্ব্বদা ভিজা রাখিবার জন্য তাহাতে ঝারা দেওয়া আবশ্যক।

হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন যে, বৈশাখ মাসে বিগ্রহ ও তুলসী গাছের মস্তকোপরি ঝারা দেওয়া হইয়া থাকে। সেইরূপ ঝারা গুটিতে দিবার ব্যবস্থা আছে। ঝারা দিতে পারিলে অতি শীঘ্র শিকড় জন্মে—ইহা যেন মনে থাকে।

বিনা মাটি সাহায্যে যে গুটি বাঁধিবার কথা বলা গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে উপরোক্ত কার্য্য প্রণালী ব্যতীত অধিক বলিবার কিছুই নাই। সরু বা কোমল শাখাতে যে গুটি করা যায়,

তাহাতে মাটির পরিবর্ত্তে কেবল মস্ বাঁধিয়া দিলেই চলিবে, কিন্তু উহা সর্ব্বদা ভিজা থাকা আবশ্যক।

যথাসময়ে গুল ভেদ করিয়া শিকড় বাহির হইলে কোন কোন স্থলে তাহার উপরে দ্বিতীয়বার মাটি ও নারিকেল ছোবড়া বাঁধিয়া দেওয়ার রীতি আছে। কোমল শাখাবিশিষ্ট গাছে ইহা আবশ্যক হয় না, কিন্তু কঠিন কাষ্ঠযুক্ত গাছে দ্বিতীয়বার ঐরূপে গুলকে ঢাকিয়া দিলে কোন ক্ষতি নাই, বরং ভালই হয়। না দিয়াও বিশেষ ক্ষতি আমরা উপলব্ধি করি নাই।

গুল ভেদ করিয়া দুই একটী শিকড় বাহির হইলেই উহাকে না কাটিয়া, কিয়দ্দিন অপেক্ষা করিয়া আরও শিকড় জন্মিতে দেওয়া উচিত। গুটির বাহিরে শিকড় দেখা গেলে রৌদ্রের উত্তাপ হইতে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য গুটির উপরে আচ্ছাদন করিতে পারিলে ভাল হয়। দ্বিতীয়বার গুটি করিবার কথা যে উপরে লিখিত হইয়াছে, তাহার ইহাও একটী প্রধান কারণ। যাহা হউক, উপযুক্ত পরিমাণে শিকড় জন্মিলে গুটির নিম্নে একবার 'ছে' দিয়া তাহার ৭৮ দিন পরে মূল গাছ হইতে কাটিয়া আনিয়া অপরাপর কলমের ন্যায় হাপোরে কিয়দ্দিন রাখিয়া পালন করিতে হইবে। গাছ হইতে গুটি কাটিয়া আনিয়া হাপোরে বসান হইলে কয়েক দিবসের মধ্যে কলমের পাতাগুলি অল্পাধিক ঝরিয়া যায় এবং যথাসময়ে আবার নূতন শাখা প্রশাখায় সুশোভিত হইয়া থাকে। যাবৎ জমিতে বসাইবার আবশ্যক না হয়, তাবৎ উহাকে হাপোরে থাকিতে দেওয়া উচিত। যদি উহাকে টবে বা গামলায় রোপণ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে হাপোরে না বসাইয়া টবেই বসান চলে, কিন্তু

টবে বসাইলেও গাছসমেত টবটিকে বৃক্ষের ছায়ায় রাখিয়া হাপোরের চারার ন্যায় পালন করিতে হয়।

দাবা-কলম

LAYERING

গুটি-কলমের সহিত দাবা-কলমের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। গুটির জন্য শাখা হইতে ত্বকের কিয়দংশ তুলিয়া মাটি বাঁধিয়া দিতে হয়, তাহা পূর্ব্ব প্রস্তাবে বিবৃত হইয়াছে। দাবা কলম করিতেও সেইরূপ ছাল তুলিয়া গাছের সেই স্থানটি হেলাইয়া ভূমিতে মাটি চাপা দিতে হয়। কিন্তু কার্য্যের সুবিধার জন্য এই প্রণালীর কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। উপরে যে প্রণালীর কথা বলা গেল, তাহাই সচরাচর অবলম্বিত হইয়া থাকে অর্থাৎ শাখার কোন স্থানের ছাল একেবারে তুলিয়া ফেলিয়া সেই স্থানটিতে মাটি চাপা দিতে হয়। চারাটি যদি লম্বা, নরম ও সহজেই নমনীয় হয়, তাহা হইলে তাহাকে ধীরে ধীরে টানিয়া জমিতে শায়িত করিয়া কাষ্ঠ বহির্গত স্থানটিতে ২-ইঞ্চ পরিমাণ মাটি চাপা দিতে হয়। শাখাটী কঠিন হইলে জোর করিয়া উপরে উঠিয়া পড়িবার চেষ্টা পায় সুতরাং মাটি-চাপা স্থানের উপরে একখানি ইষ্টক চাপা দিলে আর তাহার জোর করিয়া উঠিবার ক্ষমতা থাকে না। গাছের কাণ্ড যদি কঠিন হয় অথবা কলম করিবার পরে মাটিতে রসাভাব হয়, তাহা হইলে সেই মাটি-চাপা স্থানের উপরে একটী

ছিদ্রতল গামলা, টব কিম্বা কলসী বসাইয়া মধ্যে মধ্যে তাহাতে জল পুরিয়া দিলে মাটি আর শুষ্ক হইতে পারে না, ফলতঃ কলমের রসাভাব হয় না।

শাখা বেষ্টন করিয়া ত্বক না উঠাইয়াও অন্য উপায়ে দাবা করিতে পারা যায়। শাখার পরিধিবেষ্টিত ত্বক না তুলিয়া কলম-স্থানের শাখার নিম্নভাগে ঈষৎ হেলাইয়া ছুরী প্রবিষ্ট করিয়া দিলে ত্বকসহ কাষ্ঠেরও কিয়দংশ কাটিয়া যায়। অনভিজ্ঞ লোকের হাতে অনেক সময় শাখার পূর্ণ পরিধি ভেদ করিয়া ছুরী চলিয়া যায় অর্থাৎ শাখা হইতে উর্দ্ধভাগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এজন্য অতি ধীরভাবে অস্ত্র চালাইতে হইবে। মনোমতরূপ কলমবৎ কাটা হইলে সেই স্থানটী V-রূপে ফাঁক করিয়া উভয় বাহুর সম্মিলিত কোণে ১ বা ২ সুতা মোটা একটী কাঠি আটকাইয়া দিতে হইবে। কাঠি আটকাইয়া দিলে চেরা-স্থানের দুই মুখ আর সম্মিলিত হইতে পারে না। তদনন্তর, পূর্ব্বোক্তমতে যথানিয়মে মাটি চাপা দিয়া কলমের কার্য্য শেষ করিতে হইবে।

কলম-সম্ভব শাখা ভূমি হইতে অধিক উচ্চে থাকিলে তাহাকে নত করা সম্ভব নহে। এরূপ শাখার জন্য মৃত্তিকা-পূর্ণ টব বা গামলা আবশ্যক এবং সেই গামলা যথাস্থানে রাখিয়া যথানিয়মে কলম করিয়া তাহার মধ্যে মাটি চাপা দিতে হইবে।

আষাঢ়-শ্রাবণ মাসদ্বয় দাবা-কলমের উত্তম সময়। এ সময়ে কলম করিলে অল্প দিন মধ্যে কর্ত্তিত স্থান হইতে শিকড় উদ্গত হয়। গুটি বা ডাল-কলমের ন্যায় দাবা-কলমেরও মূল শিকড় না জন্মিয়া কর্ত্তিত স্থান হইতে সূত্রবৎ মূলের গুচ্ছ উদ্গত হয়। সচরাচর তিন সপ্তাহ হইতে ৬।৭ সপ্তাহ মধ্যে দাবা-কলম তৈয়ার

হয়। কিন্তু তাহার পরও ২।৪ সপ্তাহ অপেক্ষা না করিয়া মূল গাছ হইতে কাটিয়া কলম স্বতন্ত্র করা উচিত নহে। দাবা তৈয়ার হইলে উহাকে একবারে না কাটিয়া, একবার 'ছে" দিয়া তাহার ২।১ সপ্তাহ পরে অবশিষ্ট অংশ কাটিয়া দিতে হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে কাটিলে কলমে ধকল লাগে না। পরে অন্যান্য কলমের ন্যায় ইহাকে পালন করিবে। (নিম্নে চিত্র নং ৬ দেখুন)
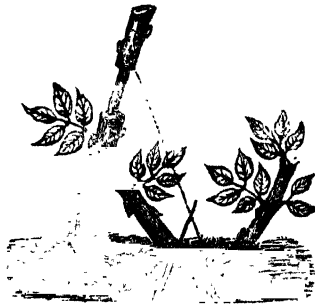
চিত্র নং ৬

চারাবাড়ী

চারা-উৎপাদন এবং চারা পালনের জন্য একটী স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত। উক্ত স্থান চারাবাড়ী বা Nursery নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উক্ত চারাবাড়ীর মধ্যে চারা উৎপাদন ও চারা-পালন জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তৎসমুদায়ের যথাযথ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। সাধারণ জমিতে তৎপরি হাপোর

প্রস্তুত করিয়া বীজ বুনিলে বা গাছ পুতিলে অনেক সময় আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না, কারণ তাড়াতাড়িতে সকল প্রক্রিয়া যথাযথ ভাবে নির্ব্বাহিত হয় না,—কোন ক্রমে কার্য্যসমাধা করিতে হয়।

কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইলে, কার্য্য সংক্রান্ত সকল ব্যবস্থাই পূর্ব্বাহ্নে স্থায়ীভাবে করিয়া রাখিতে হয়, নতুবা কার্য্যকালে বড়ই বিশৃঙ্খলা ঘটে, অনেক সময় লবণ আনিতে পান্তা ফুরাইয়া যায়, কাজেই পান্তা আলুনী খাইতে হয়।

চারাবাড়ীর উপযুক্ত স্থান—বাগানের নিভৃত কোন অংশ, কুঞ্জ বা ঝোপ আছে, এরূপ স্থান মনোনীত করিয়া অল্লাধিক আঁধার মুক্ত করতঃ চারাবাড়ীর পত্তন করিতে হইবে। চারাবাড়ীতে জলের যথেষ্ট বন্দোবস্ত থাকা উচিত। তথায় পুষ্করিণী, ডোবা কিম্বা ইঁদারা বা সুগভীর কূপ না থাকিলে চারাপালনের অসুবিধা হয়।

চারাবাড়ীর কিয়দংশ উন্মুক্ত এবং কিয়দংশ অল্লাধিক ছায়া বিশিষ্ট হওয়া উচিত। অনন্তর উক্ত চৌহদ্দী মধ্যে কোন সুবিধামত স্থানে একটী তাম্বুল-বাড়ী বা পানের বরুজ সদৃশ ঘর নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। বলা বাহুল্য যে, পানের বরুজে রৌদ্র, বাতাস, হিম, বৃষ্টি—সবেরই প্রবেশাধিকার আছে, কিন্তু পূর্ণভাবে নহে, ছাঁকা ভাবে।

চারাবাড়ীর জন্য নির্ব্বাচিত স্থানে ছায়া না থাকিলে স্থানে স্থানে ছায়া উৎপাদন করিবার জন্য কতকগুলি বৃদ্ধিশীল বৃক্ষ রোপণ করিলে ভাল হয়। মোহনচুঁড়া (Poinciana Regia or Gold mohur tree), Rain tree (Pitheocolobium

saman), শিরীষ (albzzia lebbek), প্রভৃতি অতিবৃদ্ধিশীল বৃক্ষ সুবন্দোবস্ত পূর্ব্বক রোপণ করিলে অতি অল্পকাল—বৎসরেক মধ্যে চলনসই ছায়া উৎপাদিত হইয়া থাকে। এই সকল বৃক্ষ ৪।৬ হাত উচ্চ হইয়া উঠিলে কাণ্ডের নিম্নাংশের শাখা সকল কর্ত্তিত হইলে নিম্নদেশের আওতা কমিয়া যাইবে, অন্যদিকে বৃক্ষগণও আরও শীঘ্র ঊর্দ্ধাংশে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এইরূপে বৃক্ষসকল সমুচ্চ হইয়া উঠিলে বিশেষ বিশেষ কয়েকটী শাখা রাখিয়া অপরগুলিকে কাণ্ড ঘেঁসিয়া কাটিয়া দিতে হইবে। এরূপ করিলে চারাবাড়ীর উপরিভাগ চন্দ্রাতপ সদৃশ হইবে। সমধিক ছায়া বা আলোকের প্রতিরোধক হইলে মধ্যে মধ্যে শাখাপ্রশাখা ছাঁটিয়া দিতে হয়।

চারাবাড়ী হইতে সময় সময় কলম চুরী যায় এজন্য তাহার চারিদিক কণ্টকাকীর্ণ গাছের বেড়া দেওয়া উচিত।

অল্প স্বল্প গাছপালার জন্য এত হাঙ্গামা করিতে হয় না, গাছতলায় ছাপোর দিয়া রাখিলে চলে।

চতুর্থ অধ্যায়

গাছ ছাঁটিবার উদ্দেশ্য

এদেশে গাছ ছাঁটিবার প্রথা যে নূতন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা নহে। তবে কোন্ সময়ে অথবা কাহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইল তাহা নিরাকরণ করা যায় না। ভারতীয় ব্যাপারের অনেক বিষয়েরই মূল অন্বেষণ করিয়া পাওয়া দুষ্কর অথবা পাওয়া যায় না। বিদেশীয় বা বিজাতীয় কোন একটা ঘটনা অবলম্বন না করিলে কার্য্যারম্ভের একটি বিশেষ অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়, এজন্য হয় বলিতে হইবে, গাছ পালা ছাঁটিবার প্রথা এদেশে বিলাতের আমদানী, না হয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমরা ইহার সূত্র কোথায় জানি না বা জানিবার উপায় নাই।

বিলাতে গাছ ছাঁটিবার প্রথা কিরূপে প্রবর্ত্তিত হইল তৎসম্বন্ধে সুবিখ্যাত ফলতত্ত্বজ্ঞ মিঃ D. T. Fish সাহেব কি লিখিয়াছেন পাঠ করুন :—

"Science and practice, for it is both of prunning are said to have originated in the necessities of a donkey, and a good deal in their past history seems

redolent of their origin. The story goes that the poor beast fell into a pit and that to keep himself from starving he cropped close the overhanging vines as far as he could reach. Next year the produce of the cropped vines were of extraordinary size and of unusual quality. The illustration was too striking and the demonstration clear to be over looked."

গাছ ছাঁটিবার প্রথা প্রচলন সম্বন্ধে ফিস্ সাহেব মোটের উপর বলেন যে, একটা ডোবা মধ্যে একটি গর্দ্দভ পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাহা হইতে উঠিতে না পারায় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সেই ডোবার উপরে দোদুল্যমান দ্রাক্ষালতাকে মুড়াইয়া খাইয়া ফেলে। পর বৎসর সেই দ্রাক্ষালতা অপরিমিত শাখাপল্লবে সুশোভিত হইয়া অজস্র এবং উৎকৃষ্টতর ফল প্রদান করে। উদ্যানস্বামী এই ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত হয়েন এবং ফল ও ফলমের অভিনবত্বের কারণ বুঝিতে পারেন। অতঃপর প্রতি বৎসরই নানা বৃক্ষলতাকে ছাঁটিয়া থাকেন। পরে এই প্রথা ক্রমে ক্রমে চারিদিকে প্রচারিত হইল।

আমরা যে গাছপালা ছাঁটিয়া থাকি, তাহার যে কোন একটা উদ্দেশ্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। লোকে গাছ ছাঁটে, ছাঁটিবার প্রথা প্রচলিত আছে,—এই কারণেই অনেক সময়ে লোকে গাছ ছাঁটিয়া থাকে কিন্তু কি উদ্দেশ্যে গাছ ছাঁটিতে হয়, কিম্বা গাছ ছাঁটিবার ফল কি, এ সকল তথ্য অবগত না থাকিলে অনেক সময় ফল-বৈপরীত্যের আশঙ্কা থাকে। উদ্দেশ্যহীন ও

নিষ্ঠুরভাবে ছাঁটিলে গাছের কোন উপকার না হইয়া ঘোর অপকার হইয়া থাকে, কিন্তু এই ব্যাপারই প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে। যাঁহারা আদৌ গাছ ছাঁটেন না, তাঁহারা এক প্রকার ভালই করেন, কেননা অজ্ঞভাবে গাছপালাকে ছাঁটিয়া অনর্থক গাছের বৃদ্ধি, শ্রী বা উর্ব্বরতা নষ্ট করেন না। উপরন্তু যাঁহারা গাছ ছাঁটিয়া থাকেন অথচ তাহার উদ্দেশ্য বা প্রণালী অবগত নহেন, তাঁহারা উপকার না করিয়া অপকার করেন।

গাছ ফলশালী বা তাহার বৃদ্ধি, কৃত্রিম উপায়ে রোধ করিবার জন্য যাঁহারা গাছ ছাঁটিয়া থাকেন তাঁহারা ভ্রম করেন। ইহাতে গাছ ফলশালী না হইয়া, উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। গাছ বর্দ্ধনশীল হইলে ফলশালী হইবার পক্ষে অনিশ্চিত। একদিকে যেমন গাছ ছাঁটিয়া দিলে আপাততঃ তাহার বৃদ্ধিরোধ হইয়া থাকে, অন্যদিকে তেমনি কিছুদিন পরে ফলনের শক্তি হ্রাস পাইয়া অধিকতর শাখাপ্রশাখা প্রসারিত করিয়া সুবৃহৎ আকার ধারণ করে। শাখাপ্রশাখার সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, ফলনের আশা তত কমিয়া যায়। তথাপি কেন্তু ইহার প্রতি লক্ষ্যহীন হইয়া লোকে গাছ ছাঁটিতে বিরত হয় না। না ছাঁটিয়া বৃক্ষকে ফলশালী করিবার অন্য উপায় আছে। ছাঁটন দ্বারা গাছপালার আকার পরিবর্ত্তিত ও নিয়মিত করিতে হয়; গাছের শ্রী বৃদ্ধি করিতে হইলে গাছ ছাঁটিতে হয়;—গাছের রোগ নিবারণ করিতে হইলে রুগ্ন অংশ কাটিয়া ফেলিতে হয়। অনিয়মিতরূপে গাছ ছাঁটিলে তাহার শিকড় সকল অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। শিকড়ের বৃদ্ধিতে বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা বৃদ্ধি লাভ করে এবং শাখাদির বৃদ্ধিতে গাছের ফলপ্রদানশক্তি

হ্রাস হয়। শিকড় যত বাড়িতে থাকে, গাছের ফলপ্রদানশক্তি তত কমিয়া যায়, ইহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা আবশ্যক।

প্রকৃত পক্ষে উদ্ভিদকে ফলশালী করিবার জন্য শিকড় ছাঁটিয়া দিতে হয়,—অতিরিক্ত শাখাপ্রশাখার উপরিভাগও অনেক গাছের অল্প পরিমাণে ছাঁটা আবশ্যক। যেখানে শাখাপ্রশাখাকে ছাঁটিবার আবশ্যক না থাকে, সে স্থলে বর্দ্ধনোন্মুখী শাখাগুলিকে জমির দিকে এরূপে টানিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে যে, উহারা সহজে আর না উঠিয়া পড়ে। এইরূপে শাখাগুলিকে টানিয়া বাঁধিয়া দিলে উহাদিগের যে সমুদায় শাখা-প্রসবিনী চোক (Buds) থাকে, তাহারা ফল-প্রসবোন্মুখী হইয়া ফল প্রদান করে।

শিকড় ছাঁটাই

যে গাছ যে সময়, মুকুলিত হয় তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে তাহাদিগের শিকড় ছাঁটিয়া দিতে হয়। গাছে মুকুল উদ্গত হইবার অথবা তাহাতে নূতন শাখাপ্রশাখা জন্মিবার অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বে গাছের গোড়ায় মাটি বিস্তৃত ও গভীর করিয়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। ইহাতে অনেক গাছের সূক্ষ্ম শিকড় মাটি খুঁড়িবার কালেই কাটিয়া যায়। তাহার পর কতকগুলি মোটা শিকড়ও ঈষৎ কাটিয়া দেওয়া আবশ্যক। গাছের যে সকল শিকড় মৃত্তিকার নিম্নদেশে চলিয়া যায়, তাহাদিগকে মূল শিকড় (Tap root) বলে। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে যতই ইহাদিগকে

যাইতে দেওয়া যায়, গাছ ততই লম্বা হয় এবং তাহার ফল-প্রসবিনী শক্তি ততই হ্রাস পাইতে থাকে। উপরিভাগের (Superficial or lateral) শিকড়গুলি পার্শ্বদিকে বিস্তৃত হইয়া থাকে। ফল উৎপাদনে ইহারা গাছের প্রধান সাহায্যকারী, সুতরাং ইহারা যাহাতে মৃত্তিকার অধিক অভ্যন্তরে না প্রবেশ করিতে পারে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সূক্ষ্ম শিকড়গুলি মৃত্তিকার অল্প নিম্নে ভাসমান রাখিতে হইলে তাহাদিগকে উল্লিখিতরূপে মধ্যে মধ্যে অর্থাৎ গাছ মুকুলিত হইবার পূর্ব্বে বিশেষরূপে ছাঁটিয়া দিতে হইবে। জমীতে সচরাচর লাঙ্গল দিয়া বা তাহাকে কোদাল দ্বারা কোপাইয়া জমীর উপরিভাগের মাটি আলগা রাখিতে হইবে। মাটি কঠিন ও রসহীন হইয়া গেলে সেই সকল শিকড় মৃত্তিকার নিম্নদেশ হইতে আহার অন্বেষণ করিবার জন্য ঊর্দ্ধদিকে ধাবিত হয়। এই জন্য শিকড়গুলি যাহাতে মৃত্তিকার অধিক নিম্নে না যাইতে পারে এরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। শিকড়গুলিকে নিয়মিতরূপে পরিচালনা করিতে পারিলে বৃদ্ধির গতি কতক পরিমাণে রুদ্ধ হয়, তন্নিবন্ধন ফল-প্রসবিনী শক্তি বৃদ্ধি পায়। মূল-ছাঁটাই প্রক্রিয়ার ইংরাজি প্রতিশব্দ Root-prunning.

গাছ ছাঁটাই প্রক্রিয়া

যখন গাছ ছাঁটিতে হইবে, তখন তাহার ভাবী আকারের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কোন্ শাখাটী ছাঁটা আবশ্যক,

কোন্ শাখাটীর কোন্ স্থানে কাটা উচিত,—এ সকল বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

গাছের আকার যন্ত্রের মুখে, কেন না, গাছটীকে যে আকারে পরিণত করিতে হইবে যন্ত্রকেও তদনুরূপ পরিচালনা করিতে হইবে। অবিবেচনার সহিত যথেচ্ছভাবে কাটিলে গাছের আকার বিকৃত হইয়া যায়, ফলনের ইতরবিশেষ হয়, গাছও ঘন বা অতিশয় পাতলা হইয়া যায়।

গাছের অনাবশ্যকীয় ও রুগ্ন শাখাকে একেবারে কাটিয়া দেওয়া যেমন আবশ্যক, অন্যদিকে তাহার শাখা প্রশাখার প্রান্তভাগও ছাটিয়া দেওয়া আবশ্যক। শাখার প্রান্তভাগ ছাঁটিয়া দেওয়াকে (Cropping বা topping) কহে। এইরূপে শাখা প্রশাখার প্রান্তভাগ কর্ত্তিত হইলে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ফল-প্রসবিনী শক্তিতে মিশিয়া সেযোক্ত শক্তির গতি বৃদ্ধি করে। সুতরাং ফল ভাল ও অধিক হয়। শাখা প্রশাখা নির্গত করিবার জন্য যে সমুদায় শাখা কাটা যায়, তাহাদিগকে এমন ভাবে কাটিতে হইবে যেন, কর্ত্তনের সময় সমুদায় বৃক্ষশরীরের একটী বিশেষ নির্দ্দিষ্ট আকার থাকে। কর্ত্তনের সময় এই আকার রক্ষা করিতে পারিলে তবে সেই সকল শাখা প্রশাখাও পুনরায় শাখা প্রশাখা ছাড়িয়া তদ্রূপ আকার ধারণ করে। শাখাগুলির এমন স্থানে কাটিতে হইবে যে, পরে যে শাখা জন্মিবে তাহা বৃক্ষের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া বহির্দ্দেশে বাহির হয়। বৃক্ষের যদি কোন স্থান ফাঁক থাকে, তাহা হইলে সে স্থানের দুই একটী শাখাকে এমন করিয়া কাটিবে যে তথা হইতে শাখাপ্রশাখা উদ্গত হইয়া উক্ত শূন্য-স্থান পূর্ণ করে। যদি তথায় কোন

শাখা কাটিবার উপযোগী না থাকে, তাহা হইলে সেই শূন্য স্থানের সন্নিকটস্থ কোন দুই-একটী শাখাকে টানিয়া সেই স্থানে বাঁধিয়া রাখিলে, সেই শাখা হইতে পরে শাখাপ্রশাখা নির্গত হইয়া শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়া দেয়।

গাছ পালার আকার, বৃদ্ধি ও প্রকৃতি বুঝিয়া প্রত্যেককে ছাঁটিবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হয়। রুগ্ন গাছকে অধিক পরিমাণে ছাঁটিতে হয়, পুরাতন শাখা প্রশাখার অর্দ্ধ পরিপক্ক স্থান পর্য্যন্ত রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ কাটিয়া দিতে হয়। আবার বৃক্ষ ও লতা সম্বন্ধে এই একই নিয়ম অবলম্বন করা যাইতে পারে। তাল, সুপারি নারিকেল প্রভৃতি শাখাহীন গাছের পুরাতন ও শুষ্ক পাতা কাটিয়া গাছের মস্তকটী উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া আবশ্যক। এই সকল গাছের মস্তক পরিষ্কার না থাকিলে চিল, কাক ও পক্ষীতে উহাতে বাসা করে এবং নানা স্থান হইতে খাদ্য দ্রব্যাদি আনিয়া গাছের শিরোদেশ অপরিষ্কার করে, তন্নিবন্ধন গাছে পোকা-মাকড় জন্মিয়া থাকে।

শাখাপ্রশাখা যে ছাঁটিতে হয় তাহারও একটী নিয়ম আছে, প্রত্যেক শাখাদির অর্দ্ধ-পরিপক্ক স্থানে কাটিতে হইবে। যদি নূতন শাখা থাকে, তাহা আদৌ না কাটিয়া বরং তাহাকে নিম্নদিকে ঈষৎ হেলাইয়া বাঁধিয়া রাখিলে ছাঁটিবার উদ্দেশ্য সফল হয়। গাছ-পালার আকারকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে, চারা অবস্থা হইতেই যথানিয়মে পরিচালন করিতে হয়।

আকার নিয়ন্ত্রিত করিবার সঙ্গে ফলনের দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গাছের মধ্যদেশ অতিশয় ঘন বা অন্ধকারময় হইলে তাহাতে অতি অল্প ফল হয় এবং যাহা কিছু হয় তাহাও

বহির্দ্দেশে, কিন্তু গাছের ভিতর ফাঁক থাকিলে ও তন্মধ্যে সহজে ও অবাধে বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারিলে এবং সূর্য্যালোক প্রবেশের পথ থাকিলে, ফল অধিক জন্মে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বৃক্ষের ফল,—মূল-কাণ্ড অপেক্ষা শাখাপ্রশাখায় অধিক জন্মিয়া থাকে, এই কারণে মূল কাণ্ডটাকে অধিক বাড়িতে না দিয়া শাখাদির বৃদ্ধির দিকে অধিক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

পঞ্চম অধ্যায়

আম্র

আম্র যে কেবল বাঙ্গালা দেশে জন্মিয়া থাকে তাহা নহে। শীতপ্রধান দেশ ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্রই ইহা জন্মে। ভারত-মহাসাগরস্থিত সিংহল, যবদ্বীপ; চীন, ব্রহ্মদেশ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি অনেক দেশেই আম্র জন্মিয়া থাকে। ইদানীং মার্কিন যুক্ত-রাজ্যের অন্তর্গত বাণিজ্য-কৃষিরূপে আম্রের বিস্তৃত আবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কথিত আছে যে, হণুমান যখন সীতা উদ্ধারার্থ লঙ্কায়—আধুনিক সিংহলে—গমন করেন, তখন তথাকার সুমিষ্ট আম্র-ফল ভক্ষণ করিয়া তাহার বীজ ভারতে নিক্ষেপ করায় এদেশে আম্রের উৎপত্তি হইয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে এ কথার উল্লেখ থাকিলেও, বাল্মীকি রামায়ণে তাহার কোন উল্লেখ নাই। কৃত্তিবাসের কথায় নির্ভর করিলে রামায়ণের পূর্ব্বে ভারতে আম্র ছিল না বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। কিন্তু বেদে আম্রের উল্লেখ থাকায় আমরা বলিতে পারি যে, রামায়ণের অনেক পূর্ব্ব হইতে ভারতে আম গাছ জন্মিত। বেদ,—রামায়ণ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন গ্রন্থ সুতরাং তাহাতে যখন আম্রের উল্লেখ দেখা যায় তখন বৈদিক সময়েও যে ভারতে আম্র ছিল এবং আর্য্য ঋষিগণ

যে তাহা জানিতেন, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। অতএব আম্রের জন্ম, ভারতবর্ষ, লঙ্কা কিম্বা অপর কোন দেশের নিকট ঋণী নহে।

ভারতের নানাস্থানে আম্র জন্মে, কিন্তু তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্যে বোম্বাই ও মহীশূরে, রাজপুতানার অন্তঃবর্ত্তী চিতোর, বাঙ্গালার মধ্যে মালদহ ও মুরসিদাবাদ এবং ত্রিহুতে যে সমুদায় আম্র আছে তাহাই উৎকৃষ্ট। মুরসিদাবাদে যে নানাপ্রকারের উৎকৃষ্ট আম্র প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে তাহা অপর সাধারণে অবগত নহেন। ঐ স্থানের আম্রবৃক্ষ স্থানান্তরে যাইতে পারে না। বাগিচা সম্বন্ধে ইংরাজি অথবা বাঙ্গালা ভাষায় যে সমুদায় পুস্তক এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কোন খানিতেই মুরসিদাবাদের আম্র সম্বন্ধে কোন উল্লেখ দেখা যায় না। এই জন্ত সাধারণেও তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না। * 'চুনাখালির আঁব' নামে যে আম্র কলিকাতা ও অন্যান্ত স্থানে চালান হয়, তাহা খাস মুরসিদাবাদের আম্র বটে কিন্তু তাদৃশ ভাল জাতীয় নহে। তাহার কারণ, স্থানীয় ধনী ও ভদ্রলোকদিগের যে সমুদায় বাগান আছে, তাহার অপকৃষ্ট জাতীয় আম্রগুলিই কলিকাতার ফল-ব্যবসায়ীগণ আমদানী করে।

বাগানের মধ্যে যে সকল উৎকৃষ্ট নামজাদা গাছ থাকে, তাহাই উত্তানস্বামীগণ বিক্রয় না করিয়া স্ব স্ব ব্যবহারের জন্য রাখিয়া থাকেন। মালদহ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের অনেক উৎকৃষ্ট জাতীয় আম্র আজ কাল কোন কোন স্থানে দেখা যায় এবং

---

* গ্রন্থকার-লিখিত এই বিষয়টির কিয়দংশ সন ১৩০২ সালের ১১ই আষাঢ় তারিখের 'সঞ্জীবনীতে' প্রকাশিত হয়।

উদ্ভিদ-ব্যবসায়ীগণও বিক্রয় করিয়া থাকেন কিন্তু মুরসিদাবাদের শতাধিক উৎকৃষ্টজাতীয় আম্র মুরসিদাবাদেই অবরুদ্ধ আছে। মুরসিদাবাদ নওয়াবের দেশ, প্রায় সমুদয় বাগ্‌বাগিচা নওয়াবদিগের, সুতরাং তথাকার গাছ অন্য স্থানে যাইতে পায় না। মুরসিদাবাদবাসীগণ স্থানীয় আম্রকে একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, তথায় উহার যথাবিধি পাট হয় না এবং দেখা যায়, সকল গাছের নাম বিশ্বস্ত নহে,—একই গাছ ভিন্ন ভিন্ন বাগানে নামান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে।

যাহা হউক, আজকাল কয়েক জন স্থানীয় ভদ্রলোক নানাপ্রকার স্থানীয় আম্রের একত্র আবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গ্রন্থকার মুরসিদাবাদে অবস্থান কালে 'রৈইসবাগের' স্থানীয় আম্রের 'একজাই' করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং অনেক উৎকৃষ্ট জাতীয় আম্রের গাছও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বন্ধুপ্রবর শ্রীযুক্ত মহেশ নারায়ণ রায় মহাশয় তথাকার নানাবিধ উৎকৃষ্ট আম্রের গাছ সংগ্রহ করিয়া স্বীয় বাগানে রোপণ করিয়া কেবল যে নিজের উদ্যানকে মূল্যবান করিয়াছেন তাহা নহে, তদ্দ্বারা মুরসিদাবাদেরও একটী স্থায়ী উপকার করিয়াছেন।* সাবেক সংগ্রহের মধ্যে নিজামতের 'হুমাউন-মঞ্জিল' ও 'রাজাসাহেবের বাগান' † এবং কাটরাস্থিত রায় লছমীপৎ

* উক্ত মহেশ বাবু খাস মুরসিদাবাদের উৎকৃষ্ট আম্রের কলম বিক্রয় করিয়া থাকেন। মহেশবাবুর ঠিকানা:—লালবাগ, মুরসিদাবাদ।

† কলিকাতাস্থ শোভাবাজারের রাজা প্রসন্ন নারায়ণ দেব বাহাদুর পূর্ব্বে নিজামৎ সরকারের দেওয়ান ছিলেন। সচরাচর লোকে তাঁহাকে রাজাসাহেব বলিত। উক্ত বাগান তাঁহারই ছিল, এজন্য উহা 'রাজা সাহেবের বাগান' নামে পরিচিত।

সিং বাহাদুরের বাগানকে উৎকৃষ্ট বলা যায়।

মুরসিদাবাদের নিজস্ব আম্রের মধ্যে কালাপাহাড়, কহিতুর, রোগ্নি, বিমলী, মাজিম-পছন্দ, মিছরিকন্দ, লম্বা-ভাদুড়ে, তোতা (হরিগঞ্জের), আনানাস, এনায়েত-পছন্দ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ও প্রথম শ্রেণীর আম্র। একাল পর্য্যন্ত যে সকল আম্র তথায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত আরও অনেক আম্র আছে। তাহাদের যথাবিধ পাট হইলে উন্নতি হইতে পারে এবং যত্ন করিলে রকমের সংখ্যাও বৃদ্ধি করিতে পারা যায়।

মুরসিদাবাদ ও মালদহে বৃহদায়তন আম্র-কানন আছে এবং প্রতি বৎসর উক্ত দুই স্থানে যত আম্র জন্মে, তাহার অধিকাংশ বিক্রয় হইয়া দেশান্তরে চালান হয়। এক মুরসিদাবাদেই বোধ হয় লক্ষ টাকার আম্র প্রতি বৎসর বিক্রয় হয় এবং তাহা 'চুনা-খালির আঁম' নামে বাজারে প্রচলিত।

এতৎসম্পর্কে দ্বারবঙ্গ-রাজের দ্বারভাঙ্গার 'লচ্মি-সাগর' ও 'রামবাগ এবং রাজনগরের 'কলমবাগ' উল্লেখের যোগ্য। উল্লিখিত কয়টী বাগানে স্থানীয় নানাবিধ আম্রের একত্র সমাবেশ আছে।

আঁটি-রোপণ ও যোড়-কলম—এই দুই উপায়ে সাধারণতঃ আম্রের চারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন কোন গাছের গুল-কলম হইয়া থাকে। এতদিন কেহ আম্র গাছ উৎপাদনের জন্য চোককলম করিত না, ইদানীং চোক-কলম হইতেছে। আমেরিকায় চোক-কলমের প্রতিপত্তি সমধিক। বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিতে হইলে জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে ভাদ্র মাস মধ্যে যে কোন সময়ে অল্প ছায়াবিশিষ্ট স্থানে হাপোরে আঁটি রোপণ করিতে হয়। অনেক

আঁটি না হইলে সুপুষ্ট ও তেজাল চারা হয় না। হাপোরের মাটি হাল্কা ও আবর্জ্জনা মিশ্রিত করিয়া দুই ইঞ্চ মাটির মধ্যে আঁটি পুতিয়া দিতে হইবে। এ সময়ে হাপোরে জলসেচনের প্রয়োজন হয় না। জলের অভাব হইলে হাপোরে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া আবশ্যক। কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যে আঁটি অঙ্কুরিত হয়। চারাগুলি দুই তিন মাসের হইলে স্থানান্তর করিতে হয় এবং যাবৎ তাহাদিগকে ক্ষেত্রে স্থায়ীরূপে না বসান যায়, তাবৎ যথানিয়মে পালন করিতে হইবে। চারাগুলি দুই বৎসরের না হইলে জমিতে স্থায়ীরূপে বসান কোন মতে উচিত নহে।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত কোলা গ্রামের শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আম্রের আঁটি হইতে সহজে চারা উৎপাদন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল:—

"অনেক উৎকৃষ্ট আম্রের আঁটি অত্যন্ত পাতলা হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার মধ্যস্থিত শাঁস বা বীজও অতিশয় পাত্‌লা হয়। ঐ সকল বীজের অঙ্কুর আঁটির কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া উঠিতে পারে না, এজন্য অনেক আঁটি নষ্ট হইয়া যায়। * * * সুপক্ক ফলের আঁটি সংগ্রহ করিয়া ৫।৬ দিন ছায়াতে শুষ্ক করতঃ ঐ আঁটির উভয় পার্শ্ব সুতীক্ষ্ণ ছুরি দ্বারা কাটিয়া খোলাটী অতি সাবধানে খুলিয়া ফেলিবে। পরে সেই খোসা-হীন বীজকে ঠিক সোজা ভাবে পুতিয়া দিবে এবং সিকি ইঞ্চেরও কম পুরু করিয়া উপরে মাটি চাপা দিবে। মাটি সরস থাকা প্রয়োজন। আঁটি হইতে বীজ বাহির করিবার সময়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন উহার লেশমাত্রও কাটা না যায় বা উহাতে সামান্য আঘা-

তও না লাগে এবং বর্ষাতে না পচিয়া যায় অথবা পিপীলিকায় উহার শাঁস খাইয়া ফেলিতে না পারে। এই প্রণালীতে বীজ পুতিলে ৮।১০ দিনের মধ্যেই পত্রবিশিষ্ট সুন্দর সতেজ চারা জন্মিবে। এই প্রকারে উৎপন্ন চারা শীঘ্র ফল ধারণ করে এবং মূল বৃক্ষের ফলের অনুরূপ হওয়া সম্ভব। ফল পরীক্ষায় এখনও পর্য্যন্ত আমার সুযোগ ঘটে নাই, তবে দুই বৎসরে এই প্রণালীতে উৎপন্ন চারা স্বাভাবিক চারা অপেক্ষা সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।"

উল্লিখিত প্রণালীতে চারা উৎপন্ন করা অতি সহজ এবং অক্ষয় বাবু স্বয়ং যখন ইহাতে সাফল্য লাভ করিয়াছেন তখন এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ দেখা যায় না। আমি নিজে এখনও উহা পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাই নাই। আশা করি, পাঠকবর্গ ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

প্রথম হাপোর হইতে স্থানান্তর করিবার সময়, চারা খাসিকৃত হইলে বৃক্ষের আকার সমুচ্চ না হইয়া পার্শ্বদিকে বিস্তৃত হইয়া থাকে। চারার মূল-শিকড়-ছেদন-প্রক্রিয়াকে খাসিকরণ কহে। সমুচ্চ বৃক্ষ অপেক্ষা বিস্তৃতায়তন বৃক্ষে অধিক ফল হয়, এই জন্য গাছকে শেষোক্ত প্রকারের আয়তনবিশিষ্ট করিতে হইলে 'খাসি' করিয়া দিতে হয়।

---

* উদ্ভিদের মূল-কাণ্ড (Trunk) খর্ব্বীকৃত হইলে কর্ত্তিত স্থানের নিম্নাংশ হইতে বহু শাখা উদ্গত হয়, মূল-কাণ্ডের আর বৃদ্ধি হয় না—ইহা আমরা জানি। সেইরূপ, উদ্ভিদের মূল-শিকড় (Tap root) ছেদিত হইলে তাহাও আর দীর্ঘ হইতে না পারিয়া পার্শ্বদিকে শাখা-শিকড় বিস্তার করে। মূল শিকড় ভূমধ্যের

জোড়-কলমের প্রণালী অতি সহজ হইলেও সকলে কিন্তু সুচারুরূপে কলম বাঁধিতে পারে না। পোষক-চারা ও পোষ্য-শাখার ঈষৎ কাটিয়া বা চাঁচিয়া কর্ত্তিত স্থান দ্বয় একত্র সংলগ্ন করতঃ বাঁধিয়া দিলেই জোড়-কলমের কার্য্য সম্পন্ন হইল সত্য কিন্তু ইহার মধ্যে যে নিয়মগুলি আছে, তাহা জানা না থাকায় অধিকাংশ সময়েই উহাতে নানাবিধ ব্যাঘাত ঘটে এবং সেই কর্ত্তিত স্থান জুড়িয়া গেলেও, তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা থাকে না। যাহা হউক, জোড়-কলম বাঁধিবার প্রকৃষ্ট ও গূঢ় নিয়মাবলী স্থানান্তরে স্বতন্ত্ররূপে আলোচিত হইয়াছে সুতরাং এক্ষণে তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই।

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে আম্রের জোড়-কলম বাঁধিলে চারা ও শাখায় জোড় লাগিতে অধিক বিলম্ব হয় না। পূরা বর্ষা থাকিলে ২০।২৫ দিনের মধ্যে জোড় লাগে কিন্তু বর্ষার অভাব হইলে সংযুক্ত স্থানের রস শুষ্ক হইয়া যায় সুতরাং জোড় লাগিতে অত্যধিক বিলম্ব হয়।

নিম্নদেশে বর্দ্ধিত হয় কিন্তু সেখানে বাধা পাইলে শাখাশিকড় সকল পার্শ্বদেশে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শাখা-শিকড় ও মূল-শিকড়ের কার্য্য স্বতন্ত্র। মূল-শিকড় উদ্ভিদকে ভূমিতে দৃঢ়সংলগ্ন রাখে কিন্তু শাখা-শিকড় (Lateral বা Side roots) আহারান্বেষণে পার্শ্বদেশে ধাবিত হয়। এই শাখা-শিকড়ের সংখ্যা যত অধিক হয়, উদ্ভিদ সেই অনুপাতে আহারের যোগান পায়। খালিকৃত উদ্ভিদ সমধিক যোগান পায়, কিন্তু মূলকাণ্ড সেই অতি-যোগান পরিগ্রহণে অসমর্থ, ফলতঃ আহরিত বহু খাদ্যের প্রভাবে কাণ্ডের ও শাখাপ্রশাখায় নিদ্রিত গ্রন্থি বা পত্রমুকুল সমূহ জাগরিত ও পরিস্ফুট হইয়া শাখায় পরিণত হয়। সুপ্তি মধ্যে সকল নিদ্রিত

চারা ও শাখার বয়ঃক্রম এক বৎসরের হইলে আম্রের জোড়-কলম করিবার সুবিধা হয়, কিন্তু এত অল্প বয়স্ক কলমের অনেক বিপদ আছে। দুই বৎসরের চারা অপেক্ষাকৃত শক্ত হয়, এইজন্য তাহাতে ভাল কলম হয়। গুটী-কলম করিতে হইলে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের মধ্যে গুল বাঁধিতে হয়। একেই ত গুটী দ্বারা আম্রের কলম সহজে জন্মে না, তাহাতে যদি বর্ষার অভাব হয় কিম্বা উহার শিকড় বাহির হইবার পূর্ব্বেই বর্ষা অতীত হইয়া যায়, তাহা হইলে গুটিতে সমধিক শিকড় জন্মে না।

গুলেই হউক বা জোড়েই হউক, কলম তৈয়ার হইলে পোষ্য-শাখার মূল-বৃক্ষ হইতে তাহাকে স্বতন্ত্র করিয়া কিছু দিবস হাপোরে পালন করিতে হয়। যদি টবে কলম তৈয়ার হইয়া থাকে, তাহা হইলে, কলমটীকে পোষ্য-শাখা সহ কাটিয়া কোন ছায়াবিশিষ্টস্থানে কিছুদিন রাখিতে হইবে। এরূপ করিলে ছেদিত কলম অনতিকাল মধ্যে ছেদনজনিত ক্লেশ ভুলিয়া যায় এবং ক্রমে ক্রমে আত্মনির্ভরপর হয়। বৎসরেক কাল হাপোরে থাকিয়া বিশেষভাবে পালিত হইলে কলমের মূলে বহু শিকড় জন্মে, জোড় দৃঢ় ও বেমালুম হয়, ফলতঃ স্থায়ী-

---

সামঞ্জস্য বিদ্যমান, তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল-স্বরূপ একদিকে মূলবিন্যাসের বিস্তার, অন্যদিকে মূল-কাণ্ড হইতে শাখাপ্রশাখার প্রসার। ইহাই খাসিকরণের গূঢ় উদ্দেশ্য। এই সঙ্গে জানিয়া রাখিতে হইবে, যে দ্বিবীজদল বা বহির্বর্দ্ধক উদ্ভিদ মাত্রকেই খাসি করিতে পারা যায়, কারণ ইহাদিগেরই মূল-শিকড় হয়, একবীজদল বা অন্তর্বর্দ্ধকদিগের গুচ্ছ-মূল জন্মে, নাভিস্থল হইতে একাধিক শিকড় উৎপন্ন হয়।

ভাবে রোপিত হইলে বহির্দ্দেশের বাতভাপাদি সহ্য করিতে পারে।

আষাঢ় মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ভূমিতে চারা বা কলম পুতিবার সময়। অতিরিক্ত বর্ষায় মাটি যখন কর্দ্দমবৎ হইয়া থাকে, তখন মাটিতে গাছ রোপণ না করিয়া, মাটিতে যো হইলে যথানিয়মে পুতিতে হইবে। যে স্থানে স্থায়ী-রূপে পুতিতে হইবে, পুতিবার অন্ততঃ ১০।১২ দিবস পূর্ব্বে সেই স্থানে গর্ত্ত কাটিয়া রাখিতে হইবে। গাছ পুতিবার কালে মৃত্তিকা চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত সার মিশ্রিত করিয়া উক্ত গর্ত্ত পূরণ করিতে হয়। গর্ত্তের মধ্যে হাড় প্রসারিত করিলে কিম্বা মাটির সহিত অস্থি চূর্ণ মিশাইয়া দিলে চারা গাছের উপকার দর্শে এবং সেই অস্থি অনেক দিবস পর্য্যন্ত বৃক্ষশরীর পোষণ করে। ক্ষেত্রে কুড়ি হইতে ত্রিশ হাত ব্যবধানে গাছ রোপণ করিতে হইবে। স্থানের অভাব হইলে গাছ ঊর্দ্ধদিকে লম্বা হইয়া যায় এবং রুগ্ন ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বীজোৎপন্ন চারা পুতিবার কালে উহার কাণ্ড মৃত্তিকা মধ্যে না পুতিয়া কেবলমাত্র কাণ্ড ও শিকড়ের সঙ্গম-স্থল (Apex) পর্য্যন্ত পুতিতে হইবে।

অনেক স্থলে দেখিয়াছি, আম্রের কলম রোপণের সঙ্গে সঙ্গে কিম্বা তাহার অব্যবহিত পরে, তাহার অনতিদূরে কদলীর তেউড় রোপিত হয়। যাঁহারা উল্লিখিত প্রথার অনুসরণ করেন তাহা-দিগের ধারণা যে, তদ্দ্বারা নবরোপিত গাছ ছায়া প্রাপ্ত হইবে, —কদলী-ঝাড়ের শিকড়ের রসে নূতন গাছের গোড়ার মাটি সর্ব্বদা সরস থাকিবে, ফলতঃ তাহার আদৌ রসাভাব হইবে না।

আমি এ প্রথার অনুমোদন করি না, কেবল তাহাই নহে, আমি সে রীতির ঘোরতর বিরুদ্ধবাদী। কদলী অতিশয় বুবুক্ষু উদ্ভিদ। যেখানে উহা রোপিত হয় তথাকার মাটি একবারে এত নিঃস্ব হইয়া পড়ে যে, ২।৩ বৎসরকাল কদলী নিজেই আর তথায় যথা-পরিমাণ আহার পায় না। ইহা নিত্য দেখিতেছি, নূতন বাগান রচনা করিয়া পুষ্করিণীর খোদিত মৃত্তিকা পার্শ্ববর্ত্তী জমিতে প্রসারিত হয় এবং তাহাতে কদলী রোপিত হয়, কিন্তু সেই কোরা মাটিতে পরবৎসর কদলী ঝাড় সমূহের আর পূর্ব্ববৎ তেজাল ভাব থাকে না, কাঁদীও তাদৃশ দীর্ঘ, পূর্ণ ও পরিপুষ্ট হয় না। ঈদৃশ বৃক্ষ অপর বৃক্ষের সংলগ্ন থাকিলে শেষোক্ত বৃক্ষের অপকারই করিয়া থাকে। মানুষের ঘাড়ে মানুষ চাপিয়া থাকিলে উভয়েরই কষ্ট হয়। উদ্ভিদ সম্বন্ধে একথা অপ্রযোজ্য নহে। ছায়াদানের জন্যই যদি কদলী রোপিত হয় তাহা হইলেও আমরা তাহার কোন প্রয়োজন দেখি না। আম্র, লীচু কাঁঠাল প্রভৃতি দেশী বাতত্তাপসহ উদ্ভিদ ভূমি হইতে রস আহরণে সমর্থ হইলে সূর্য্যের উত্তাপে তাহাদিগের কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না। ১০।১৫ দিন কিম্বা মাস খানেক যত্ন পাইলেই উল্লিখিত বৃক্ষাদি আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হয়। এই জন্য কদলী রোপণ করিয়া ইহাদিগকে উদ্ব্যস্ত করা উচিত নহে।

গবাদি পশুগণের উপদ্রব হইতে নবরোপিত গাছপালারক্ষার্থ অনেকে রোপিত বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে [illegible], ফণীমনসা প্রভৃতি রোপণ করেন। সেই সকল আগাছা রোপিত বৃক্ষের এত নিকটে রোপিত হয় যে, বৎসরকাল মধ্যেই তাহারা জঙ্গলাকার ধারণ করিয়া বেষ্টিত কলমকে একবারে ঢাকিয়া

ফেলে, তাহার গায়ে বাতাস লাগিবার কিম্বা সূর্য্যালোক সংস্পর্শিত হইবার, পথ রুদ্ধ করে, তন্নিবন্ধন গাছের বৃদ্ধি স্থগিত হইয়া যায়। ইহারা রোপিত বৃক্ষের দুইদিক দিয়া অনিষ্ট করে, ১ম,—তাহার খাদ্য অপহরণ করে ; ২য়,—রৌদ্র বাতাস বন্ধ করে। এইজন্য এরূপ মান্ধাতাযুগের রীতি অবশ্য বর্জ্জনীয়। আবার—

যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন, তাঁহারা সমধিক পর্দ্দাপ্রিয় বা সাবধানী বলিয়া নবরোপিত বৃক্ষদিগের রক্ষার্থে কলম সকল সঙ্কীর্ণ খোপের মধ্যে পুরিয়া রাখেন। ইহারা ভাবিয়া দেখেন না, যে উদ্ভিদের জীবন আছে, উদ্ভিদ বাতাস চাহে, আলোক চাহে, চারিপার্শ্বে অল্পাধিক শূন্য স্থানও চাহে। খোপবেষ্টিত গাছ-পালা চুরী যায় না, গবাদি পশুদ্বারাও ভক্ষিত হইতে পারে না,— এ হিসাবে খোপের উপকারীতা অস্বীকার করা যায় না, তাহা বলিয়া আধ হাত বা তিন পোয়া কিম্বা একহাত ব্যাসের খোপের মধ্যে প্যাক্ করিয়া রাখিলে গাছের স্বাস্থ্য, শ্রী ও বৃদ্ধির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। ইহাতে গাছ জীবিত থাকিতে পারে কিন্তু তাহার বাল্যোত্তব ব্যর্থ হয়। হাপোরে বা গামলায় সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে থাকিবার পর ভূমিতে রোপিত হইলে কারামুক্ত কয়েদীর ন্যায় উহারা উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়ে, অপরিমিত খাদ্য, অপরিমিত স্থান, অবাধ বাতাস, অফুরন্ত আলোক পাইয়া অমিততেজে বাড়িতে থাকে, কিন্তু সঙ্কীর্ণ খোপে গরীবদুঃখীর চট্‌মণ্ডিত মৃতদেহের ন্যায় আবদ্ধ থাকিলে—হাপোরবাস ও কেল্লা-বাস—একই কথা।

চোর, গোরু-বাছুর মেষ ছাগ প্রভৃতি চারাগাছের অনেক শত্রু আছে। উহাদিগের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার জন্য

খোপ ব্যবহার উত্তম ব্যবস্থা, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। চারিদিক বেড়া বা প্রাচীর বেষ্টিত বাগানে খোপের প্রয়োজন হয় না। বৃহদায়তন বাগানের সীমানায় পগার থাকে, কাঁটা-গাছের বেড়াও থাকে, তথাপি তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া চোর আসিয়া গাছ চুরী করিয়া পলায়ন করে, গো-ছাগাদি পশুও প্রবেশ করিয়া কলম উদরস্থ করে এবং গাত্র কণ্ডুতি নিবারণের জন্য গাছের গাত্রে গাত্র ঘর্ষণ করিয়া গাছ ভাঙ্গিয়া ফেলে। ঈদৃশ বাগানের চারা—কলম রক্ষার জন্য খোপ ব্যবহার করা উচিত।

যাহা হউক, চারাবস্থায় গাছ পালা রক্ষা করিবার জন্য সন্নিকটে কোন গাছ রোপণ করা উচিত নহে কিন্তু 'খোপ' ব্যবহার অত্যধিক ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া অগত্যা তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় কলম হইতে অন্ততঃ দুই হাত দূরে সেই সকল উদ্ভিদ রোপণ করিতে হইবে। এরূপ ব্যবস্থা করিলে ২।১ বৎসর মধ্যে তাহারা কলমের খাদ্য অপহরণ করিতে পারে না, মূল-ও শাখাপ্রশাখার বিস্তারে ব্যাঘাত হইতে পারে না।

খোপ ব্যবহার করিতে হইলে সেই সকল খোপ এত বড় হওয়া উচিত যে, খোপ ও গাছের মধ্যে অন্ততঃ একহাত ব্যবধান থাকে। ২।৩ বৎসরের গাছ হইলে আর তাহাদিগকে খোপের মধ্যে রাখিবার প্রয়োজন হয় না।

ফলনের সময়ানুসারে আম্র-বৃক্ষদিগকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া এক এক শ্রেণীর গাছ এক একটি স্বতন্ত্র ভূভাগে (Plot) রোপণ করিতে হয়। সকল আম্র গাছই এক সময়ে ফল ধারণ করে না বা এক সময়ে পাকিয়া উঠে না। কোন জাতি বৈশাখে, কোন জাতি জ্যৈষ্ঠে, কোন জাতি আষাঢ়ে, কোন জাতি

আম্র পাকিতে আরম্ভ হইলে প্রতিদিন সংগ্রহ করিতে হইবে এবং গৃহ মধ্যে মাচা বা তক্তায় রাখিয়া সুপক্ক করিতে হইবে। গাছ হইতে আম্র পাড়িবার জন্য জালতি বা ঠুসি ব্যবহার করা ভাল। বিনা জালতিতে পাড়িলে ফল মাটিতে পড়িয়া ছেঁচিয়া যায় এবং তাহাতে আম্রের আস্বাদ খারাপ হয়। গাছ হইতে আম্র সদ্য পাড়িয়া খাইলে তাদৃশ সুমিষ্ট লাগে না বরং তাহাতে আটার গন্ধ বাহির হয়। সুপক্ক হইলেও অন্ততঃ ৯।১০ ঘণ্টা গৃহে না রাখিয়া খাওয়া উচিত নহে। ভক্ষিত আম্রের আঁটি ফেলিয়া না দিয়া চারা উৎপন্ন করিবার জন্য রাখিয়া দেওয়া উচিত।

আম্র বৃক্ষের নানাবিধ রোগ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে গাছের শাখাপ্রশাখায় যে গাঁট বা স্রাব (Gall) জন্মে, তাহাতে যে কেবল রোগগ্রস্ত গাছেরই ক্ষতি হয় তাহা নহে সন্নিকটস্থ গাছ সকলও পরে সেই রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। উক্ত গাঁট ছোট ছোট কাঁটার আকার হইতে বৃহদাকার থাবার ন্যায় হইয়া থাকে। এইরূপ গাঁটের আবির্ভাব হইলে তখনেই তাহার প্রতীকার করা উচিত, নতুবা অল্পদিন মধ্যেই নিকটবর্ত্তী অপরাপর বৃক্ষে ঐরূপ গাঁট গাছের অন্যান্য স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, অবশেষে অপর গাছেও সেই রোগ জন্মে। উক্ত রোগের লক্ষণ এই যে, গাঁটের উপরিভাগ (Surface) কাটা-কাটা হয় এবং হঠাৎ দেখিলে মানুষের এলোমেলো কেশ-বিশিষ্ট মস্তকের ন্যায় দেখায়। উহার অভ্যন্তর হইতে আটা নির্গত হইয়া থাকে। অনেক স্থানের অনেক আম্র বৃক্ষে উক্ত গাঁট দেখা যায়, কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, উদ্যান-

স্বামীগণ তাহার কোন প্রতিকার করেন না। ইহাতে বৃক্ষগণের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, গাছ দুর্ব্বল হয় এবং ফলও নিকৃষ্ট হয়। উক্ত গাঁট-রোগ আম্র ব্যতীত অপর কোন গাছে জন্মিতে দেখি নাই। অস্ত্র দ্বারা সেই সকল গাঁট চিরিলে দেখা যায় যে, উহার অভ্যন্তর ঘায়ের ন্যায় লালবর্ণ। উহা কীটের কার্য্য। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ভিন্ন কীট দেখিতে পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গাছে আব জন্মিলে অচিরে তাহার প্রতিবিধান করা উচিত কিন্তু কিরূপে তাহা হইবে, এক্ষণে তাহাই বলিতেছি। প্রথমতঃ কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা গাঁটগুলিকে এরূপভাবে কাটিতে হইবে যে, তাহার সামান্য অংশও গাছে না সংলগ্ন থাকে এবং যতদূর পর্য্যন্ত তাহার অভ্যন্তরস্থ সেই লাল বর্ণ দৃষ্টিগোচর হইবে, ততদূর উত্তমরূপে কাটিয়া ফেলিয়া স্থানটি উষ্ণ জলে ধৌত করা আবশ্যক। গরম জলের সহিত কার্ব্বলিক সাবান মিশ্রিত করিতে পারিলে আরও ভাল হয়। অতঃপর সেই সকল ক্ষত স্থানে গন্ধক চূর্ণ ছড়াইয়া দিলে ভিতরে যদিও কিছু কীট থাকে, তাহারা বিনষ্ট হয়। এতদর্থে (Flour of Sulphur) বিশেষ উপযোগী।

আম্র বৃক্ষের কাণ্ডে ও স্থূল শাখাপ্রশাখায় গাত্র হইতে রস ও আটা নির্গত হয়। কোন কোন কীট ত্বক বিদ্ধ করিয়া কাণ্ডের ভিতর প্রবেশ করে এবং তাহার ফলে রস বা আটা নির্গত হয়।

ফলে দুই জাতীয় পোকা জন্মে,—এক জাতীয় কৃমিবৎ ও অন্য জাতীয় পক্ষবিশিষ্ট। নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলে উভয় প্রকারের এবং কলিকাতার দক্ষিণ রাজপুর, জয়নগর-মজিলপুর প্রভৃতি স্থানে শেষোক্ত প্রকারের কীট জন্মে। কৃমিবৎ

পোকা আম্র মধ্যে কোথা হইতে জন্মে তাহা ঠিক করিয়া কেহ বলিতে পারেন না, তবে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, গাছের গোড়ায় পোকা লাগিলে ফলও পোকাবিশিষ্ট হয়। এজন্ত তাঁহারা গাছের গোড়া খুঁড়িয়া মাটি পরিবর্ত্তন করিতে পরামর্শ দেন। গাছের গোড়ায় পোকা লাগিলে ফলে পোকা ধরে, একথা প্রথমতঃ অসঙ্গত বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহা ঠিক যে গাছ নীরোগ হইলে ফলও নীরোগ হয়। দ্বিতীয় প্রকার যে পোকার কথা বলা গিয়াছে তাহা বহির্দ্দেশ হইতে ফলে প্রবেশ করে। অনেক সময় দেখা যায় যে, ফলের গাত্রে কোন ছিদ্র নাই, অথচ ভিতরে পোকা আছে। উক্ত কীট বা ডিম্ব বারমাসই স্থানীয় বন-জঙ্গলে, সারকুণ্ডে অথবা বাগানের মধ্যে যে স্থান জঞ্জাল বা ইটকের রাশি থাকে, তাহারই মধ্যে বাস করে এবং আম্রগাছে মুকুল আসিলে ফুলের কোরকে প্রবেশ করে। ফুল গর্ভবতী হইলে সেই পোকা আর বাহিরে আসিতে না পারিয়া তাহারই মধ্যে বাস করে এবং ফল যত বাড়িতে থাকে, সেই কীট তত পরিপুষ্টি লাভ করে এবং ফলের ভিতরে ডিম্ব প্রসব করিয়া স্ব স্ব বংশ বৃদ্ধি করে। উহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ত কয়েকটী উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, উদ্যান মধ্যে কোন স্থানে জঞ্জাল বা রাবিস থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। দ্বিতীয়তঃ, গাছে যখন মুকুল হয়, তখন হইতে বাগানের মধ্যে গাছের তলায় স্থানে স্থানে আগুন ও গন্ধক জ্বালাইয়া দিতে হয়। এতদ্ব্যতীত বিশেষ কোন প্রকৃষ্ট উপায় দেখা যায় না।

আম্র বৃক্ষের শাখাপ্রশাখায় "বান্দা" নামক এক প্রকার

উদ্ভিদ জন্মে। উহাদিগের শিকড় আম গাছেই জড়াইয়া থাকে, —মৃত্তিকায় সংলগ্ন হয় না। যে অংশকে উহারা আক্রমণ করে তাহাকে অচিরে বিনাশ করে। *

মুরসিদাবাদের বিশেষ বিশেষ আম্রের তালিকা

অমৃতভোগ
অনুপান বা অনুপম
অপ্সরা (নগিনাবাগ)
আলি-পসন্দ
৫। আলিবক্স
আতা-পসন্দ
আসমানতারা
আমরুধ।
আনারদানা
১০। আণ্ডলা-বাহার
ইমামবক্স
উমারা-খাসা
এনায়েত-পসন্দ
এলাচ দানা
১৫। কর্পূরিয়া
আতাব (সেতাবচাঁদ বাবু)
আনানাস নং ১
ঐ নং ২
আফিজি
২০। আষাঢ়িয়া
আমীর-পসন্দ
খরমুজা
খাজা
খানম-পসন্দ
২৫। গুলকন্দ
গৌরজিৎ
গোলাপ-জান
গবরার্দ্ধন
গোরিয়া
৩০। গোলাবী

* আগাছা ও পরগাছা শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কালাপাহাড়
কাকাতুয়া
কহিতুর
কাটগুলিয়া
৩৫। কালুয়া
কাকৃচিয়া (মহেন্দ্রবাবুর)
করঞ্জা
করকরিয়া
কালমেঘা
৪০। কুদ্রক-খাসা
কাঞ্চনকসা
ক্ষীরসাপাতী (সাদেক বাগের)
তুলসখাসা
তরবুজা
৪৫। তরু-পসন্দ
দাউদ-ভোগ
দো আঁটী (সেতাবচাঁদ বাবু)
নাজিম-পসন্দ
নওনেহাল (চুনাখালির)
৫০। নাজুক-বদন
নওয়াব-পসন্দ
গলবলিয়া
পিয়ারাফুলি
পাঞ্জা-পসন্দ
৫৫। গঙ্গাপ্রসাদ
চাপ্টি
চারুখাসা
চন্দকচাঁপা
চুস্নী
৬০। চাম্পা (চুনাখালির)
চিনি-চাম্পা (সেতাবচাঁদবাবু)
টিয়াকাটা
তোতা বড়, (হরিগঞ্জের)
ঐ ছোট, (রৈহসবাগের)
৬৫। তালাবী
তোতামুখী
বেলা
বন্ধু পসন্দ
বৃন্দাবনী
৭০। বেগম-পসন্দ
বিমলী
বিজনৌর সফেদা (সেতাব চাঁদ)
ভবানী-চৌরস
মিয়া-পসন্দ (রৈইসবাগ)
৭৫। মতিয়া
মর্ত্তমান
মজলিস্ রওসন্
মেজিদি (সেতাব চাঁদ বাবু)

পিপড়ে খাসা (লালফুটি)
৮০। পেঁপিয়া
পাতা
ফয়কল বয়ান *
ফায়দোব-পসন্দ
৮৫। বাদসা-পসন্দ
বাবমেসে
বাতাসা
বাতাবী
বীড়া (সেতাবচাঁদ)
৯০। মিরজা-পসন্দ
রোঁয়ী (সেতাবচাঁদ বাবু)
রাণী-পসন্দ
রাহুপেটী
রামভদ্র খাসা
৯৫। রৈইস্-পসন্দ (রৈইসবাগ)
রতন কেওয়া
রামগতি-খাসা
লাড়ুয়া
শ্রাবণে
১০০। শিপিয়া
শিরাদার
মো-সাহেব
মোলাম-জাম
মোহনভোগ (কালবুটি)
১০৫। মিটি
মালি-পসন্দ
মিছরিকন্দ (রৈইসবাগ)
মধুবিলাস
ময়লা
১১০। মাদ্রাজী
মনিয়া-খাসা
মৌলসরি
সায়েদা
সবজা
১১৫। সাগুলু
সোর সাহাবের বোম্বাই
(Mr. Showea's Bombay)
সা-কোলা
সরস্বতী (লোহাগঞ্জ মহান্ত)
সুলতান-পসন্দ
সা-ভুত
১২০। স্যাসিয়া
সোরাইয়া
হীরালাল-বোম্বাই

* Royal Botanic Garden, Peradeniya, Ceylon.

- শরদা (নসীপুর রাজবাটী) হোসেন-বক্স
 সাগা হোউজে-কস্‌র (রৈইসবাগ)

১২৫। সাবেক-পসন্দ সিন্দুরিয়া

১২৯। হালুয়া ফুলফুল্

মুরসিদাবাদের অন্তর্গত আজিমগঞ্জ নিবাসী রায় সেতাব চাঁদ নাহার বাহাদুরের উদ্যানস্থিত—

মান্দ্রাজের আম্র

১। পিটার
২। ইথাতা
৩। রেঁসবেরী
৪। ওথাতা মাতু
৫। গোজা
৬। চিত্তোর
৭। কট্টু
৮। দিল-পসন্দ
৯। আফিস-পসন্দ
১০। ওয়ালজা-পসন্দ
১১। হাথুড়া

মুরসিদাবাদ জেলার অন্তবর্ত্তী আজিমগঞ্জের ভূম্যধিকারী রায় সেতাব চাঁদ নাহার বাহাদুরের উদ্যানস্থিত—

বোম্বাই আম্র

১। আলফন্সো
২। পিয়ারি
৩। হিম সাগর
৪। ক্রীট

৫। মাজগাঁও

৬। কাওয়াসজী প্যাটেল

৭। লং-বট্‌ল

৮। ব্ল্যাক-আলফান্সো

৯। সালেম পসন্দ

১০। আমীর গোলা

১১। কার্ণাণ্ডিন

১২। সিও হিন্দু

১৩। সুন্দালি বা চন্দণী

১৪। নর্সিভোগ

১৫। গুড়িয়া

১৬। মালবার বোম্বাই

১৭। ছোট বোম্বাই

মহীশূরের আম

১। আম্বিনা

২। কারি কৈ

৩। গোল কেরী

৪। মধুমাতু

৫। চিং কৈ

। চিতুর

৭। জিনি মতি বা জিনি মাতু

৮। পিচ্ কৈ

৯। বদামী

১০। শকারী বা গীমাতু

১১। মালগোভা

পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়ার (Goa) আম

১। কোয়েকা

২। কটা

৩। টিমার বা টাইমেরাটা

৪। ডিমোয়াও

৫। কাণ্ডিনা

৬। ফ্রেডিকো

সিংহল দ্বীপে অনেক প্রকারের আম্র জন্মে, তাহার মধ্যে কয়েকটীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। বোম্বাই,—মাঝারি আকারের; হরিদ্রাবর্ণের গোল গোল ফল, কিছু চেপটা, শাঁস কমলা বর্ণের।

২। প্যারেট,—স্থানীয় নাম, গিরা আম্বা। ফল,—প্রায় ৪৷৷৹ ইঞ্চ লম্বা এবং সুস্পষ্ট চঞ্চু বা নাসিকা বিশিষ্ট,—রসাল ও সুগন্ধ যুক্ত।

৩। জাফ্‌না,—ফল বৃহদাকারের ও ডিম্ব সদৃশ; পাকিলেও সবুজ থাকে। শাঁস কোমল ও সুগন্ধি।

৪। মি-আম্বা,—ছোট ,গোল ফল; রসাল ও অতি সুগন্ধ-যুক্ত।

সাধারণের অবগতির জন্য মুরসিদাবাদের কয়েকটী উৎকৃষ্ট আম্রের বিশেষ বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

আলিবক্‌স্—আম্র অতি বিরল। মুরসিদাবাদে আলি-বকস্ নামক এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার বাগানে এই গাছ ছিল এবং তাঁহারই নামে উহা খ্যাত। এক্ষণে উক্ত বাগান মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত নওয়াব বাহাদুরের ষ্টেটভুক্ত হইয়াছে। উক্ত আম্রের আকার প্রায় গোল এবং ওজনে দেড় পোয়া হইতে আধ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ফল আঁশ-শূন্য ও রসাল। আস্বাদ অম্ল মধুর। এই জন্য নওয়াবদিগের মধ্যে ইহা অতিশয় আদরণীয়। গাছ-পাকা ফল ৮৷১০ দিন ঘরে রাখিলে খাইবার উপযোগী হয়। ইহা আষাঢ় মাসে পাকিতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত থাকে, এই জন্য ইহা বিশেষ দরে বিক্রয় হয়।

*ইহাকে খোদাবক্সও কহে।

শতকরা ৮ টাকা হইতে ১০ টাকা পর্য্যন্ত ইহার দর।

কহিতুর—আঁটির গাছ। শ্রীযুক্ত নওয়াব বাহাদুরের মধ্যম ভ্রাতা নওয়াব হোসেন আলি মৃর্জা ওরফে মাজ্‌লা সাহেব—বাহাদুরের বাগানে এই আম্রের উৎপত্তি*। পূর্ব্বে উহা জনৈক ইউনানী চিকিৎসা ব্যবসায়ী হাকিম আগা মহম্মদ সাহেবের ছিল। মুরসিদাবাদ-সহরে উক্ত মাজ্‌লা-সাহেবের ন্যায় আম্র আস্বাদনকারী আর কেহ নাই বলিয়া খ্যাত। হাকিম-সাহেব কোনও সময়ে এই আম্র সহিত একখানি সব্‌জী-ডালি তাঁহাকে উপঢৌকন প্রেরণ করেন। অন্যান্য আমের মধ্যে নওয়াব-সাহেব 'কহিতুর' আমকেই উৎকৃষ্ট বলেন এবং তদনুসারে তিনি হাকিম-সাহেবের নিকট হইতে উক্ত গাছটী ২০০০ (দুই হাজার টাকা) মূল্যে খরিদ করিয়া লয়েন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই আম গাছ কালাপাহাড় ফলের আঁটি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু কহিতুরের আকার, আস্বাদ ও অন্যান্য অবস্থা দৃষ্টে ইহাকে কালাপাহাড় হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয়। কহিতুরের আকার লম্বা এবং ওজনে আধ সের হইতে তিন পোয়া পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। মুরসিদাবাদ মধ্যে প্রায় ১৫০ রকমের উৎকৃষ্ট জাতীয় আম্র আছে, তন্মধ্যে ২০।২৫ রকম সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই ২০।২৫ রকমের মধ্যে 'কহিতুর' সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। বাজারে উক্ত আম্র পাওয়া যায় না, এজন্য ইহার দর নাই। ৺রায় লছমীপৎ সিংহ বাহাদুর

* মুন্সী মজফর খাঁ হোসেনের বাটী হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক এই গাছ রৈইসবাগে আনীত হয়।

o Gazateer of Mysore and Coorg by Lewis Rice.

বিপুল চেষ্টা করিয়া হাকিম সাহেবের নিকট হইতে একটা আম লইয়াছিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে রায় বাহাদুর মূল্য স্বরূপ তাঁহাকে পাঁচটা টাকা দিতে চাহেন, কিন্তু হাকিম সাহেব উক্ত আমের বিনিময়ে পাঁচটা টাকা অনুপযুক্ত বিবেচনায় গ্রহণ করেন নাই। যাহা হউক, পাকা-আম ৩।৪ দিন ঘরে জাগ দিয়া রাখিলে খাইবার উপযোগী হয়। ইহা কতক পরিমাণে কষ্ট সহ্য করিতে পারে অর্থাৎ নাড়া চাড়াতে সহজে তাহার স্বাদের বৈলক্ষণ্য হয় না। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই ইহা পাকিতে আরম্ভ হয় এবং আষাঢ় মাসের কিছু দিন পর্য্যন্ত থাকে।

কালা-পাহাড়—অন্য কোন স্থান হইতে যে আনীত হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। মৃত নওয়াব-নাজীম সিদি দরাবালি খাঁ বাহাদুরের বাগানে আসল আঁটির গাছ অদ্যাপি আছে। উক্ত গাছ হইতে অন্যান্য নওয়াবদিগের এবং ২।১টী গৃহস্থ ভদ্রলোকের বাগানে কলম জন্মিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, 'মৃজা-পসন্দ' আমের আঁটি হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে। মুরসিদাবাদের কালা-পাহাড়ের সঙ্গে বাজারে কালা-পাহাড়ের অনেক বিভিন্নতা আছে। প্রথমোক্ত স্থানের কালা-পাহাড় গাছের পাতা সরু ও লম্বা এবং শাখাপ্রশাখা কৃষ্ণাভাযুক্ত। ফলের আকার প্রায় গোল কিন্তু নিম্নাংশ কিঞ্চিৎ লম্বাকৃতি। ওজন প্রায় আধসের। ফলের খোসা বা ছাল অত্যন্ত পাতলা, আস্বাদ অপরিমিত মিষ্ট, এবং রসাল। ফল কর্ত্তন কালে রস গড়াইয়া যায়; যেরেসা বা আঁশ-শূন্য এবং আঁটি অতিশয় ছোট। পাকিলে উপরিভাগের বর্ণের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, এজন্য ফল সুপক্ক এবং অপক্কের

উপযোগী হইয়াছে কি না—স্থির করা বড় কঠিন। কাঁচা অবস্থায় যেরূপ কোমল থাকে, পাকিলে ও তাহার রূপান্তর হয় না। কাঁচা আম্রফল গাছ হইতে পাড়িয়া ফলের অবস্থানুসারে তিন দিন হইতে ছয় দিন পর্য্যন্ত জাগে রাখিলে কাল রঙ্গের উপরে কোন কোন স্থানে হরিদ্রাবর্ণের ঈষৎ আভা দেখা যায় এবং সেই সময়েই খাইবার উপযোগী হয়। এই অবস্থার পূর্ব্বে ভক্ষণ করিলে অতিশয় অম্লাক্ত বোধ হইবে এবং অজ্ঞানিত ব্যক্তি ইহাকে অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর আম্র বলিয়া ঘৃণা করিবেন। আবার ঠিক পাকা অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে ইহার আস্বাদ পান্সে ও ঝাল বোধ হইবে। পল-অনুপল গণনা করিয়া যেমন শক্তি-পূজায় বলিদানের সময় নির্দ্দেশ করিতে হয় 'কালা পাহাড়' আম্র খাইবার পক্ষেও তাহাই, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ঠিক সময়মত ইহাকে সুপক্কাবস্থায় খাইতে পারিলে তবে ইহার গুণ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বাজারে ইহা খরিদ করিতে পাওয়া যায় না। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ হইতে পাকিতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাসের শেষ অবধি থাকে।

খরমুজা—আম্রের গাছ খাস চুণাখালিতে আছে। আদি গাছটী আঁটি-জাত এবং তাহা উক্ত মহালের জমিদারের দখলে আছে। নওয়াবদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই গাছটীর সত্ত্ব খরিদ করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই গাছ হইতে কলম অন্যান্য কোন কোন বাগানে গিয়াছে সত্য, কিন্তু সে সকল গাছের ফল মূলগাছের ন্যায় হয় নাই। এই আম্রের আকার প্রায় গোল

এবং ওজনে প্রায় বেড়পোয়া হইবে। ইহা উৎকৃষ্ট জাতীয় আম্রের মধ্যে গণ্য, সুতরাং উৎকৃষ্ট আম্রের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক গুণসমুদায়ই ইহাতে পাওয়া যায়, অধিকন্তু ইহাতে খরমুজার সুন্দর গন্ধ পাওয়া যায় বলিয়া ইহার নাম খরমুজা হইয়াছে। এই আম্র নওয়াবদিগের বিশেষ আদরের জিনিস। চুণাখালির আসল গাছের আম্র প্রতি বৎসর বিক্রয় হইয়া থাকে। কোন কোন বৎসর এই গাছের ফলকর ২৫০৲ হইতে ৩০০৲ টাকায় বিক্রয় হয় এবং সেই আম্র বাজারে শতকরা ৫।৬ টাকায় বিক্রয় হয়। ইহা জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে পাকিয়া ফুরাইয়া যায়, তবে কখন কখনও আষাঢ় মাসের ৮।১০ দিন পর্য্যন্তও থাকে। এই আম্র জাগে ৩।৪ দিন থাকিলে খাইবার উপযোগী হয়। ইহা কতক পরিমাণে কষ্টসহ।

খানম্-পসন্দ— মুরসিদাবাদে কোন্ সময়ে ও কোন্ স্থান হইতে আনীত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। এই গাছটি কলমের এবং ইহা নিজামৎ-ষ্টেট-ভুক্ত 'কৌজ-বাগ' নামক বাগানে আছে। ইহার কলম অন্য কোন বাগানে নাই এবং কাহারও পাইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ ইহার কলম কাহাকেও দেওয়া হয় না।

ক্ষীরসাপাত— বহুদিন পূর্ব্বে মালদহ হইতে মুরসিদাবাদে আইসে কিন্তু মুরসিদাবাদের মাটি ও আবহাওয়া আম্র বৃক্ষের পক্ষে বিশেষ অনুকূল বলিয়া এক্ষণে মালদহের ক্ষীরসাপাত হইতে মুরসিদাবাদের ক্ষীরসাপাত এক স্বতন্ত্র জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রায় সকল নওয়াবদিগের বাগানেই ইহা আছে এবং

চুণাখালিতে ও অনেকগুলি গাছ আছে। এই আম্র ঈষৎ লম্বা ধরণের এবং নাসিকা-বিশিষ্ট। ওজনে একপোয়া হইতে সাত ছটাক পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। পাকিলে বোঁটার দিকে মেটে হরিদ্রা বর্ণ হয়। ইহার গুণ কতক পরিমাণে অমৃতভোগ আম্রের ন্যায়। পাকা অবস্থায় অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকিতে পারে এবং খোসা কুঞ্চিত হইলেও পচিতে দেখা যায় না, সুতরাং দেশান্তরে প্রেরণ করিবার উপযোগী। গাছ-পাকা আম্র ১৫।২০ দিন পর্য্যন্ত ঘরে রাখা চলিতে পারে এবং তাহাতে স্বাদের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না। প্রথম শ্রেণীর আম্রের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক তৎসমুদায়ই ইহাতে আছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে ইহা পাকিয়া শেষ হইয়া যায়। সচরাচর ৩৲ টাকা দরে পাওয়া যায় এবং যে বৎসর ফলন অধিক হয়, তখনই ২৲ টাকাতে পাওয়া যায়।

তোতা—দুই জাতীয়, এক বড়; অপর ছোট। বড় জাতীয়কে 'হরিগঞ্জের তোতা' কহে। ইহার মূল গাছ নওয়াব রৈসন্নিসা বেগম সাহেবার হরিগঞ্জের বাগানে আছে। গাছটী আঁটী হইতে উৎপন্ন। অন্যান্য বাগানে যে তোতা আছে, তাহাপেক্ষা 'হরিগঞ্জের তোতা' উৎকৃষ্ট। এই আম্রের নাসিকাটী ঠিক তোতাপাখীর ন্যায়, এই জন্য ইহাকে 'তোতা' কহে। আম্রের আকার লম্বা এবং ওজনে প্রায় আধসের হইবে। পাকিলে হরিদ্রা বর্ণ হয়। খোসা খুব পাত্‌লা, শাঁস বেরেশা, আঁটী ছোট এবং আস্বাদ খুব মিষ্ট। বৈশাখ মাসের শেষভাগে পাকিতে আরম্ভ হইয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত থাকে। এই আম্র বিশিষ্ট পরিমাণে কষ্টসহ। পাকা আম্র ২।৩ দিন রাখে

রাখিলে খাইবার উপযোগী হয়। শতকরা ৩৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা দরে বিক্রয় হয়।

ছোট জাতীয় তোতাও প্রায় উহার ন্যায়। এই তোতা রৈসবাগে আছে।

দাউদ-ভোগ—মুরসিদাবাদের কোন্ আম্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারে না। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে এই আম্রের নাম শুনা যায় নাই। মৃত দারাবালি খাঁ বাহাদুরের বাগানে দুইটি কলমের গাছ আছে এবং সেই গাছ হইতে আরও কয়েকটী বাগানে ইহা বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার আকার লম্বা কিন্তু ছোট, ওজনে এক পোয়ার অধিক হয় না। রং হরিদ্রাবর্ণ, স্বাদ উপাদেয় এবং নির্দ্দোষ ও নাবি (Late) অর্থাৎ শ্রাবণমাস পর্য্যন্ত থাকে। শ্রাবণ মাসে শতকরা ৮।১০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়। পাকা আম্র ২।৩ দিন 'জাগে' রাখিলে খাইবার উপযোগী হয়।

দুদিয়া বা দুধিয়া—আঁশযুক্ত সুমিষ্ট আম্র, দুগ্ধের উপযোগী। এজন্য অনেকে ইহাকে 'দুদিয়া' কহেন। আবার কেহবা আম্রের ভিতর সাদা বলিয়া ইহাকে দুধিয়া বলেন। এই দুই কারণে দুধিয়া অনেক প্রকারের দেখা যায়। শ্রীযুক্ত মাঙ্গলা সাহেবের মিঞা অম্বরের দরুণ বাগানে যে 'দুধিয়া' আম্রের গাছ আছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং প্রকৃতপক্ষে দুধিয়া নাম ধারণের উপযোগী। কারণ, কাটিলে ইহার বর্ণ দুগ্ধের ন্যায়, আস্বাদ অতিশয় সুমিষ্ট, সুতরাং দুগ্ধে খাইবার সম্পূর্ণ উপযোগী। ইহার আকার ছোট এবং গোল; বর্ণ,—হরিদ্রাভ। জ্যৈষ্ঠ মাস মধ্যে পাকিয়া শেষ হইয়া যায়। শতকরা

টাকা দরে বিক্রয় হইয়া থাকে।

নাজুক-বদন—হিন্দি শব্দ। 'নাজুক' অর্থে কোমল (delicate) বা লজ্জাশীল এবং বদন অর্থে শরীর। বস্তুতঃ উপযুক্ত আম্রকে উপযুক্ত নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহা এতই কোমল যে অঙ্গুলির ভর সহিতে অক্ষম। অসাবধানতাবশতঃ আম্রটি একটুমাত্র টিপিয়া ধরিলে গাত্রে দাগ বসিয়া যায়, এজন্য ইহাকে আলগাভাবে ধরিতে হয়। ঠুসিতে বা জাল্‌তিতে একটী আম্র পাড়িয়া আর একটী আম্র পাড়িলে পরস্পরে সামান্য ঠেসাঠেসিতে উভয় আম্রই নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য প্রত্যেক আম্র স্বতন্ত্রভাবে পাড়িতে হয়। ইহার আকার লম্বা ধরণের এবং রং ফিকে হল্‌দে; ওজনে একপোয়া হইতে দেড়পোয়া পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আস্বাদ অতি সুমিষ্ট কিন্তু খোসা এত পাতলা যে ছুরীর ভর সহ্য করিতে পারে না। খাইতে এত ঠাণ্ডা বোধ হয় যে, সত্ত যেন বরফ হইতে তুলিয়া আনা হইয়াছে এবং কণ্ঠ-মধ্যে যতদূর যায় বেশ জানিতে পারা যায়। উক্ত আম্র প্রায় সকল নওয়াবদিগের বাগানেই আছে। মৃত্তিকাভেদে কোন কোন আম্রের স্বাদের তারতম্য হয়। এই আম্রকে অতি যত্নে ৪।৫ দিন জাগে রাখিলে খাইবার উপযোগী হয়। শতকরা ৬৲ টাকার কমে পাওয়া যায় না। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে পাকিয়া শেষ হইয়া যায়।

নাজিম-পসন্দ—বৃক্ষ স্বভাবতঃ লম্বাকৃতি হয় এবং দুই একটি গাছ দেখিলেই অপর গাছকে অনায়াসে চিনিতে পারা যায়। উক্ত আম্রের গাছ কোথা হইতে মুরসিদাবাদে প্রথম আনীত হয় তাহা নির্ণয় করা যায় না, কিন্তু বহু প্রাচীন গাছ দেখিয়া

অনুমিত হয় যে, ইহা বহু বৎসর হইতে মুরসিদাবাদে আছে। বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার নওয়াব-নাজিম নওয়াব হুমায়ূন জা,—বর্ত্তমান নওয়াব বাহাদুরের প্রপিতামহ—এই আম্র বড়ই পসন্দ করিতেন এবং সেই জন্যই ইহার নাম নাজিমপসন্দ হইয়াছে।

ইহার আকার গোল, এবং ওজন প্রায় দেড় পোয়া হইবে। পাকা অবস্থায় পীত-বর্ণের। জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকিতে আরম্ভ হইয়া আষাঢ় মাসের ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত থাকে। এই আম্র সাধারণ বা মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে সুবিধাজনক নহে, তাহার কারণ এই যে, কালাপাহাড় আম্রের অপেক্ষাও ইহাকে খাইবার জন্য ঠিক সময়কাল প্রতীক্ষা করিতে হয়। উত্তমরূপে পাকিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ইহাকে খাইলে অত্যন্ত টক্, আবার অতিরিক্ত পাকিয়া গেলে বিস্বাদ ও ঝাল বোধ হয়। এত পল, অনুপল গণিয়া কয়জন আম্র খাইতে পারে? ঠিক সময়ে খাইতে পারিলে সুপক্ক বোম্বাই বা আলিপসন্দ প্রভৃতি উত্তম জাতীয় আম্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বোধ হইবে। পূর্ব্বে নওয়াবাবের দরবারে আম্রের ঘরোয়া প্রদর্শনী বা প্রতিযোগীতা (Private Exhibition) হইত এবং নানা জাতীয় উৎকৃষ্ট আম্র আনীত ও পরীক্ষিত হইত। যাবতীয় উৎকৃষ্ট আম্র নাজিম-পসন্দ আমের নিকট হার মানিয়াছিল। শুনিয়াছি, পূর্ব্বে উত্তমরূপে তুলা পিঁজিয়া, তাহারই উপর এই আম্রকে গৃহমধ্যে বিস্তৃত করিয়া রাখা হইত। নাজিম-পসন্দের দুইটি সতেজ গাছ 'রৈইসবাগে' আছে।

পাঞ্জা-পসন্দ—খাস চুণাখালিতে আছে। মহম্মিবল আমৎ এই গাছ জগীরপুরের জমিদারগণের জনৈক প্রজার

বাড়ীতে ছিল। ৩০।৩৫ বৎসর হইতে এই গাছ শ্রীযুক্ত নও- বাহাদুরের দখলে আসিয়াছে। গরীব প্রজা অনেক দিন চেষ্টা করিয়া এই গাছটি রাখিয়াছিল কিন্তু অবশেষে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ায় আদালত কর্ত্তৃক তাহার সম্পত্তি নীলাম হইলে নওয়াব সৈয়দ সাহেব তাহা খরিদ করেন। পরে, তাহা উক্ত নওয়াব বাহাদুরের অধিকারে আইসে। শুনা যায়, ২।৩টি কলম অপর বাগানে গিয়াছে।

ফয়কল-বয়ান—মুরসিদাবাদের আদিম আম্র। নওয়াব-দিগের কোন কোন বাগানে অতি প্রাচীন গাছ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কয়েকটী গাছ শতাধিক বৎসরেরও অধিক বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার বিশেষ গুণ নাই, তবে ভাল জাতীয় আম্রের যে যে গুণ থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয় তৎসমুদায় ইহার আছে। ওজনে প্রায় ✓।০ আধসের, রং সিন্দুরিয়া। ইহা জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে। মূল্য,—শতকরা ৩৲ হইতে ৪৲ টাকা। চুণাখালির সিন্দুরিয়ার সহিত অনেক সাদৃশ্য আছে।

চীনের-আম্র—মুরসিদাবাদের অন্তর্গত বহরমপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত রাধিকাচরণ সেন মহাশয়ের বাগানে ইহার একটি গাছ আছে। উহার গাছ ৬।৭ হাতের অধিক উচ্চ হয় না, কিন্তু বেশ ঝাড়বিশিষ্ট হয়। ফল মধ্যবিধ প্রকারের এবং আস্বাদ মাঝারি সাটের।*

* আম্র সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক আছে। গ্রন্থকারকৃত Treatise on Mango নামক পুস্তকে সে সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

পেয়ারা

Psidium Guava.

GUAVA.

পেয়ারার আদিম উৎপত্তি স্থান দক্ষিণ আমেরিকা, কিন্তু ভারতবর্ষে ইহা এতই বিস্তৃত হইয়াছে যে ইহাকে একণে ভারতীয় বৃক্ষ বলিলেও চলে। অনেক জঙ্গল মধ্যেও পেয়ারা গাছ দেখা যায় কিন্তু তাহার ফল অতিশয় নিকৃষ্ট। বাঙ্গালা দেশে যে পেয়ারা জন্মে তাহা অপেক্ষা বেহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ফল সুমিষ্ট, সুস্বাদ, ও সৌরভ যুক্ত। কাশী ও এলাহাবাদের পেয়ারা বিখ্যাত, কিন্তু তাহারা বাঙ্গালায় তাদৃশ ফল প্রদান করিতে পারে না। মাটি ও আবহাওয়ার বিশেষত্বে এরূপ হইয়া থাকে। তবে যত্ন করিয়া আবাদ করিলে কিয়ৎ পরিমাণে সফল হওয়া যায়।

ফলের ভিতরের শাঁসের বর্ণানুসারে পেয়ারাকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,—লাল ও সাদা। লাল অপেক্ষা সাদা পেয়ারা অধিকতর মিষ্ট হয়। কাফ্রি নামক এক জাতীয় পেয়ারা আছে, তাহার গাত্র সমান নহে—বন্ধুর, কিন্তু স্বাদ মন্দ নহে। যে পেয়ারার ত্বক, পাত্‌লা, দানা কম, এবং শাঁস মিষ্ট ও সুগন্ধযুক্ত তাহাই উৎকৃষ্ট।

বীজ ও গুটি-কলমে ইহার চারা হয়। বীজের চারা ফলিতে ৪।৫ বৎসর সময় লাগে, আর কলমের চারা দুই বৎসর মধ্যেই ফলিয়া থাকে কিন্তু এত শীঘ্র ফলিতে দিলে গাছ অধিক বাড়িতে না এবং শীঘ্রই নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

ফাল্গুন-চৈত্র মাসে পেয়ারা গাছ মুকুলিত হয় এবং আষাঢ় মাসের শেষ ভাগ হইতে প্রায় ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত ফল পাওয়া যায়। বর্ষাকালে হাল্‌কা মাটিতে বীজ রোপণ করিতে হয়। বীজ সুপক্ক ফলের হওয়া আবশ্যক। হাপোরে পাত* দিয়া চারা তৈয়ার হইলে এবং চারাগুলি ৫।৬ ইঞ্চ বড় হইলে, দ্বিতীয় হাপোরে ফাঁক-ফাঁক করিয়া বসাইয়া যথানিয়মে পালন করিতে হয়। দ্বিরোপণ কালে চারাদিগকে 'খাসী' করিয়া দিলে গাছগুলি উচ্চে অধিক বড় না হইয়া পার্শ্বদেশে শাখা প্রশাখা বিস্তৃত করিয়া অধিক ফল প্রদান করে। চারাগুলিকে দ্বিতীয় বৎসরের আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক মাসের যে কোন সময়ে ক্ষেত্র মধ্যে আট হইতে দশ হাত অন্তর রোপণ করিতে হইবে।

বর্ষার প্রারম্ভেই অর্থাৎ আষাঢ় মাসেই গুটী কলম বাঁধিতে হয়। এই সময়ে অর্দ্ধপক্ক শাখায় কলম বাঁধিয়া যত্ন করিলে এক মাস মধ্যেই কলম তৈয়ার হইয়া যায়। তখন কলমকে মূল-বৃক্ষ হইতে স্বতন্ত্র করতঃ কিছুদিন হাপোরে রাখিতে হয় অতঃপর যখন উহারা কিঞ্চিৎ সামলাইয়া উঠিবে, তখন অর্থাৎ কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসেই ক্ষেত্রে রোপণ করিতে পারা যায়।

চারা গাছগুলিকে গবাদি পশুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত বেড়া দ্বারা ঘেরিয়া দেওয়া আবশ্যক। চারা গাছের জলের অভাব না হয়, এজন্ত তাহাকে আবশ্যক মত জল যোগাইতে হইবে। প্রতিবৎসর কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে গাছের গোড়া উত্তমরূপে কোপাইয়া দিতে হয় এবং সেই সময় গোড়ায় নূতন মাটি বা সার দিলে বিশেষ উপকার হয়। বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় মাটি উচ্চ করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

গাছে ফল ধরিবার পর কতকগুলি ফল আপনা হইতে পড়িয়া যায়,—সেগুলি অপুংসেবিত (Unfertilised) ফল। ইহাদিগকে বাঁজা ফল বলিতে পারা যায়। অতঃপর, যে ফলগুলি অবশিষ্ট থাকে সেগুলিকে ছেঁড়া কাপড় বা চট্ দ্বারা বাঁধিয়া দিলে কাটবিড়াল, বাদুড় ও পক্ষীতে নষ্ট করিতে পারে না। তাহা ব্যতীত, চটের মধ্যে এইরূপে আবদ্ধ থাকিলে ফল বড় হয়, কোমল ও রসাল হয়।

পেয়ারা গাছের পাতা মুড়িয়া তন্মধ্যে পীপিলিকায় বাসা নির্ম্মাণ করে। যখন এইরূপ বাসা দেখা যাইবে, তখন তাহা না ভাঙ্গিয়া দিলে ক্রমে ইহাদিগের বংশ বৃদ্ধি হইয়া বৃক্ষময় ঐরূপ বাসা করে। ইহাতে ক্রমে গাছের অনিষ্ট হয়। গাছে যে সমুদায় শুষ্ক ও রুগ্ন শাখা-প্রশাখা থাকিবে তাহা কাটিয়া দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

ম্যাঙ্গোষ্টিন

GARCINIA MANGOSTANA

Mangosteen

ম্যাঙ্গোষ্টিন, মালয়দ্বীপ-পুঞ্জের স্বভাবজ উদ্ভিদ। গাছের বৃদ্ধি অতিশয় মন্থর। গাছের আকার সুবিন্যস্ত; পত্রসমূহ ৮।৯ হাত দীর্ঘ এবং মধ্যস্থলের প্রশস্ততা ২-ইঞ্চের অধিক; কিন্তু পত্রনিচয় সুচিক্কণ। ফলের আকার হংসডিম্ববৎ এবং প্রায় তত বড়।

বর্ণ পাটকিলে, এবং ত্বক খসখসে। শাঁস কোমল ও মধুর এবং আস্বাদ উপাদেয়, সৌরভ মনোহর। ম্যাঙ্গোষ্টিন গাছ এদেশে বড় বিরল, সহজে ফল ধারণ করে না বলিয়াই বোধ হয় লোকে ইহা রোপণ করে না। গ্রন্থকারের বাড়ীতে পঞ্চাশ বৎসরের অধিক বয়স্ক একটী ম্যাঙ্গোষ্টিন গাছ আছে। উক্ত গাছটী ২০।২২ হাত উচ্চ এবং কাণ্ডের নিম্নভাগ একটী মোটা বাঁশ অপেক্ষা স্থূল নহে। কোন কোন বৎসর ফুল হয়, কিন্তু কখনও ফল হয় নাই। দ্বারভাঙ্গা রাজোদ্যানে ২টী ম্যাঙ্গোষ্টিনের গাছ আছে, তাহাতে প্রতিবৎসর ফল হয়। বাঙ্গালার মধ্যে দিনাজপুর রাজবাটীতে—ঠিক স্মরণ হইতেছে না ২টী কি ৩টী—ম্যাঙ্গোষ্টিন গাছ আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার দিনাজপুর গিয়াছিলাম তখন আষাঢ় বা শ্রাবণ মাস। গাছটী তখন ফলে পূর্ণ ছিল। ২।১টী ফল ভক্ষণও করিয়াছিলাম। শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের মুখে শুনিয়াছি যে, উক্ত গাছটীর বয়স অনেক, কিন্তু কখনও ফল ধারণ করিত না। গাছটীকে একবার উত্তমরূপে ছাঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহারই ফলে পরবৎসর হইতে ফলধারণ করিতেছে।

সুপক্ক ফলের বীজ হইতে চারা উৎপন্ন হয়। তাহা ব্যতীত গুটী ও দাবা করিয়া কলম উৎপন্ন করিতে পারা যায়। গাবের চারার সহিত জোড়কলম হইতে পারে। প্রত্যেক গাছের জন্য চারিদিকে ৮।১০ হাত স্থান থাকা প্রয়োজন। এরূপ সুখাদ্য ফল সকল বাগানেই স্থান পাইবার যোগ্য। ফলধারণ বিষয়ে লাজুক হইলেও বিভিন্ন তদ্বিরে বৃক্ষকে ফলন্ত করিতে পারা যায়, সুতরাং চেষ্টা করা উচিত।

লকেট

ERIOBOTRYA JAPONICA

Loquat

লকেটের আদিম উৎপত্তি স্থান—চীন ও জাপান, কিন্তু অনেক দিন হইল উহা ভারতের নানা দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশেও অনেকের বাগানে লকেটের গাছ আছে এবং তাহাতে ফল হইয়া থাকে কিন্তু বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা যুক্ত-প্রদেশ ও পঞ্জাবের লকেটের আকার বড়, রসাল ও রসনাতৃপ্তিকর হইয়া থাকে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে ফল পরিপক্ক হয়। পঞ্জাবের অন্তর্গত পাতিয়ালা, অম্বালা, নাভা এবং যুক্ত প্রদেশের সাহারাণপুর, বেনারস ও লক্ষ্ণৌর যেরূপ বড় বড় ও রসাল ফল দেখিয়াছি, ভারতের কুত্রাপি সেরূপ দেখা যায় না। শেষোক্ত কয় স্থানের ফল ওজনে তিন ভরির অধিক হইবে।

দেশের জলবায়ু ও মাটির তারতম্যে লকেটের আকার, আস্বাদ প্রভৃতির তারতম্য হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের ফল অপেক্ষাকৃত ছোট এবং তাদৃশ সুস্বাদ হইতে দেখা যায় না কিন্তু পরিচর্য্যা দ্বারা ফলের গুণবৃদ্ধি করিতে পারা যায়।

লকেট গাছ সচরাচর ২০।২৫ ফুট উচ্চ হয়। ইহার পাতাগুলি সুঠাম ও ঘন শ্যাম বর্ণের কিন্তু পাতার তলদেশ ঈষৎ শুভ্রবৎ।

সাধারণতঃ আমরা লকেটের একটী-মাত্র জাতি দেখিতে পাই কিন্তু ফলের আকার, শস্তের আস্বাদ, ঘ্রাণ এবং বর্ণ—এই কয়টী গুণ লইয়া বিচার করিলে লকেট ফলকে বিভিন্ন জাতিতে

বিভক্ত করিতে পারা যায়, কিন্তু এদেশে সে চেষ্টা কৈ ? ফলতঃ নানা প্রদেশ, নানা জেলার ফলের মধ্যে আমরা বিশেষ তারতম্য উপলব্ধি করি না। কোন গাছের ফলের স্বাদ মধুর, কোন গাছের ফলের স্বাদ অম্ল-মধুর, কোন গাছের ফলের স্বাদ কোমল, আবার কোন গাছের ফল সুবাসিত। যাহা হউক, ভাল গাছের চারা রোপণ করা স্পৃহণীয়।

উত্তম ফলের বীজ সংগ্রহ করতঃ জ্যৈষ্ঠ মাসেই হাপোরে চারি অঙ্গুলি ব্যবধানে বপন করিতে হয় কিন্তু কলমের চারা রোপণই প্রশস্ত। চারা উৎপাদনের জন্য নূতন বীজ ব্যবহার করা উচিত।

রসা কিম্বা নাবাল জমিতে লকেট-গাছ রোপণ করিবে না। আষাঢ় মাসে গাছ রোপণ করিতে হয়। গাছে যথারীতি জল-সেচন এবং মধ্যে সার প্রদান করিতে হইবে। গাছের বৃদ্ধির সহিত প্রতি বৎসর গাছের ছায়া পরিমিত স্থানের থালা বিস্তৃত করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

পঞ্চম বৎসরে গাছ ফল ধারণ করে এবং গাছ যত বয়োবৃদ্ধ হইতে থাকে ততই শাখাপ্রশাখা বৃদ্ধিলাভ করে ফলতঃ গাছের ফলধারণ শক্তিও বৃদ্ধি পায়। ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে পুষ্পিত হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ বর্ষা উত্তীর্ণ হইলে কার্ত্তিক মাস মধ্যে গাছের গোড়ার চতুর্দ্দিকের মাটি কুদ্দালিত ও চূর্ণীত করিয়া দিতে হয়। অতঃপর গোড়ায় আধ হাত হইতে পৌণে একহাত মাটি অপসারিত করিয়া ৩।৪ সপ্তাহ কাল তদবস্থায় রাখিয়া দিতে হইবে। অনন্তর বৃক্ষের পাদদেশস্থিত থাল মধ্যে পশ্বাদি পশুশালার পুরাতন আবর্জ্জনা বা গলিত লতাপাতাদি

প্রসারিত করণান্তর অল্পাধিক উত্তোলিত মাটির সহিত মিশাইয়া গোড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে শাখাপ্রশাখার ডগা হইতে পুষ্প উদ্গত হয়। পুষ্পের সৌরভ মনোহর। পুষ্প উদ্গত হইলে উত্তমরূপে গাছের গোড়ায় জল সেচন করিতে হইবে। অতঃপর জল টানিয়া গিয়া মাটিতে যো হইলে, গোড়ায় মাটি উস্কাইয়া পরদিবস সেই আল্‌গা মাটি ঈষৎ চাপিয়া দিতে হয়। অনন্তর থালার উপর ২।৩ অঙ্গুলি পুরু করিয়া পাতাসার বা উদ্ভিজ্জ বা পশুশালার আবর্জনা প্রসারিত করিয়া দিলে মাটি ফাটিবে না, মাটি সরস ও ঠাণ্ডা থাকিবে। ইহাকে Mulching কহে।

গাছে ফল আগত হইলে মৃত্তিকার অবস্থা বুঝিয়া ২।৩ সপ্তাহ অন্তর প্রচুর পরিমাণে জল সেচন করিতে হয়, এবং তাহা হইলে ফল বড় হয়, ফলের শস্য কোমল ও রসাল হয়।

চৈত্রমাসে ফল পাকিয়া উঠে এবং বৈশাখের শেষভাগ পর্য্যন্ত ফল পাওয়া যায়। ফল শেষ হইয়া গেলে শীষগুলি কাটিয়া দেওয়া উচিত।

* মৎকৃত 'ভূমিকর্ষণ' নামক পুস্তকে Mulching বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

তুৎ বা তুন্ত

MORUS

Mulberry

তুৎ গাছ উত্তর-ভারতের নিজস্ব উদ্ভিদ। সচরাচর ১৫।১৬ হাত উচ্চ এবং বহু শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট ঝাঁকড়া গাছ হইয়া থাকে। তুৎ ফলের আকার পিপুলের ন্যায় কিন্তু অপেক্ষাকৃত স্থূল ও দীর্ঘ হয়। বাঙ্গালা দেশে বয়স্কদিগের নিকট তুৎফলের তত আদর নাই, কিন্তু অল্পবয়স্কদিগের নিকট অতি প্রিয়। যুক্ত-প্রদেশে ও পঞ্জাবে জনসাধারণের নিকট তুৎ ফলের আদর আছে। শেষোক্ত প্রদেশদ্বয়ের ফলগুলি বাঙ্গালার ফল অপেক্ষা বড় বড় হয়, সুতরাং সমধিক শাঁসাল হয়। সুপক্ব ফলের বর্ণানুসারে তুৎ দুই জাতিতে বিভক্ত (১) কৃষ্ণ-তুৎ (Morus indica) এবং (২) শ্বেত-তুৎ (Morus multicacetes)। শেষোক্ত সা-তুৎ নামে অভিহিত। উভয়ের আস্বাদ মধ্যে বিশেষ ভেদ দেখা যায় না। সুপক্ব কৃষ্ণ-তুতের রস রক্তিম বর্ণের। সাহেবদিগের মতে ইউরোপীয় তুৎ অপেক্ষা ভারতীয় তুৎ নিকৃষ্ট। এদেশে কৃষ্ণ তুতের প্রাদুর্ভাব অধিক।

সিংহল দ্বীপের অত্যুচ্চ প্রদেশের বিদ্যালয় সমূহে তুৎগাছ রোপিত হইয়া থাকে এবং সেই সকল গাছের পত্র স্থানীয় পলু-পালকগণ ক্রয় করে। বাঙ্গালাদেশের মধ্যে যাহারা পলু-পালন করে, তাহারা তুতের ক্ষেত করে। এই সকল আবার 'পাতের আবাদ' নামে অভিহিত। পূর্ব্বে মুরসিদাবাদ, মেদিনীপুর প্রভৃতি

জেলায় রেসমের কারবার থাকায় যথেষ্ট পাতের আবাদ হইত একণে অনেক হ্রাস পাইয়াছে। দারভাঙ্গায় অবস্থান কালে আমি পলু-পুষিয়াছিলাম, এবং তাহাদিগের খোরাকের জন্য বিস্তীর্ণ 'পাতের' ক্ষেত করিতে হইয়াছিল।

খণ্ড শাখা রোপণ করিলেই তুৎ-চারা উৎপন্ন হয়। বর্ষাকালে আষাঢ়ের কলম কার্ত্তিক মাসে স্থায়ীরূপে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিতে পারা যায়। গাছের চতুষ্পার্শ্বে ৮ হাত স্থান থাকা প্রয়োজন।

তুতের ফলন পর্য্যন্ত, সুতরাং বাগানের মধ্যে দুই—একটী বৃক্ষ থাকিলেই যথেষ্ট। ইহার পাট-পরিচর্য্যা সাধারণ। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ফল শেষ হইয়া গেলে পুরাতন স্থূল শাখা সমূহের নিম্নাংশের পাকা অংশ রাখিয়া উর্দ্ধাংশ কাটিয়া ফেলিতে হয় এবং সেই সময় বৃক্ষের তলদেশের চক্রপরিমিত স্থান কুদ্দালিত করতঃ মাটি চূর্ণ করিয়া দিতে হয়।

পেপিয়া

CARICA PAPAYA

Papaya or Papaw

সচরাচর আমরা পেপিয়া শব্দের পরিবর্ত্তে পেঁপে শব্দ ব্যবহার করি কিন্তু উক্ত শব্দর বৈজ্ঞানিক পেপিয়া শব্দের রূপান্তর মাত্র। ইহার ইংরাজি ডাক-নাম Papaya বা Papaw। ইহার বিধিনির্দ্দিষ্ট জন্মস্থান,—দক্ষিণ আমেরিকা, কিন্তু কতদিন

পূর্ব্বে এবং কাহার দ্বারা ইহা ভারতবর্ষে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় তাহার নিরাকরণ হয় না। দক্ষিণ আমেরিকা হইতে ইহা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মালয় উপদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর, সিংহল প্রভৃতি প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের অন্তঃবর্ত্তী অনেক স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উক্ত দেশ সমূহের পেঁপিয়া বৃহদাকার ও বহু-শাঁস হইয়া থাকে। ভারতের মধ্যে মহীশূরের পেঁপে,—আকার, শাঁসবাহুল্য ও মিষ্টতা গুণে আদর্শ স্থানীয়।

পেঁপে বীজ অতি সহজে উপ্ত হয়, এই জন্য আমরা পেঁপে গাছ যেখানে সেখানে,—আঁদাড়-পাঁদাড়, পথিপার্শ্ব, অঙ্গিনা-কোণ প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাই, কিন্তু তাহা হইলেও ইহার পাট-পরিচর্য্যা আছে। অযত্নপালিত উৎকৃষ্ট জাতীয় গাছও নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পেঁপে গাছ, আম কাঁঠাল নারিকেলের ন্যায় গৃহস্থের একটী বিশেষ আওলাত মধ্যে পরিগণিত। মধ্যবিধ গৃহস্থালয়ে ২।৩টা গাছ থাকিলে প্রতি মাসেই ২।৪টী কাঁচা এবং ২।৪টী পাকা পেঁপে পাওয়া যায়। কাঁচা ফলে উত্তম তরকারী হয় এবং পাকা ফল সতই ভক্ষিত হয়। পেঁপে অতি জীর্ণকারী ও পুষ্টিকর ফল।

মাংস রন্ধনকালে কয়েকখণ্ড কাঁচা পেঁপে দিলে মাংস অতি শীঘ্র সিদ্ধ হয়, ফলতঃ ভক্ষণে মোলায়েম বোধ হয়। শুনিয়াছি— রন্ধনের পূর্ব্বে কাঁচা মাংস পেঁপে গাছে ক্ষণকাল ঝুলাইয়া রাখিলে, কিম্বা মাংসের সহিত ইহার আঠা মিশ্রিত করিলে মাংস অতি শীঘ্র উত্তমরূপে সিদ্ধ হয়। পেঁপে গাছের পত্র দ্বারা দক্ষিণ আমেরিকার নিগ্রোজাতি বস্ত্র পরিষ্কার করে।

পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম দাক্ষিণাত্যের, বিশেষতঃ মহীশূরের পেঁপে মধ্যমাকার লাউ-কুমড়া অথবা নারিকেলের মত বড় হয়, কিন্তু কথাটা তত প্রত্যয় করি নাই। গত বৎসর মহীশূরে গিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইয়াছে। মহীশূরের রাজধানী ব্যাঙ্গালোরে বৃহৎ বৃহৎ পেঁপে দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছিলাম। তথাকার পেঁপেগুলি সচরাচর তিন-চারি সের ওজনের হইয়া থাকে এবং সেগুলি বস্তুতঃই ছোটখাট লাউ বা কুমড়ার বা বড় নারিকেলের মত। পাট পরিচর্য্যার গুণে যে ফলের আকার এত বড় হয় তাহা নহে, প্রাকৃতিকতাই ইহার মূল কারণ। স্থানীয় অধিবাসিগণ পেঁপের প্রতি তত আকৃষ্ট নহে, এই জন্য তথায় পেঁপে অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। মহীশূরী পেঁপের তুলনায় বাঙ্গালার পেঁপে কিছুই নহে। মহীশূরী পেঁপে যে কেবল আকারে বৃহৎ, তাহা নহে, উহা শাঁসপূর্ণ, কোমল ও মধুর। সকল ফল-ফুলই স্থানীয় আবহাওয়া ও মাটির গুণসাপেক্ষ তবে ভাল জিনিসের বীজ বা গাছ পুঁতিলে তজ্জাত ফল বা ফুল যে কতকটা তাহার অনুরূপ হয় তাহা নিশ্চয়। মোট কথা অনত্যুচ্চ পাহাড়ী দেশে পেঁপে উত্তম ফল প্রদান করে। সিংহলেও উৎকৃষ্ট পেঁপে উৎপন্ন হয়। সাঁওতাল পরগণায় উত্তম পেঁপে জন্মে। এই সকল স্থানের বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করাই স্পৃহণীয়।

মাঘ মাস হইতে জ্যেষ্ঠ মাসের শেষ ভাগ মধ্যে যে কোন সময় পেঁপে বীজ বপন করিতে পারা যায়, কিন্তু অগ্রে বপন করিলে ফল ধারণ করিবার পূর্ব্বে গাছ উত্তম ঝাড়াল হইয়া উঠে। এইজন্য অগ্রে বপনই স্পৃহণীয়। মাঘ-ফাল্গুনে বীজ

বুনিলে বর্ষাকাল সমাগত হইবার পূর্ব্বেই উদ্ভাত গাছগুলি ঝাড়িয়া উঠে, এবং সমগ্র বর্ষাকালটী উপভোগ করিবার অবসর পায়। হিলঘের চারা সে সুযোগ পায় না। কারণ ইতিমধ্যে তাহার মূলবিন্যাসের এত বিস্তার হয় না যে, বর্ষাকালের বৃষ্টি তেমন ভাবে উপভোগ করিতে পারে। উপরন্তু বৃদ্ধির সময় থাকিতে-থাকিতে শীত আসিয়া পড়ে, ফলতঃ আপাততঃ বৃদ্ধি স্থগিত হয়।

রৌদ্রহীন স্থানে প্রয়োজনমত আয়তনের বীজতলা বা হাপোর রচনা করিয়া বীজ বপন করিতে হয়। বীজতলা অতি উত্তমরূপে আল্‌গা করিয়া, মাটির সহিত গবাদি পশুশালার আবর্জ্জনা মিশ্রিত করিলে চারা উৎপাদনের বড় সুবিধা হয়। মাটি তৈয়ার হইলে হাপোর সমতল করতঃ ঈষৎ চাপিয়া দিতে হয়। অনন্তর সেই হাপোরে সমান্তরাল শ্রেণীতে ৪-অঙ্গুলি অন্তর ১-যব গভীর মাটির মধ্যে বীজ পুতিয়া দিয়া হাপোরপৃষ্ঠে হস্তসঞ্চালনপূর্ব্বক মাটি সমতল করিবে এবং পৃষ্ঠদেশ করপুট বা একখণ্ড লঘু তক্তা দ্বারা চাপিয়া দিবে। অবশেষে তাহার উপরে খড় বা বিচালী প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে। উল্লিখিতরূপে বপন কার্য্য সাঙ্গ হইলে বিচালীর উপর উত্তমরূপে জলসেচন করিবে।

৭।৮ দিন মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হয়। বীজগুলি অঙ্কুরিত হইলে হাপোরের বিচালী অপসারিত করা উচিত। কচি চারা মৃত্তিকার রসাভাবে কিম্বা অতিশয় উত্তাপে না মরিয়া যায় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

পেঁপে চারার পরম শত্রু,—একপ্রকার কীট। চারা উদগত

হইলেই তাহাদিগের আবির্ভাব হয়। ইহারা কচি ডগা,—অনেক সময় সমগ্র চারা—উদরস্থ করে। ইহাদিগের আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা না করিয়া বীজ অঙ্কুরিত হইলেই সমগ্র হাপোরে উদ্ভিজ্জ ভস্ম বা ঘুঁটের ছাই এরূপ ভাবে ছড়াইয়া দিতে হয় যে, হাপোরের পৃষ্ঠভাগ এবং চারা গুলি যেন ভস্মমণ্ডিত হয়। জল-সেচন করিলে চারা হইতে ছাই ধুইয়া যাইবে সুতরাং পুনরায় ছাই দিতে হইবে। চারাদিগকে এইরূপে ছাই দ্বারা মণ্ডিত রাখিতে পারিলে উক্ত কীটগণ আর কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। এবিষয়ে কোন মতে অবহেলা হইলে সমুদায় চারা,—সমুদায় শ্রম, তদপেক্ষা অধিক, সমুদায় আশা পণ্ড হইবে।

বীজ বপন করিয়া নিশ্চিন্ত না থাকিয়া চারা বিরোপণ বা স্থানান্তরিত করিবার জন্য প্রথম হাপোর অপেক্ষা ৬৷৭ গুণ বৃহত্তর আয়তনের আর একটী হাপোর প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। দ্বিতীয় হাপোরের মাটিও উত্তমরূপে তৈয়ার করিতে হইবে। প্রথম হাপোরে চারাগুলি ৪৷৫ অঙ্গুলি বড় হইয়া উঠিলে অপরাহ্নে তাহাদিগকে যত্ন সহকারে সমধিক মাটি সহ উৎপাটন করিয়া দ্বিতীয় হাপোরে আধ হাত হইতে পৌণে এক-হাত অন্তর রোপণ করিয়া উত্তমরূপে জলসেচন করিতে হইবে। এ সময়ে রৌদ্রের প্রকোপ অধিক থাকিলে রোপিত চারাদিগকে ২৷৪ দিনের জন্য দিবাভাগে প্রাতে ৮৷৯ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ ৫৷৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়, কারণ তাহা হইলে চারাগুলি আর ঝিমাইতে পারিবে না। গাছ ঝিমাইলে ফলনের দিন কিছু পিছাইয়া যায়। প্রথম হাপোর হইতে চারা উৎপাটন করিবার পূর্ব্বে কিম্বা পরে

অথবা হাপোরান্তরে রোপণকালে চারাগুলির নিম্নাংশস্থ পত্রের বৃন্তসহ পাতা কাটিয়া বাদ দিবে কিন্তু ডগা বা শেষাগ্রভাগের কোন অংশ কাটিবে না। আর এক কথা। সমগ্র পত্র অর্থাৎ বৃন্তসহ পাতা ছেদিত হইলে কাণ্ডে ক্ষত হয় এবং সেখানে পচ্ ধরিতে পারে কিন্তু বৃন্ত রাখিয়া পাতা কাটিয়া দিলে সে আশঙ্কা থাকে না, বৃন্ত আপনা হইতে ক্রমে খসিয়া পড়ে। এসময়ে রৌদ্রের প্রকোপ অধিক থাকিলে হাপোরের ১ বা ১॥ হাত উপর মাচান নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে খর্জ্জুর, তাল, নারিকেল, সুপারি, বা কদলি পত্র প্রসারিত করিয়া দিলে ভাল হয়। বলা বাহুল্য, চারা গুলি পুনরায় সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আবরণ অপসারিত করিতে হইবে।

চারাগুলি তিন হাত উচ্চ হইয়া উঠিলে কাণ্ডের নিম্নভাগের দুই হাত অর্থাৎ পরিপক্কাংশ রাখিয়া উপরিভাগের হরিদংশ কাটিয়া ফেলিতে হয়। অতঃপর হাপোর হইতে তুলিয়া বাগানের যথা-স্থানে রোপণ করিতে হইবে।

পেঁপে গাছ বড় বৃদ্ধিশীল উদ্ভিদ সুতরাং বীজ বপনের পর হইতে চারাদিগকে স্থায়ীভাবে রোপণকাল মধ্যে যে সকল প্রক্রিয়া আছে তাহার সামাধানে কালক্ষেপ করা উচিত নহে। বিলম্ব করিলে গাছ বড় হইয়া যায় এবং সে অবস্থায় স্থানান্তর করণাদি কার্য্য দ্বারা গাছের বৃদ্ধি ব্যাঘাত পায়। এই জন্য আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগেই গাছগুলিকে জমিতে স্থায়ীভাবে রোপণ করিতে হইবে।

সাধারণতঃ পেঁপে গাছের জন্য দীর্ঘে ও প্রস্থে ৬।৭ হাত জমি থাকিলেই চলিবে কিন্তু মাটির উর্ব্বরতা ও স্থানীয় আবহাওয়া

অনুসারে বৃক্ষ পরস্পর মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান অল্পাধিক বাড়াইয়া বা কমাইয়া লইতে হইবে এবং তাহা উদ্যানস্বামীর বিবেচনা-সাপেক্ষ।

হাপোর হইতে জমিতে রোপণ করিবার পূর্ব্বে যদি বৃষ্টি হইয়া থাকে ত ভালই, নতুবা হাপোর হইতে চারা উত্তোলন করিবার সময় গাছগুলিকে উত্তমরূপে স্নান করাইয়া প্রত্যেক গাছের তিনভাগ পত্রের বৃন্ত রাখিয়া পাতাগুলি পূর্ব্ববৎ কাটিয়া দিতে হয়। ইহার ফলে নবস্থানান্তরিত চারা হইতে অধিক বাষ্পোদ্গার (Evaporation) হইতে পারে না, ফলতঃ গাছ জখম হয় না, উপরন্তু শীঘ্রই সামলাইয়া উঠিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

অপর প্রক্রিয়ানুসারে স্থায়ীভাবে রোপণ করিবার ২।৩ দিন পূর্ব্বে গাছের কাণ্ড সমূহের নিম্নভাগের ১॥ বা ২ হাত রাখিয়া উপরিভাগ কাটিয়া ফেলিয়া দিলে স্থানান্তরিত হইবার পূর্ব্বেই রস নির্গমন বন্ধ হইয়া যায় এবং কর্ত্তিত স্থানও ঈষৎ শুকাইয়া আসে। অতঃপর যথানিয়মে যথাস্থানে রোপণ করিয়া পালন করিতে হইবে।

রোপণ করিবার পূর্ব্বে মাদা প্রস্তুত করিয়া রাখা উচিত। প্রত্যেক মাদা এক হাত ব্যাসের এবং এক হাত গভীর খনন করতঃ তন্মধ্যস্থিত তাবৎ মাটি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া এবং ইট প্যাটকেল প্রভৃতি বাছিয়া ফেলিয়া তাহার সহিত আবর্জ্জনাদি উত্তমরূপে মিশাইয়া গর্ত্ত পূর্ণ করিতে হইবে। এইরূপে গর্ত্ত পূর্ণ হইলে তাহার উপর দাঁড়াইয়া পদদ্বয় দ্বারা মাটি চাপিয়া দেওয়া উচিত। অনন্তর ঠিক মধ্যস্থলে গাছ রোপণ করিয়া মাদায় উত্তমরূপে জলসেচন করিতে হয়।

ফলফুল ধারণে পেঁপে গাছ বড় অনির্দ্দিষ্ট। উৎকৃষ্ট ফলের সুপক্ক বীজ বপনজনিত গাছ সমূহের মধ্যে ফলধারণে অক্ষম, এরূপ গাছ অনেক জন্মে। ইহাদিগের মধ্যে পুং-পৌষ্পিক, স্ত্রী পৌষ্পিক ও উভ-পৌষ্পিক গাছ আছে কিন্তু গাছ দেখিয়া তাহার পার্থক্য নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। গাছ পুষ্পিত হইলেই বুঝা যায় কোন বৃক্ষ পুংপুষ্প, কোন বৃক্ষ স্ত্রীপুষ্প এবং কোন বৃক্ষ উভয়বিধ পুষ্প ধারণ করে।

যে সকল গাছ হইতে পুষ্পসহ দীর্ঘ কাঁদী উৎপন্ন হয়, সে গুলি পুংজাতীয় বৃক্ষ। সেই কাঁদীতে বহুপুষ্প জন্মে। পুষ্পমুকুলের আকার প্রায় স্বর্ণ যুঁই বা স্বর্ণ চামেলীর ন্যায়, এবং বর্ণও তদনুরূপ হরিদ্রাভ। উক্ত পুষ্পের দল বা পাপড়ী বেষ্টিত হইয়া পরাগকেশর (Stamens) অবস্থিত। অন্য প্রকার বৃক্ষে স্ত্রীপুষ্প ও পুংপুষ্প স্বতন্ত্র জন্মে। তৃতীয় প্রকার বৃক্ষে একই ফুলে স্ত্রী-পুষ্পোচিত গর্ভাশয় এবং পুংপুষ্পোচিত পরাগকেশর থাকিতে দেখা যায়। শেষোক্ত ফুল, পূর্ণ-ফুল (perfect flower) নামে অভিহিত। উদ্ভিদ শাস্ত্রানুসারে ঈদৃশ ফুল hermaphrodite নামে পরিচিত।

পুষ্পের ঈদৃশ তারতম্যানুসারে পেঁপে গাছ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত যথা,—পুংপৌষ্পিক (Monœcious) এবং দ্বৈ-পৌষ্পিক (Diœcious)। এই দুই বিভাগ ব্যতীত আরও রকম রকম গাছ দেখা যায়, তাহারা মিশ্রিত অর্থাৎ কোন গাছে বা কোন স্তবকে পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প এবং পূর্ণ-পুষ্প স্বতন্ত্র থাকে। ইহারা মধ্যবর্ত্তী জাতি মধ্যে পরিগণিত।

পুংজাতীয় গাছে সাধারণতঃ পুংপুষ্প অর্থাৎ পরাগকেশর

সমন্বিত ফুল জন্মে, কদাচ পূর্ণ-পুষ্প বা perfect ফুল আসিতে দেখা যায় কিন্তু সে পুষ্প ফলধারণ করে।

যাহা হউক, আমরা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা লইয়া অধিক আলোচনা করিব না, কারণ তাহাতে পুঁথি বাড়িয়া যায়, তাহা ব্যতীত বৈজ্ঞানিক কথা এ পুস্তকের আলোচ্য নহে। ব্যবহারিক হিসাবে আমরা ফলশালী বৃক্ষ চাহি। স্থায়ীভাবে রোপিত হইবার পর যথা সময়ে বৃক্ষ সকল পুষ্পিত হইলে পূর্ণ-পুষ্পপ্রসূ বৃক্ষদিগকে সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করিতে হইবে। তাহা ব্যতীত স্ত্রীজাতীয় বৃক্ষ দিগকেও রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু ইহাদিগের পুষ্প সকলকে সেবিত বা গর্ভবতী করিবার জন্য সন্নিকটে মধ্যে মধ্যে ২।১টী পুংবৃক্ষ রাখিতেই হইবে নতুবা স্ত্রীবৃক্ষ সমূহের ফুল গর্ভসঞ্চারাভাবে ফলের আকার ধারণ করিয়া অল্পদিন মধ্যে বৃক্ষচ্যুত হইয়া পড়িবে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, পেপিয়ার সারিমধ্যস্থিত স্ত্রীবৃক্ষদিগকে রাখিয়া পুংবৃক্ষদিগের বিনাশ সাধন করায় স্ত্রীবৃক্ষ সকল হইতে ফুল ও ফল খসিয়া পড়ে। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সচরাচর যাহা ফলরূপে পরিগণিত তাহা গর্ভাশয় মাত্র, বীজের আধার। পরাগরেণু সাহায্যে উক্ত গর্ভাশয়ের অন্তঃবর্ত্তী বীজকোষ সেবিত না হইলে ফল অর্থাৎ বীজের আধার বৃক্ষচ্যুত হইয়া থাকে। কেবল যে পেঁপে গাছ সম্বন্ধে প্রকৃতির এইরূপ বিধান, তাহা নহে। তবে, পেঁপে গাছের ফুল সম্বন্ধে নিশ্চয়তা নাই বলিয়া এইরূপ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হয়। উত্তলিদক বৃক্ষের কাণ্ড ও পত্রবৃন্তের সঙ্গমস্থলে যে সকল গ্রন্থি বা node থাকে, তাহাতে ৩।৪ অঙ্গুলি দীর্ঘ পুষ্পস্তবক বা থলো উদ্গত হয়। উক্ত থলো মধ্যে স্ত্রী ও পুংপুষ্প

থাকে। সেই সকল পুংপুষ্প, স্ত্রীপুষ্পদিগের গর্ভসঞ্চার করে। সন্নিকটে পুংজাতীয় গাছ না থাকিলে অথবা একই গাছে দুই জাতীয় পুষ্প না জন্মিলে স্ত্রী জাতীয় গাছের ফল অধিক দিন গাছে থাকে না, অপরিপুষ্টাবস্থায় ঝরিয়া পড়ে। পুংজাতীয় বৃক্ষের অভাবে স্ত্রী জাতীয় গাছের ফুল গর্ভবতী হইতে পারে না, সুতরাং উহার বীজ ও পুষ্ট হয় না। গাছ যদি একবারেই স্ত্রীপুষ্পধারী হয় তাহা হইলে সেখানে একটি পুংজাতীয় বৃক্ষ রোপণ করিলে, প্রথমোক্ত গাছের ফল স্থায়ী, পরিপুষ্ট ও সুপক্ক হয়।

হাপোরে চারা উৎপাদন, চারা দ্বিরোপণ প্রভৃতি না করিয়াও অন্ত উপায় অবলম্বন করিতে পারা যায়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে জমি কোপাইয়া ও মাটি চূর্ণ করতঃ রচিত মাদায় সুপক্ক ফলের ২।৩টি করিয়া বীজ রোপণ করিবে। আকাশের জল পাইলে মাদায় জল সেচনের প্রয়োজন নাই, নতুবা জল দিতে হইবে। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ৫।৬ অঙ্গুলি বড় হইলে প্রতি মাদায় একটি মাত্র তেজাল চারা রাখিয়া অপরগুলিকে উঠাইয়া শূন্ত মাদায় পুতিয়া দিলে চলে। আবশ্যক না থাকিলে ফেলিয়া দিতে হইবে।

স্থানান্তরিত উদ্ভিদগণ স্বভাবতঃ তেজাল হয়। যে সময়ে মাদায় বীজ রোপণ করিতে হয় সেই সময়েই বীজ 'পাত' দিতে হয়। 'পাত' দেওয়া চারাগুলি আট অঙ্গুলি পরিমাণ বড় হইলে বর্ষার দিনে ক্ষেত্রে পুতিয়া দিতে হয়। আট হাত অন্তর গাছ রোপণ করিতে হয়। মাদায় পুষ্করিণীর পাঁক কিম্বা পোড়া মাটি অথবা গো-শালার আবর্জ্জনা ও হাড়ের গুঁড়া কিম্বা চূণার

(Super) দিলে গাছের বিশেষ উপকার হয়।

পেঁপে গাছের চোক, অর্দ্ধ পক্ব শাখা এবং ফেঁকড়িতেও চারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। চোক বা ফেঁকড়িতে চারা করিতে হইলে গাছের পুরাতন কাণ্ড বা শাখা হইতে তাহা কাটিয়া আনিয়া ছায়াবিশিষ্ট স্থানে শ্বেত বালুকা পূর্ণ হাপোরে পুতিয়া দিতে হয় এবং যাবৎ না অঙ্কুরিত হয় তাবৎ উপরে ঢাকা দিয়া রাখিতে হয়। অনন্তর চোকের চারা উদ্ভূত হইলে কিম্বা শাখার শিকড় নির্গত হইলে যথানিয়মে ক্ষেত্রে পুতিয়া দিতে হয়। কোন স্থান হইতে উৎকৃষ্ট পেঁপের চোক সংগ্রহ করিতে পারিলে উক্ত চোক যে কোন পেঁপের গাছে বসাইলে তাহাতে সংলগ্ন হইয়া যায়। অতঃপর জোড় বা চোক কলমের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত শাখা বা চোকের উপরিভাগস্থিত মূল-বৃক্ষের কাণ্ড কাটিয়া দিতে হয়।

ক্ষেত্রে চারা পুতিবার ৭।৮ মাস মধ্যেই গাছে ফুল ধরে। তখন প্রতি বিঘায় ২।৪টী মাত্র পুংজাতীয় গাছ রাখিয়া অবশিষ্ট পুংজাতীয় গাছ কাটিয়া ফেলা উচিত। স্ত্রীজাতীয় গাছের পুষ্প সমূহের গর্ভসঞ্চারের জন্য পুংজাতীয় গাছের প্রয়োজন। এইজন্য দুই তিনটী পুংজাতীয় গাছ রাখিবার কথা বলা গেল। পুংজাতীয় অধিক গাছ থাকিলে কেবল মাত্র স্থানাধিকার ভিন্ন অন্য কোন লাভ নাই।

বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় না জল দাঁড়ায়, এজন্য গোড়ায় মাটি উচ্চ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। বর্ষা অতিবাহিত হইলে ক্ষেত্রে যথাবিধ ছেঁচ না দিলে গাছের পাতা ঝরিয়া যায় এবং ফলও বড় সুশ্রী হয় না। বাঙ্গালা দেশের মাটি ও বাতাস রসা

এজন্ত তথায় জল সেচনের প্রয়োজন হয় না। বর্ষার পূর্ব্বে গাছে ফুল ধরিবার পূর্ব্বে পুরাতন গোবর-সার দেওয়া আবশ্যক। সার প্রদান,—বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে করিলেই চলিতে পারে। গাছগুলি তিন চারি হাত উচ্চ হইলে যদি উহাদিগের মস্তক ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে উহারা শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট হইয়া অনেক ফল প্রদান করে। কিন্তু তিনটীর অধিক শাখা রাখা উচিত নহে।

পেঁপে গাছের কাণ্ডে ফল ধরে এবং এক একটি গাছে একত্রে ১০০।১৫০টি ফল ধরিয়া থাকে। কিন্তু কতকগুলি সুপুষ্ট বড় ফল রাখিয়া অবশিষ্ট গুলিকে ভাঙ্গিয়া দিলে প্রথমোক্ত ফলগুলি বড় হয়।

উল্লিখিত ব্যবস্থা করিবার পর একখানি চটের থলে দ্বারা ফলগুলিকে ঢাকিয়া রাখিলে ফলের আকার আরও বৃহৎ হয় এবং আস্বাদ মধুর ও কোমল হয়।

পেঁপের আবাদ অতিশয় লাভের জিনিস। বাজারে আনিলে উহা বিশেষ দরে বিক্রয় হয়। সময়ে সময়ে ভাল পেঁপে দুই আনা হইতে আট আনায় বিক্রয় হইয়া থাকে।

কদলী

MUSA

Banana or Plantain

পৃথিবীতে যত প্রকার ফল আছে, তন্মধ্যে কদলীর ন্যায় উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় ফল আর নাই। বাঙ্গালা দেশে ইহা সহজে এবং প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। কাঁচা-কলা, চাম্পা, চাটিম, মর্ত্তমান, অনুপম, চিনি-চাম্পা, বিটষবা, মোহনবাঁশি, কানাই-বাঁশি, রামকেলী, অগ্নিশ্বর প্রভৃতি নানাজাতীয় কদলী এদেশে জন্মিয়া থাকে। এই সকল কদলীর মধ্যে কেবল কাঁচ-কলা কাঁচা অবস্থায় ব্যঞ্জনাতে ব্যবহৃত হয় এবং অপরগুলি পাকা অবস্থায় ভক্ষণীয়।

কলাগাছে অতি অল্প দিন মধ্যেই ফল হয় এবং ইহার আবাদ বিশেষ লাভজনক। দুই তিন বিঘা জমিতে কদলীর আবাদ করিলে একটি ছোট গৃহস্থের সম্পোষ্য হইয়া থাকে। এস্থলে আমরা একটি প্রাচীন প্রবাদ উদ্ধৃত করিলাম :—

তিনশ-ষাট ঝাড় কলা গাছ রুয়ে,
থাক্‌গে চাষা ঘরে শুয়ে।
তুল গেঁড়ো, না কেটো পাত,
তাতেই মান যশ, তাতেই ভাত।" *

ইহার অর্থ আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। এই

---

* দ্বারবঙ্গেশ্বরের রাজনগরস্থিত প্রাসাদান্তর্গত সুবিস্তৃত উদ্যানের একাংশে ন্যূনাধিক দশ সহস্র কলা গাছের ঝাড় আছে।

চারিটি পংক্তির মধ্যে কদলী চাষের প্রণালী ও লাভের কথা স্পষ্টাক্ষরেই বলা হইয়াছে।

কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী বৈদ্যবাটির চারিদিকে কদলীর যথেষ্ট আবাদ হয়। একটি একটি বাগানের একদিক হইতে অপর দিক পর্য্যন্ত নজর চলে না এবং এই সকল বাগানের কদলী বৈদ্যবাটির হাটে প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে আনীত হয় এবং ব্যাপারিগণ তাহা খরিদ করিয়া স্থানান্তরে চালান দেয়। প্রতি হাটে অর্থাৎ প্রতি হাটবারে ১,৫০,০০৲ হইতে ২,০০,০০৲ টাকার কদলী কেবল এক বৈদ্যবাটীর হাটে বিক্রয় হয়। এতদ্ব্যতীত নানা স্থানে যে কত হয় তাহার ঠিক নাই।

কলা গাছের কোন অংশ নষ্ট হয় না। ইহার ফল ও পাতা, মোচা ও থোড়—সবই ব্যবহার হয়। এ ছাড়া শুষ্ক পাতা ও বাস্না কাগজ তৈয়ারির জন্য বিক্রয় হয়। এত লাভের জিনিষ সত্বেও সাধারণতঃ লোকে ইহাকে তাদৃশ যত্ন সহকারে পালন করে না, ইহাই দুঃখের বিষয়।

নিম্নভূমি অর্থাৎ যেখানে বর্ষাকালে জল দাঁড়ায়, এরূপ জমি ছাড়া সকল প্রকার জমিতেই কলা গাছ জন্মিয়া থাকে। অকর্ম্মণ্য জমিকে আবাদোপযোগী করিবার জন্য লোকে তথায় প্রথমে কলা গাছ রোপণ করে। নীরস জমিতে কলাগাছ রোপণ করিলে মাটি রসা হয়। নূতন ফলের বাগান করিতে হইলে প্রথমে জমিতে কলাগাছ পুতিলে দুইটী লাভ হয়,—প্রথমতঃ ফলের গাছ বড় হইয়া উঠিতে উঠিতে কলার কয়েকটী ফসল

* কৃষিতত্ত্ব ও ভারতবন্ধু প্রথমভাগ, তৃতীয় সংখ্যা।

পাওয়া যায় ; দ্বিতীয়তঃ—কলা গাছের এঁটে প্রভৃতি পচিয়া গিয়া জমিকে সারবান্ করে। কিন্তু ফলের চারা হইতে কদলী ঝাড় দূরে থাকা উচিত, তাহা বারবার বলিয়াছি। নিঃস্ব মাটিতে কদলীর আবাদ করিলে সুফল পাওয়া যায় না। নূতন ও নাতিগভীর মৃত্তিকায় কদলী বৃক্ষ যেরূপ বৃদ্ধিশীল হয়, তেমনি তাহার কাঁদী দীর্ঘ হয়, তাহাতে বহুসংখ্যক হাতা জন্মে এবং ফল বৃহৎ হইয়া থাকে।

বর্ষাকালে গাছ পুঁতিলে গাছ খুব বাড়িয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহা ফুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। গাছ ফুলিয়া গেলে তাহাতে ফল হয় না কিম্বা হইলেও তাহা নিকৃষ্ট হয়। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে রোপণ করা অপেক্ষাকৃত ভাল, কিন্তু বিশেষ তাড়াতাড়ি না থাকিলে, ফাল্গুন-চৈত্র মাসে কলার তেউড় রোপণ করাই যুক্তিসঙ্গত। ফাল্গুন মাসে রোপণ করিলে দুই তিন মাসের প্রখর রৌদ্রে গাছ আপাততঃ বাড়ে না, বরং উহার উপরিভাগ শুষ্ক ও মৃত প্রায় হইয়া যায় কিন্তু এঁটে জীবিত ও তাজা থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসে দুই এক পসলা বৃষ্টি পাইবামাত্র সেই সকল এঁটে হইতে নূতন কেঁকড়ী বা পোয়ালি মুখরিত হয় এবং সম্মুখে বর্ষা পাইয়া অমিত তেজে বাড়িতে থাকে। এইরূপে চারা বাহির হইলে মূল-কাণ্ড, গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিয়া দিতে হইবে।

প্রতি ঝাড়ে তিনটীর অধিক গাছ রাখা ব্যবস্থা নহে। এক ঝাড়ে অধিক গাছ থাকিলে কোনটী তেজাল বা হৃপুষ্ট থাকে না, পরন্তু সকলগুলিই ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া যায়। প্রতি ঝাড়ে তিনটী মাত্র গাছ রাখিয়া অবশিষ্ট যে কয়টী গাছ জন্মিবে,

তৎসমুদয় তুলিয়া লইয়া স্থানান্তরে রোপণ করিতে হয়। ইহাতে ঝাড়গুলি ভাল থাকে। তাহা ব্যতীত, ঝাড় হইতে এক বৎসর মধ্যে অনেকগুলি চারা পাওয়া যায়। কলা-বাগানের আয়তন বৃদ্ধি করিবার পক্ষে উক্ত প্রথা বিশেষ লাভজনক।

ঝাড়ের বড় গাছটী ফল প্রদান করিবার পর তাহাকে নির্ম্মূলিত করিলে মাঝারি গাছটী এক্ষণে বড়, এবং ছোট গাছকে মাঝারি করিয়া, নূতন একটী তেউড়কে ছোট করিতে হইবে। এইরূপে একটী গাছ উঠিয়া গেলে অপর একটী নূতন তেউড় থাকিতে দিতে হইবে। কিন্তু যতদিন তিনটী গাছ একঝাড়ে মজুত থাকিবে ততদিন চতুর্থ গাছ থাকিতে দেওয়া কোনমতে উচিত নহে। গাছের চারা তুলিয়া লওয়া যেমন একটী বিশেষ কার্য্য, শুষ্ক পাতাগুলি কাটিয়া এবং মৃত গাছের এঁটে বা গোড়া তুলিয়া ফেলাও তদনুরূপ আবশ্যক।

কদলী বৃক্ষ একস্থানে তিন বৎসরের অধিককাল রাখা উচিত নহে, সুতরাং তৃতীয় বৎসর নূতন স্থানে কদলী রোপণ করা কর্ত্তব্য। দীর্ঘকাল এক স্থানে থাকিতে পাইলে ঝাড় ক্রমশঃ সরিয়া যায়, এঁটে সকল উচ্চ হয়। এই সকল কারণে তিন বৎসরের অধিক-কাল কদলীকে এক স্থানে রাখা উচিত নহে।

কার্ত্তিক মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত কদলী-বাগের মাটি কোপাইয়া দিয়া পরে গাছের গোড়ায় মাটি উচ্চ করিয়া দিতে হয়। এইরূপে কলা গাছের গোড়া মধ্যে মধ্যে মেরামত করিয়া দিলে বাগানটী পরিষ্কার থাকে, গাছগুলি তেজাল থাকে এবং দেখিতেও সুশ্রী হয়। এইরূপে গোড়ায় মাটি উচ্চকরণকে গোড়া-বাঁধাই বা Earthing কহে।

সাধারণতঃ এদেশে কদলী ঝাড়ে কোনরূপ সার দিবার প্রথা নাই কিন্তু খইল, অস্থিচূর্ণ ও পটাস বা ক্ষার ইহার বিশেষ সার। গাছের গোড়ায় খৈল দিলে গাছে জোর হয় এবং কাঁদি বড় হয়, অনেক ফল ধারণ করে। মুরসিদাবাদে থাকিতে আমি নানাজাতীয় কলা গাছে কয়েক প্রকার সার দিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম। কোন গাছে পুরাতন রাবিসের গুঁড়া, কোন গাছে খৈল-চূর্ণ, আবার কোন গাছে খৈল ও অস্থিচূর্ণ দিয়া দেখিয়াছি যে, উক্ত কয় প্রকারে সারই কদলীর বিশেষ সার। যে ঝাড়ে অস্থিচূর্ণ ও খৈল দেওয়া হইয়াছিল তাহার গাছগুলি যেমন তেজাল, গাছের পাতাগুলি তেমনি দীর্ঘ ও চওড়া হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, কাঁদী ও ফল তদনুরূপ হইয়াছিল।

রামকেলী ও কানাইবাঁশী—এই দুই জাতীয় কদলী ঝাড়েই পরীক্ষা করিয়াছিলাম। প্রতি ঝাড়ে এক সের রেড়ীর খৈল, অর্দ্ধসের অস্থিচূর্ণ দেওয়া হয় এবং মধ্যে মধ্যে গাছে জল দেওয়া হইত। বর্ষাকালে গাছে জল দিবার আবশ্যক হয় না। মুরসিদাবাদ-স্থিত রৈইসবাগেও নানাজাতীয় কলা গাছ রোপণ করিয়াছিলাম এবং পরীক্ষারও সূত্রপাত করিয়াছিলাম। কিন্তু রৈইসবাগ আমার বাসস্থান হইতে অনেক দূর হওয়ায় সদা সর্ব্বদা তথাকার কার্য্যাদি পরিদর্শনের সুবিধা হইত না এবং লোকজন-দিগকে বলিয়া আসিলে তাহারা আমার ঠিক মনের মত কাজ করিতে পারিত না। এজন্য বিশেষ পরীক্ষা সকল নিজ বাসা,—কুতবপুরের বাটীর সঙ্কীর্ণ স্থানে করিতাম। রামকেলী ও কাঁনাই-বাঁশী গাছ এই জন্য বাসাতে পুতিয়াছিলাম। রামকেলী গাছটী আমার বিশেষ যত্ন ও আদরের জিনিস ছিল।

কলা গাছের পাতা কাটিলে যে কেবল গাছটী শ্রীহীন হয় তাহা নহে, ইহাতে গাছ হীনবল হয়। ফলতঃ উহার ফলও অধিক সুপুষ্ট হয় না। এজন্ত কোনও কারণে কদলী গাছের পাতা কর্ত্তন একবারে নিষিদ্ধ। বর্ষাকালে পাতা কাটিয়া লইলে তত বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু অন্ত সময়ে কোন মতে কাটা উচিন নহে। পাতা ব্যবহার বা বিক্রয় করিবার জন্ত গাছের আবশ্যক হইলে বাঙ্গালা অর্থাৎ ডৌয়ে কলার গাছ রোপণ করা উচিত। ইহার ফল—কি কাঁচা অবস্থায় তরকারীরূপে, কি পক্ক ফল ফলরূপে—কিছুতেই ব্যবহার যোগ্য নহে। ডৌয়ের গাছ ও পাতা বড় হইয়া থাকে, এজন্ত পাতার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কাঁটালী কলাও লোকের বড় প্রিয় নহে সুতরাং পাতার জন্ত উহাও রোপণ করিতে পারা যায়। এই দুই জাতীয় গাছ হইতে পাতা ব্যতীত মোচা ও থোড় পাওয়া যায়। অন্ত জাতীয় গাছের মোচা ও থোড় পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু ফলের জন্ত উহা অনেক দিন গাছে থাকে বলিয়া মোচা ছোট হইয়া যায় এবং থোড় শক্ত ও ছিবড়াযুক্ত হইয়া আহারের অনুপযোগী হইয়া থাকে।

পাতার জন্য যে সকল গাছ রোপণ করা যায় তাহাতে মোচা আসিলেই মোচাটী কাটিবার সঙ্গে গাছটী কাটিয়া লইতে হয়। তখন গাছটী অধিক দিবস দাণ্ডায়মান থাকিলে থোড় খারাপ হয়।

কদলী বৃক্ষের সর্ব্বাংশ পটাসপ্রধান। সেইজন্য কদলীর পত্রাদি বিগলিত করিয়া কিম্বা ক্ষার করিয়া মাটিতে মিশাইয়া দিলে পটাস প্রদান করা হয়। ফলিত কদলী-কাণ্ড ফেলিয়া না দিয়া অন্ত দ্বারা

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড করিয়া জমির উপর প্রসারিত করিলেও তজ্জাত বৃক্ষাদির উপকার হয়। গাছের গোড়ায় দিতে পারিলে আরও ভাল হয়। অনন্তর সেই সকল গাছের এঁটে বা গোড়াটী পর্য্যন্ত তুলিয়া ফেলিয়া দিয়া স্থানটী নূতন মাটি দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। কাঁঠালী কলা অনেক পূজাদিতে আবশ্যক হয় বলিয়া মোচা অবস্থায় গাছ না কাটিয়া তাহাকে ফলিতে দেওয়া হয় এবং সেই ফল পাকিলে গাছ কর্ত্তিত হইয়া থাকে।

তরকারির জন্য কাঁচকলার গাছ রোপণ করা উচিত। ইহার ফলগুলি সুপুষ্ট হইলে গাছ কাটিতে হয়। কাঁচ-কলা মাংস সদৃশ পুষ্টিকর সামগ্রী, এজন্য ব্যঞ্জনাদিতে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

কেবল বাঙ্গালা দেশ ভিন্ন ভারতের কুত্রাপি মোচা বা থোড় তরকারী রূপে ব্যবহৃত হয় না। ইহা বাঙ্গালীর তরকারী, বাঙ্গালী ভিন্ন অপর কোনও জাতি মোচা বা থোড় খায় না। মোচার ঘণ্ট, থোড় ছেঁচকী, থোড় সড়সড়ি—উপাদেয় তরকারি।

যে সকল কদলীর ফল পরিপক্কাবস্থায় ভক্ষণীয়, সে সকল গাছে সুডৌল ছড়াগুলি নির্গত হইলেই মোচা ভাঙ্গিয়া লইতে হয়। যতদিন পর্য্যন্ত মোচা হইতে ভাল ফল বাহির হইতে থাকে, ততদিন মোচাটী কাঁদীতে সংলগ্ন থাকা আবশ্যক। পরে যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল দেখা দিবে, তখনও মোচাটী না ভাঙ্গিলে কাঁদীর সকল ফল পরিপুষ্ট হইতে পায় না। পাকা কাঁদী কাটিয়া লইবার অব্যবহিত পরে গোড়া হইতে গাছটিকে কাটিয়া ফেলিতে হইবে।

বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে গাছে কাঁদী নামিলে গাছে ২।১ বার প্রচুর জল দিলে ফল পুষ্ট ও সুমিষ্ট হইয়া থাকে।

কাঁদী পাকিবার উপযোগী হইলে, কাঠবিড়াল, হনুমান, কাক, বাদুড় ও অন্য পক্ষীতে ফল খাইয়া ফেলে ও নষ্ট করে। কিন্তু এই অবস্থায় কাঁদীটী চটের খোলে দ্বারা ঢাকিয়া বাঁধিয়া রাখিলে আর তাহা নষ্ট হয় না। এতদ্ব্যতীত কাঁদী আবৃত থাকিলে ফল বড়, মধুর ও কোমল হয়,—এক কথায় অতি উপাদেয় হয়।

এক প্রকার পোকা কলা গাছের কাণ্ড ছিদ্র করিয়া দেয় কিন্তু সময় প্রতীকার না করিলে গাছটী ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। গাছ হইতে সহজে যদি কীটের আবাস নষ্ট করিতে পারা যায় তাহা হইলে ভালই, নতুবা ঝাড় হইতে কীটদষ্ট গাছটিকে কাটিয়া স্থানান্তরে ফেলিয়া দেওয়া উচিত। অনেক সময় ফলের উপর ছিট ছিট কাল দাগ হইয়া থাকে। গাছের গোড়া কীটাক্রান্ত হইলে এইরূপ হইয়া থাকে। যে সকল গাছ বা ঝাড় এইরূপে কীটদষ্ট হয় তাহাদিগের গোড়া খুঁড়িয়া কয়েক দিবস বাতাস লাগাইয়া এবং পোকার আবাস নষ্ট করিয়া নূতন মাটি দ্বারা সেই স্থান ঢাকিয়া দেওয়া উচিত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—গাছ রোপণের জন্য তেউড় ব্যবহৃত হয়। তেউড় যদি বড় হয় তাহা হইলে তাহার উপরিভাগ কাটিয়া বাদ দিয়া কেবলমাত্র এঁটে বা গোড়াটি পুতিয়া দিলেই চলে। রোপণের পূর্ব্বে গাছের গোড়া জলে ধৌত করিয়া লইলে ভাল হয়।

যে সকল শিকড় গাছ উঠাইবার কালে ছেঁচিয়া বা পেষিত হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে কাটিয়া দিতে হইবে। অনন্তর সেই গাছের গোড়া বা এঁটেগুলিকে বালি মিশ্রিত জলে [illegible]

মধ্যে একবার ডুবাইয়া যথানিয়মে পুতিয়া দিলে গাছ শীঘ্র বাড়িয়া উঠে।

বাগানে রাখিবার উপযোগী কয়েক জাতীয় কদলীর বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

চাঁম্পা বা চাঁপা—ইহার ফল ৫।৬ ইঞ্চ লম্বা হয় এবং অতি সুমিষ্ট ও সুগন্ধবিশিষ্ট। পাতার মধ্যকার শিরা লালাভ।

চিনি-চাম্পা—ইহা চাম্পারই জাতি বিশেষ। চাম্পা অপেক্ষা ঈষৎ ক্ষুদ্রাকার কিন্তু অধিকতর সুমিষ্ট ও সুবাসিত। এক কাঁদীতে প্রায় দেড়শত হইতে দুইশত ফল ধরে।

মর্ত্তমান—চাম্পার ন্যায় গন্ধ, কিন্তু তদপেক্ষা বড় ফল হয়। আস্বাদ মধুর; অতি সুকোমল। পাতার শিরায় কোন বিশেষত্ব নাই।

ঢাকাই-মর্ত্তমান—ইহা মর্ত্তমান অপেক্ষা সুগন্ধবিশিষ্ট, রসাল এবং সকলের প্রিয়। ইহার পাতার গোড়ার দিকের বর্ণ প্রায় লাল এবং পাতার নিম্নভাগ ঈষৎ শ্বেত গুঁড়াযুক্ত বলিয়া অনুমিত হয়।

কাঁঠালী—ইহার গাছ সর্ব্বাপেক্ষা বড় হয়। ফল মর্ত্তমানের ন্যায় দেখিতে কিন্তু খাইবার উপযোগী নহে। মোচা ও থোড় রাঁধিয়া খাওয়া চলে।

কাঁচকলা—গাছ বড় বড় হয়। ফলগুলি পল্ বা কোণ বিশিষ্ট এবং প্রায় ৯ ইঞ্চ লম্বা হয়। কাঁচা ফল তরকারীতে এবং অনেক পূজাদিতে ব্যবহৃত হয়।

কাবুলী—গাছ খর্ব্বাকৃতি এবং দেখিবামাত্র চিনিতে পারা

যায়। ছোট গাছে বড় কাঁদী—দেখিতে বড় মনোহর। মুরসিদাবাদে অবস্থানকালে আমার অনৈক বন্ধু ৺রামগোপাল রায়ের বাটীতে কাবুলী গাছে একটী কাঁদী প্রায় তিন হাত লম্বা হইয়াছিল এবং তাহাতে যে ফল হইয়াছিল তাহা প্রায় সাত ইঞ্চ দীর্ঘ, তদনুরূপ মোটা এবং আস্বাদ ও তেমনি মিষ্ট ও রসাল হইয়াছিল। রামগোপাল বাবু অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কয়েকটী ফল খাইতে দিয়াছিলেন। খাইয়া বাস্তবিক বড় আরাম বোধ হইয়াছিল।

রামকেলী—বৈদ্যবাগে ইহার অনেক গাছ রোপণ করিয়াছিলাম এবং সেখান হইতে নিজ বাসা কুতবপুরের 'খানসামানী'তে পুতিয়াছিলাম। বৈদ্যবাগ অপেক্ষা 'খানসামানী'তে যে গাছটি হইয়াছিল, তাহার ফল অপেক্ষাকৃত বড় ও সুমিষ্ট হইয়াছিল। কাঁচা অবস্থায় ইহার ফলের বর্ণ মেটে সিন্দুরের ন্যায় এবং পাকিলে হরিদ্রা ও সিন্দুর মিশ্রিত রামধনুবৎ এক অপূর্ব্ব বর্ণ ধারণ করে। ফলের সুগন্ধে স্থান আমোদিত হয়। ইহার কাণ্ড এবং পাতার মধ্যস্থিত শিরা লাল বর্ণের হইয়া থাকে।

কাঁনাইবাঁশী—বৃহজ্জাতীয় কদলী। এক-একটী ফল প্রায় ৯ ইঞ্চ লম্বা হয়। পাকিলেও সবুজ থাকে। সুপক্ক হইলে খাইতে অতি সুমিষ্ট ও মাখনের ন্যায় কোমল। সর্ব্বাপেক্ষা আমাকে এই কদলী ভাল লাগিয়াছিল। ইহার গাত্র সুগোল না হইয়া পল-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। একটী কাঁদিতে ৭০।৮০ টী ভাল ফল জন্মিয়া থাকে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাশিপুর হর্টিকলচারাল ইনষ্টিটিউশনের জনৈক ছাত্র বৃক্ষাদি সংগ্রহের নিমিত্ত শিবপুর, শিবাং

প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিতে গিয়া অন্যান্য গাছের মধ্যে কয়েকটী স্থানীয় উৎকৃষ্ট জাতীয় কলাগাছ আনিয়াছিলেন। সে সকল কদলী-বৃক্ষ উক্ত বিদ্যালয়ের বাগানে রোপিত হইয়াছিল এবং কয়েকটী গাছে ফলও হইয়াছিল। যে গাছটী ফলিয়াছিল তাহার নাম,—

তাণ্ডো—যবদ্বীপ (Java) ইহার উৎপত্তিস্থান। তাণ্ডোর ফল গুলি ১২।১৩ ইঞ্চ লম্বা এবং পাঁচ ইঞ্চ পরিধিবিশিষ্ট হয়। স্থানীয় অধিবাসিগণ কাঁচা অবস্থায় ইহাতে ব্যঞ্জন তৈয়ার করে। ফল পরিপক্ক হইলে কাঁঠালী কদলীর ন্যায় আস্বাদ হয়। গাছের কচি পাতার স্থানে স্থানে রক্তিম দাগ থাকে কিন্তু পাতা যত পুরাতন হইতে থাকে সেই দাগ তত মুছিয়া যায়।

অমৃতসাগর—ঢাকা জেলায় ইহার উৎপত্তি স্থান। ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকায় থাকিবার কালে উক্ত কদলী ভক্ষণ করিয়াছিলাম। ফলগুলি দীর্ঘ কিন্তু তদনুপাতে সেরূপ স্থূল নহে, কিন্তু খোসা পাতলা, শাঁস মোলায়েম ও সুমিষ্ট।

মদীয় একটী বিশেষ বন্ধু অমৃত-সাগর কদলীর দুইটী তেউড় আমাকে দিয়াছিলেন। উক্ত তেউড় দুইটী বাড়ীতে রোপণ করিয়াছি। গত বৎসর উভয় ঝাড়েই কাঁদী হইয়াছিল। প্রত্যেক কদলীর ওজন একপোয়া হইয়াছিল।

মালাবর কদলী—ইহা মালাবর উপকূলের স্বাভাবিক কদলী। দাক্ষিণাত্যে ইহা ব্যানানা নামে অভিহিত। ইহার আকার ঢাকার অমৃতমান সদৃশ কিন্তু তদপেক্ষা বৃহত্তর, অপেক্ষা মোলায়েম, মধুর এবং উপাদেয়। উক্ত কদলীর বিশেষত্ব এই যে, ইহার খোসা, শুষ্ক হইয়া মসিবর্ণ ধারণ না করিলে খাদ্যোপ-

যোগ্য হয় না। বৃক্ষে থাকিবার কালে পূর্ণভাবে পরিপুষ্ট হইলে কাঁদী বৃক্ষ হইতে কাটিয়া আনিয়া গৃহমধ্যে ঝুলাইয়া রাখিলে ২।৩ সপ্তাহ কাল পর হইতে খোসা মসিবর্ণ ধারণ করিতে থাকে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তবে উহা ভক্ষণযোগ্য হয়। এইরূপে ৪।৫ সপ্তাহ কাল উহা থাকিতে পারে। মহীশূর, বাঙ্গালোর প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের অনেক সহরে সৌখীনের বাগানে উক্ত কদলীর ঝাড় দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের অন্য কুত্রাপি ঈদৃশ কদলী দেখা যায় না। সে দেশে ইংরাজি Plantain ও Bannana মধ্যে পার্থক্য আছে। Plantain তাদৃশ দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে। এতদুভয়ের পার্থক্যের ইহাই কারণ।

দেশ বিশেষের জলবায়ুর পার্থক্যহেতু বৃক্ষাদিপালনের ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র। কেবল বাঙ্গালা দেশ ভিন্ন ভারতের অপর সর্ব্বত্রই গাছের গোড়া, পার্শ্ববর্ত্তী সমতল ভূমি হইতে অল্পাধিক গভীর। এ প্রথা প্রাচীন হইলেও অনুমোদনযোগ্য নহে কারণ, এতদ্দ্বারা গাছের গোড়ায় জল দাঁড়ায়, গোড়ায় মাটি দৃঢ় ও ঠাস (compressed) হইয়া যায়, তন্নিবন্ধন তথাকার ভূগর্ভের সহিত বায়ুমণ্ডলের এবং সূর্য্যের কিরণের সম্বন্ধ রহিত হয়। বেনারস প্রভৃতি পশ্চিমোত্তর প্রদেশের অনেক স্থানে নালা খনন করিয়া তন্মধ্যে কদলী রোপিত হয় এবং সময়ে সময়ে সেই নালা জল পূর্ণ করিয়া দেওয়া। ঈদৃশ অবস্থায় কোন গাছ বাড়িতে পারে না। সকল গাছের নাভীস্থল (apex) ভূমির সমতল হওয়া উচিত এবং পাদদেশের ভূগর্ভ সরস, শীতল ও ক্রিয়াশীল রাখিবার জন্য গোড়ার মাটি অল্পাধিক উচ্চ করিয়া দিতে হয়।

এদেশে সর্ব্বসাধারণের একটা ধারণা হইয়া গিয়াছে যে, বাগানের মধ্যে কদলী রোপিত হইলে তথাকার মাটি সরস থাকে, জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়। কদলী অতিশয় বৃদ্ধিশীল উদ্ভিদ। অল্পদিন, অধিক কি, এক বৎসর মধ্যে একটী কদলী চারা কিরূপ বৃহদায়তন হয়, কত বড় ঝাড়ে পরিণত হয় এবং সমগ্র বৃক্ষে বা ঝাড়ে—ভূগর্ভস্থ মূল হইতে পত্রদলের শেষ সীমা পর্য্যন্ত এই আয়তন মধ্যে—ভূগর্ভের কত রাশি রাশি পদার্থ আবদ্ধ থাকে। প্রত্যেক গাছে কত মণ জল থাকে, এ সকল বিষয় ভাবিয়া দেখিলে কদলীকে কেহ বাগানে স্থান দিতে রাজি হইবেন না। এইজন্য কদলীকুঞ্জে অপর কোন গাছ রোপণ করা উচিত নহে, অপরাপর বৃক্ষকুঞ্জেও কদলীকে স্থান দিতে নাই। বিচার না করিয়া আমরা পূর্ব্বপ্রথার অনুসরণ করি বলিয়া অনেক বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারি না। কদলীর ন্যায় যে গাছ এত অল্পদিন মধ্যে এরূপ বিরাট দেহ গঠন করিতে পারে সে যে কত বুভুক্ষু, কত পিপাসু, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

অনেকে নূতন বাগান পত্তন করিবার সময় সর্ব্বাগ্রে কদলী রোপণ করেন। বাগানের অপরাপর গাছপালা রোপিত হইবার পর দুই চারি বৎসর তাহারা ফল প্রদান করিতে পারে না, অধিক কি, বৃক্ষ পরস্পর ব্যবহিত স্থানও অধিকার করিতে সমর্থ হয় না। উদ্যানস্বামীগণ সেই ব্যবধানকে অর্থকরী করিবার উদ্দেশ্যে কদলী রোপণ করেন, কিন্তু এতদ্দ্বারা জমির উর্ব্বরতা, বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাস পায়। নূতন মাটিতে কদলীর ঝাড় বেশ জাঁকাল হয়, কাঁদী দীর্ঘ হয়, কাঁদীতে অপেক্ষাকৃত অধিক হাত্তা বা ছড়া জন্মে এবং হাত্তায় অধিক ফল হয়, ফল বড় ও পরিপুষ্ট হয়, কিন্তু তাহা

২।১ বৎসর মাত্র হইয়া থাকে। প্রায় তৃতীয় বৎসর হইতে সেই সকল ঝাড়ের আর তাদৃশ বৃদ্ধি বা বাহার থাকে না, অথচ দেখা যায় একই ভূমিখণ্ডে সুদীর্ঘকাল কদলী বিরাজ করিতেছে। কদলী,—ধান্যাদির ন্যায় গুচ্ছ-মূল উদ্ভিদ। ইহাদিগের মূল, বৃক্ষের আয়তনানুপাতে ক্ষুদ্র, এবং ভূগর্ভ মধ্যে অধিক দূর প্রবেশ না করিয়া পার্শ্বভাগে প্রসারিত হয়। সুতরাং ইহারা ভূমির উপরি-স্তরের সার-সামগ্রী সাধ্যমত আহরণ করিয়া অল্পদিন মধ্যে মাটি নিঃস্ব করিয়া দেয়। নিম্নস্তরে মূলগণ প্রবেশ করিতে পারে না তাহা সত্য, কিন্তু কদলীবৃক্ষ ভূগর্ভের রসশোষণে অতুলনীয় বলিলে চলে। ইহাদিগের রস-পরিশোষকতার আধিক্য হেতু গোড়ার মাটি সর্ব্বদা ভিজা থাকে, এবং সেই আর্দ্রতা নিবন্ধন মৃত্তিকান্তগত উদ্ভিদ খাদ্য বিগলিত হইয়া রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহা-দিগের আহারের যোগান দেয়, এই নিমিত্ত ইহাদিগের মূল বিন্যাস ভাসা হইলেও ভূগর্ভের সার-সামগ্রী আহরণে অক্ষম নহে।

উল্লিখিত কারণ বশতঃ কদলীকুঞ্জে প্রতি বৎসরই প্রচুর সার প্রদান করিতে হয়। যাহারা সার প্রদানে অক্ষম তাঁহাদের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য এই যে, কদলী বৃক্ষের কোন অংশ কাণ্ড, বাইল, পত্র, এঁটে প্রভৃতির কোন অংশই ক্ষেত্র হইতে বাহিরে যাইতে না দেওয়া। কাঁদী কর্ত্তিত হইবার পর সমূল কাণ্ড ভূমিতে সংযোজিত করিলে জমি তত শীঘ্র ক্ষীণ হইতে পায় না। আমা-দের মধ্যে যাঁহারা কদলী কুঞ্জের যথাযথ পরিচর্য্যা করেন তাহারাও কাঁদী সংগ্রহ করিবার পর ফলিত বৃক্ষের কাণ্ড, পত্র অধিক কি, এঁটে পর্য্যন্ত সীমানার বাহিরে ফেলিয়া দেন। গ্রন্থকারের ব্যবস্থা অনুরূপ। কাঁদী গৃহে লইয়া যাও কিন্তু বৃক্ষের অবশিষ্টাংশ

কাটারি দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড করিয়া ক্ষেত্রময়—প্রসারিত করিয়া দাও, ক্ষেত্রের জিনিস ক্ষেত্রেই থাকিবে, উপরন্তু মাটি উর্ব্বরা হইবে। ফলিত বৃক্ষের কাণ্ডাদি যে কেবল কদলীকুঞ্জেই রাখিতে হইবে তাহা নহে। অপরাপর বৃক্ষকুঞ্জে বা বৃক্ষক্রোড়েও উল্লিখিত রূপে প্রসারিত করিয়াদিলে সে সকল গাছের বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

কদলী-বৃক্ষ ভূমি হইতে সমধিক পরিমাণ পটাস্ (Potash) নামক উদ্ভিদের অন্যতম ও প্রয়োজনীয় খাদ্য আহরণ করে। কদলী বৃক্ষের মধ্যে এত অধিক পটাস বিদ্যমান বলিয়া রজকগণ উহার ক্ষার বস্ত্রাদি ধাবনের জন্য সমূহ পরিমাণে উহা ব্যবহার করে। কদলী ক্ষার পটাস-প্রধান বলিয়া বস্ত্র ধাবনের বিশেষ মসলা। উক্ত উদ্ভিদখাদ্য ভূমি হইতে কোনমতে অন্যত্র যাইতে দেওয়া উচিত নহে। কদলী বৃক্ষগণ ভূমি হইতে এত অধিক পটাস আহরণ করে বলিয়া, সময়ে সময়ে কদলী বৃক্ষের মূলদেশে পটাস্ বা পটাস্ প্রধান সার দিবার ব্যবস্থা আছে।

কদলী-কানন প্রতিষ্ঠাকল্পে নির্দ্দিষ্ট ভূমি খণ্ডকে উত্তমরূপে গভীর কর্ষণ ও মৃত্তিকা চূর্ণণ প্রয়োজন। মৃত্তিকা এটেল কিম্বা শিরাগর্ভ হইলে দাঁড়া-কোদাল দ্বারা তাহার সংস্কার সাধন করিতে হয়। অতঃপর দীর্ঘ ও প্রস্থে ৮।৯ হাত অন্তর সমান্তরাল সারিতে তেউড় রোপণ করিতে হয়। তেউড় সকলের আসন দুইহাত ব্যাসের হওয়া উচিত। দাক্ষিণাত্যে বৃক্ষাদি রোপণের জন্য চতুষ্কোণ আসন করা হয় কিন্তু উত্তর ভারতের সর্ব্বত্রই চক্রাকারের আসন প্রস্তুত হইয়া থাকে। শেষোক্ত আকারের আসন অপেক্ষা-কৃত সহজ ও সুবিধাজনক সকোণ আসন রচনায় এবং তাহা

খনন করিতে অসুবিধা আছে, তাহা ব্যতীত চতুষ্কোণ অপেক্ষা চক্রাকার গর্ত্তে পরিসর অধিক থাকে বলিয়া তন্মধ্যে গাছপালার মূল চারিদিকে সমভাবে প্রসারিত হইতে পারে। মহীশূর, বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানের লোক সকল তাহা বুঝিতে চাহে না।

আনারস

ANNANASSA SATIVA

Pineapple

আনারস অতি উপাদেয় ফল। স্বাদ, সৌরভ, ও রসালতা গুণে যাবতীয় ফলের মধ্যে অদ্বিতীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আনারসের অন্যতম বিশেষ গুণ—রোপণের পর অল্পদিন অর্থাৎ ১৪।১৫ মাস মধ্যেই ফলধারণ করে, এবং দীর্ঘকাল—দুই-চারি মাস বা ততোধিক কাল অবিকৃতাবস্থায় ঘরে থাকিতে পারে। শেষোক্ত সুবিধা বশতঃ নিরাপদে দূরদেশে প্রেরণ করিতে পারা যায়। আম্রাদির ন্যায় শীঘ্র পচনশীল ফলের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া তৎপর বিক্রয় বা খরচ করিবার চেষ্টা করিতে হয় না। বহুল পরিমাণে আবাদ করিলে রাশি রাশি ফল উৎপন্ন হয়, কিন্তু আপাততঃ বিক্রয়ের অসুবিধা হইলে সেই সকল ফল হইতে মোরব্বা, সিরকা, চাটনী প্রভৃতি নানাবিধ পণ্য প্রস্তুত করিতে পারা যায়। তাহা ব্যতীত, সে সকল দ্রব্য দেশের মধ্যে এবং বিদেশেও বিক্রয় হইতে পারে। ভারতের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন এবং

সমগ্র আসাম প্রদেশে অতি সহজে আনারস উৎপন্ন হইয়া থাকে। সচরাচর দেখিতে পাই,—আনারসের আবাদের জন্য কেহ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করে না। ফলকর বাগানের গাছতলা, বাগান-চৌহদ্দীর চারিদিকে সীমানাজ্ঞাপকরূপে এবং আনাচে-কানাচে—এক কথায় যে সকল স্থানের কোনরূপ পার্থিব বা অর্থকরী ব্যবহার নাই ঈদৃশ স্থানেই আনারস স্থান পায়। তাহাদিগের পাট নাই, পরিচর্য্যা নাই, ফলে তাহারা ঘন জঙ্গলে পরিণত হইয়া সর্প সরীসৃপাদিকে আশ্রয় প্রদান করে। একটা কথা আছে যে, আনারস জঙ্গলে সাপ থাকে। উক্ত প্রবাদটী বিশ্লেষিত হইলে অন্যরূপ হয়। আনারস গাছ—সর্পাদি জন্তুদিগকে নিমন্ত্রণ করে না, উহারা জঙ্গলে পরিণত হইলেই সর্পাদি নিরাপদ স্থান বুঝিয়া তথায় আশ্রয় লয়। বে-তদ্বির-জাত আনারস মহলই জঙ্গলের কারণ, এবং জঙ্গলই বিষধরের আশ্রয় স্থান।

আসাম প্রদেশ, নিম্ন বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ব্ব বঙ্গ উত্তর বঙ্গ এবং পশ্চিম বঙ্গের কিয়দংশ, আনারস আবাদের উত্তম স্থান। এ সকল স্থানের বায়ুমণ্ডল অত্যধিক আর্দ্র, এবং ভূমি রসপূর্ণ। এই কারণে তথায় আনারস স্বাভাবিক ভাবে জন্মে এবং ঈষৎ যত্ন পাইলে আশাতীত ফল প্রদান করে। বাঙ্গালা দেশে সোনা ফলে, এইরূপ একটী প্রাচীন প্রবাদ আছে কিন্তু তাহা মিথ্যা নহে। আমরা ফলের বড় প্রয়াসী নহি বলিয়া ফল উৎপাদনে বিশেষ লক্ষ্য রাখি না,—উৎকৃষ্ট-ফল উৎপাদনে চেষ্টা করি না। ইদানীং সকল ফলের মূল্য এত অধিক হইয়াছে যে, ফলের আবাদ একটী লাভের ব্যবসা মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমরা বালক ছিলাম তখন দুই এক পয়সায় একটী আনারস

ক্রয় করিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু এক্ষণে তাহার দুই চারি গুণ অধিক মূল্য না দিলে একটী সাধারণ আনারস পাওয়া দুষ্কর। বাজারে ক্রেতা আছে, পণ্য নাই। শত শত বঙ্গীয় যুবক ইহার আবাদে প্রবৃত্ত হইলেও ভারতে আনারসের অভাব পূর্ণ হয় না। যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করিতে পারিলে—সমগ্রভারত হইতে বাঙ্গালা দেশে লক্ষ লক্ষ টাকা আনায়ন করিয়া তাঁহারা সোনার বাঙ্গালাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিতে পারেন। ইহাই প্রকৃত 'স্বদেশী'।

পুরাতন গাছের গোড়া এবং ফলের বোঁটা ও শিরোদেশের যে সকল তেউড় বা কেঁকড়ি উদ্গত হয় সেই গুলি সংগ্রহ করিয়া আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে কোন স্থানে হাপোর দিয়া শিকড় জন্মিলে যথাস্থানে রোপণ করিতে হয়।

আনারস গাছ অল্পাধিক ছায়া প্রিয় কিন্তু বাতভাপবিবর্জ্জিত অন্ধকারময় স্থান একবারেই পরিহার্য্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আনারস গাছ বাগানের মধ্যস্থিত অব্যবহার্য্য বা পতিত স্থানে রোপিত হয়। ইহা আনারসের যোগ্য স্থান নহে। আওতায় কোন উদ্ভিদের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। আওতাজাত আনারস গাছ জঙ্গলময় হয়, গোড়া হইতে বহুগাছ উদ্গত হয় কিন্তু সে সকল গাছ তাদৃশ তেজাল হয় না, ফলতঃ তজ্জাত ফলের আকার ছোট হয় এবং তাহাতে শাঁসের পরিমাণ কম হয়, আস্বাদ তেমন মধুর হয় না অথচ আমরা সেই সকল অকিঞ্চিৎকর ফলগুলিকে লবণ, চিনি প্রভৃতির সংযোগে কৃত্রিম স্বাদ প্রদান করিয়া উদরস্থ করি। সুচাষজাত আনারস উপাদেয় সামগ্রী। যাহা হউক, ছায়াযুক্ত স্থান না থাকিলে ক্ষেত্রময় নিয়মিত স্থান ব্যবধানে

শিরীষ, রেন্-ট্রী প্রভৃতি দ্রুতশীল বৃক্ষ রোপণ করিতে হয়।

উচ্চতল দেশে এবং শিলাগর্ভ জমিতে কিম্বা নীরস আবহাওয়ায় আনারসের আবাদ তাদৃশ ফলপ্রদ হয় না। ঈদৃশ স্থানের রৌদ্রের প্রখরতা এবং ভূগর্ভের নীরসতা নিবন্ধন আনারস গাছ ভাল থাকে না। সেরূপ দেশে জমিতে ছায়া উৎপাদন না করিয়া আনারস রোপণ অকর্ত্তব্য। দারজালার অন্তর্গত রাজনগরে আনারসের বিস্তৃত আবাদ করিয়াছিলাম। যে ভূমিখণ্ডে আনারস রোপিত হইয়াছিল তাহার পশ্চিমদিকে ঘন একশ্রেণী এবং মধ্যে মধ্যে নিয়মিত ব্যবধানান্তরে জিলাপি বা বন-ইম্লী (Inga dulcis) রোপণ করা ছিল। বন-ইম্লী অতি বৃদ্ধিশীল গাছ এবং বিবেচনাসহকারে ছাঁটিতে পারিলে দুই বৎসর মধ্যে ছায়া প্রদান করে। যাহা হউক, উক্ত স্থানের স্বাভাবিক মাটি বালুকাপ্রধান ও নীরস। গ্রীষ্ম কালে রৌদ্রও প্রচণ্ড ফাল্গুণ চৈত্রে বাতাসও প্রবল। এ সকল সত্ত্বেও উত্তম আনারস হইয়াছিল।

যে স্থানে আনারসের আবাদ করা যায়, সে স্থান অতি অল্পকাল মধ্যেই সারহীন হইয়া পড়ে। এইজন্য আনারস ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর সার প্রদান করা কর্ত্তব্য। তাহা ব্যতীত, ফল সংগৃহীত হইবার পর ফলিতগাছের গোড়ায় তিনটী মাত্র উত্তম ফেঁকৃড়ি রাখিয়া অবশিষ্ট গুলিকে বাহির করিয়া লইতে হইবে। বলা বাহুল্য, ফলিত গাছটিও সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে। কদলী গাছের ন্যায় ইহারাও ঝাড় বাঁধে কিন্তু ঝাড় ঘন হইতে দেওয়া উচিত নহে।

ঝাড় হইতে স্বতন্ত্রীকৃত তেউড়গুলিকে আপাততঃ হাপোর দিয়া রাখিতে পারা যায় এবং তাহাতে বহুসংখ্যক শিকড়

জন্মিলে যথানিয়মে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করা উচিত। আনারস গাছ একবীজদল (Monocotyledenous) উদ্ভিদ বর্গান্তর্গত। ইহারা একদিকে শাখাপ্রশাখাহীন, অন্যদিকে মূলশিকড় (Tap root) বর্জ্জিত। উক্ত বর্গের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে গাছের গোড়া বা নাভীস্থল হইতে তন্তুগুচ্ছ উদ্ভিন্ন হইয়া পার্শ্বদেশে বিস্তৃত হয়। এই জন্য ইহাদিগের মূলগণ ভূপৃষ্ঠের তলাটি (Surface soil) মধ্যে বিচরণ করে, নিম্নস্তর (Sub soil) মধ্যে প্রায় প্রবেশ করে না। বৈশাখ মাস হইতে ভাদ্রমাস মধ্যে আনারসের ফেঁকড়ি রোপণ করিতে পারা যায় কিন্তু শীঘ্র রোপণ করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সকল ফেঁকড়ি পাওয়া যায়, সে গুলি আপাততঃ হাপোরে রাখিয়া শিকড় জন্মাইয়া, পরে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে যথাস্থানে রোপণ করা উচিত।

ক্ষেত্রে দুইহাত অন্তর শ্রেণী মধ্যে ১।০ হাত অন্তর এক-একটী ফেঁকড়ি রোপণ করিতে হইবে। সমগ্র ক্ষেত্রের মাটি নরম, সারসংবলিত হওয়া উচিত। রোপণকাল হইতে ১৪।১৫ মাস পরে গাছে ফল দেখা দেয়। গাছের বক্ষভেদ করিয়া যখন আনারস দেখা দেয় তখন দেখিতে বড় মনোহর হয়। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে জমি কোপাইয়া, দুইচারি দিবস শুকাইলে মাটি চূর্ণ করণান্তর সমতল করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সচরাচর ফাল্গুন মাসে গাছে ফল দেখা দেয় তখন ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিতে হয়। বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দিবে এবং গাছের গোড়ায় যে সকল ফেঁকড়ি (hook) বাহির হয় তাহার দুই একটি রাখিয়া অবশিষ্ট গুলিকে স্বতন্ত্র করিয়া

লইয়া স্থানান্তরে পুতিয়া দিতে হইবে। ঝাড় অধিক ঘন হইলে সকল গাছের তেজ হ্রাস হয়। আমি যে প্রণালীতে ইহার আবাদ করি, তাহা সহজসাধ্য এবং বিশেষ ফলপ্রদ। দড়ি ধরিয়া শ্রেণী নির্দ্দেশ করিয়া চিহ্নিত স্থান সমূহে একহাত ব্যাস পরিমিত জমির এক হাত গভীর খনন করিতে হইবে। পরে, সেই গর্ত্তের মাটি উত্তমরূপ চূর্ণ করতঃ তাহার সহিত পুরাতন গোবর সম পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া তেউড় রোপণ করিতে হইবে। বর্ষাকাল ব্যতীত অপর সময়ে গাছে প্রচুর জল সেচন করা আবশ্যক। আসাম বা নিম্নবঙ্গে জল সেচনের প্রয়োজন হয় না কিন্তু রুক্ষদেশে জলসেচন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

গাছে সার দিতে হইলে ফল ধরিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসেই দেওয়া উচিত। সচরাচর গাছের গোড়া খুঁড়িয়া যে প্রণালীতে গাছে সার দেওয়া হইয়া থাকে, সেই প্রণালীতেই ইহাতেও সার দিতে হইবে। আনারসের পক্ষে গো-শালার আবর্জ্জনা, অস্থিচূর্ণ বা Super-phosphate of lime প্রশস্ত। মাঘ মাসের প্রারম্ভে অর্থাৎ গাছে ফল আসিলে প্রত্যেক গাছের গোড়ায় খৈল ও গোবর মিশ্রিত তরল সার দিতে পারিলে ফল বড় হয়, ফলের শাঁস অধিক হয় এবং কোমল হয়।

ফলের শিরোভাগে যে তেউড় জন্মে, তাহাকে অধিক বাড়িতে দিলে ফল বড় হইতে পায় না, উপরন্তু ফলের সারভাগ সেই তেউড়ে চলিয়া যায়, ফলতঃ ফলের কোমলতা ও মাধুর্য্য হ্রাস হয়। কিন্তু, ফলের মস্তক হইতে তেউড় কাটিয়া লইলে সৌরভের বৈষম্য ঘটে। এজন্য ফর্মিঞ্জার (Firminger) সাহেব বলেন যে, সেই

পাতাগুলি মিলিয়া দিয়া ফলের উপরে একখানি ইষ্টক বা টালি চাপা দিতে হয়। এরূপ করিলে তেউড়ের বৃদ্ধি রোধ হয়, এবং সৌরভ নষ্ট হইতে পায় না, ফলও পরিপুষ্ট হইতে থাকে।

স্থানীয় জলবায়ুর বিভিন্নতা বশতঃ মুরসিদাবাদ অঞ্চলে আনারস অতি অল্পই জন্মিয়া থাকে। গাছ জন্মে ও বৰ্দ্ধিত হয় কিন্তু ফল অতি বিরল। এজন্য মুরসিদাবাদে আনারসের বিশেষ আদর। কলিকাতা অঞ্চল হইতে সময়ে সময়ে যে চালান যায়, তাহাতেই তথাকার অধিবাসিগণ আনারস খাইতে পান। আঁট-মাটি ও লোনা হাওয়াতে আনারস ভাল জন্মে কিন্তু উক্তস্থান এতদুভয় হইতে বঞ্চিত, এইজন্য তথায় ইহা দুর্ল্লভ সামগ্রী।

ডাক্তার লিণ্ডলী (Lindley) সাহেব বলেন যে, বিনা মৃত্তিকা সংশ্রবে উহা জীবিত থাকিতে পারে। এজন্য দক্ষিণ আমেরিকায় উদ্যান মধ্যে ইহাকে বারান্দা বা অন্য কোন স্থানে ঝুলাইয়া রাখিয়া দেওয়া হয়। যাহা হউক, ইহা যে আর্দ্র বাতাসে ভাল থাকে তাহাতে সংশয় নাই, কারণ বাঙ্গালা দেশে ইহা যে পরিমাণে জন্মে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তদ্রূপ হয় না। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের বাতাস শুষ্ক, সুতরাং তথায় উহা অতি কষ্টে জন্মিয়া থাকে।

সচরাচর বাজারে বিক্রয়ার্থ যে সকল আনারস আইসে তাহা যে তাদৃশ ভাল হয় না, তাহার কারণ এই যে, উহার আবাদে লোকে বিশেষ যত্ন করে না। যত্ন পূর্ব্বক আবাদ করিলে দেশী আনারস অতি উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে নানা স্থানের আনারস এদেশে জন্মিয়া থাকে, কিন্তু সচরাচর ও সর্ব্বত্র তাহা পাওয়া যায় না। সিংহল দেশের আনারসের গাত্রে অতি অল্পই চোক

থাকে এবং তাহার স্বাদ অতি উপাদেয়। সিঙ্গাপুরের আনারস গাছের পাতা অতিশয় মনোহর, এজন্ত অনেক সৌখী-নের উদ্যানে উহাকে টবে রাখা হইয়া থাকে। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে কাশিপুর হটিকালচারাল ইনষ্টিটিউশনে নিম্নলিখিত দুই জাতীয় বিস্তর গাছ আমদানী হইয়াছিল। বিগত কয়েক বৎসর হইতে শ্রীহট্টে বিস্তৃত ভাবে আনারসের আবাদ হইতেছে এবং উক্ত কারবার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

কুইন (Queen), কেইন (Cayenne) প্রভৃতি জাতীয় আনারস অতিশয় উৎকৃষ্ট। ইয়ুরোপে ইহাকে বিশেষ যত্ন সহকারে আবাদ করা হইয়া থাকে। বিলাতে কাচের ঘরে (hct-house) আনারস জন্মিয়া থাকে এবং তথায় ইহা একটি দুর্লভ ফলের মধ্যে গণ্য।

যত্নপূর্ব্বক গৃহমধ্যে ঝুলাইয়া রাখিলে আনারস অনেক দিন পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে কিন্তু তাদৃশ রসাল থাকে না। সুপক্ক আনারসে উৎকৃষ্ট মোরব্বা, চাটনী ও অম্বল হইয়া থাকে। উহার পাতার রস কৃমিনাশক। আসাম প্রদেশে স্বভাবতঃ আনারস অতি বৃহদাকারের হইয়া থাকে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তেজপুর থাকিতে বড়জুলী-টী এষ্টেটে যে একটি বৃহদাকারের আনারস দেখিয়াছিলাম তাহা পরিমাণে এক হাত লম্বা, এবং বরণ-ডালার "শ্রীর" ন্যায় বোঁটার দিক্ হইতে শিরোভাগ ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে। তাহার ওজন সাড়ে-সাত সের হইয়াছিল। এরূপ বৃহৎ আনারস কখনও দেখি নাই। এরূপ ফল ভোজন অপেক্ষা দর্শনে সুখ আছে।

বিগত ১৯০১ সালে রাজনগরে আবাদ করিবার জন্য সিংহল

হইতে নিম্নলিখিত কয়েকজাতীয় আনারসের গাছ আনাইয়াছিলাম। যত্ন পূর্ব্বক পাট করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।

১। কিউ পাইন (Kew pine)।—ইহার পাতা সবুজ বর্ণের এবং কাঁটাবিহীন। নিম্নতল প্রদেশে ৭।৮ মাস মধ্যে ফল ধারণ করে। এক একটী ফল দশ সের ওজনের হইয়া থাকে। অতিশয় রসাল, এবং সৌরভ মনোহর।

২। মরিসস্ (Mauritius)—ইহার পাতায় কাঁটা আছে। ফল বড় ও মিষ্ট।

৩। গাল্-আনাসী (Gal annasi) ইহার ফলের আকার ও আস্বাদ মরিসসের ন্যায়।

নারিকেল

COCUS NUCIFERA

Coconut

ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই নারিকেলের গুণের কথা অল্পাধিক অবগত আছেন। নারিকেলের কোন অংশই নষ্ট হয় না পরন্ত ইহার আবাদও বিশেষ ব্যয় বা শ্রমসাপেক্ষ নহে। এই জন্য অনেকে নারিকেলের আবাদ করিয়া থাকেন। নারিকেলের আবাদে বার্ষিক একটা স্থায়ী ও নির্দ্দিষ্ট আয় থাকে। এ জন্যও অনেক গৃহস্থ ইহার আবাদ করেন।

নারিকেলের স্বাভাবিক উৎপত্তি স্থান, ভারতীয় সমুদ্র উপকূল এবং পূর্ব্ব উপদ্বীপ, ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল ইত্যাদি। সমুদ্রকূল হইতে যত দূর দেশে যাওয়া যায়, ততই সে সকল স্থানে নারিকেল গাছ খর্ব্বাকৃতি, এবং ফল ছোট ও সুস্বাদবিহীন হইতে দেখা যায়। সিংহল, সিঙ্গাপুর, মালয়, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের নারিকেল যত বড় ও সুমিষ্ট হয়, বাঙ্গালা দেশে তেমন হয় না। আবার নিম্নবঙ্গে যাহা জন্মে, উচ্চ বঙ্গ হইতে যতই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া যায়, ততই নারিকেল গাছ কম দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্থানের জলবায়ু লবণাক্ত এবং মাটি রসাল, এইরূপ স্থানেই নারিকেল জন্মিয়া থাকে।

বেলে অপেক্ষা দোঁ-আঁশ, এবং দোঁ-আঁশ অপেক্ষা এঁটেলমাটি নারিকেলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মুরসিদাবাদে অবস্থান কালে রৈইসবাগে বিস্তর নারিকেলের চারা রোপন করা গিয়াছিল। উক্ত বাগানের সাধারণ মাটিতে বালির ভাগ অধিক ছিল। বর্ষার কয়েক মাস গাছগুলি বেশ ছিল, কিন্তু যত উত্তাপ বাড়িতে লাগিল ততই বালিমাটি উত্তপ্ত হওয়ায় চারাগাছ মরিতে লাগিল। কিন্তু যে ভূমিখণ্ডে মাঠ-কলায়ের আবাদ করা হইয়াছিল, সেই ক্ষেত্রস্থিত নারিকেলের চারাগুলির বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় নাই; তাহার কারণ আমি যতদূর বুঝিয়াছিলাম, ঐ সকল চারার গোড়া মাঠ-কলাই গাছ দ্বারা আবৃত থাকায় মাটি অধিক উত্তপ্ত বা নীরস হইতে পারিত না, সুতরাং গাছেরও কোন অনিষ্ট হয় নাই। বেলে বা দোআঁশ মাটিতে রোপিত গাছগুলিকে দুই তিন বৎসর বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে, আর উহাদিগের মরিয়া যাইবার জন্য বিশেষ আশঙ্কা থাকে না।

নারিকেল গাছের পক্ষে অত্যুচ্চ ও নীরস জমি যেমন অনুপযোগী, ডোবা ও নীচু জমি তেমনি ক্ষতিজনক। বালির ভাগ অধিক এরূপ মাটি স্বভাবতঃ নীরস হইয়া থাকে, কিন্তু অনিবার্য্য কারণে এরূপ ভূমিতে নারিকেল রোপণ করিতে হইলে, জমিতে পুষ্করিণীর পঙ্কিল মাটি, পানা, শেওলা, Water Hyacinth প্রভৃতি সংযোজিত করা আবশ্যক। এই প্রকার জমিতে নারিকেল গাছ পুতিবার পূর্ব্বে তথায় কলাগাছের আবাদ করিয়া রাখিলে মাটি সরস হইয়া থাকে, এবং সেই কলাগাছের এঁটে, পাতা প্রভৃতি পচিয়া গিয়া মাটির সহিত মিলিত হয়, ফলতঃ মাটির ধারকতা বৃদ্ধি হয়, মাটি উত্তাপশোষনক্ষম হয়। বেলে জমি রৌদ্রের সময় তাতিয়া উঠে এবং রৌদ্র, শোষণের পরিবর্ত্তে, প্রত্যাখ্যান করে। এইজন্ত ঈদৃশ জমিতে নারিকেল গাছ রোপণে সুবিধা হয় না। নারিকেল গাছের চারাবস্থায় উহাদিগের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কলাগাছের আবাদ করিলে নারিকেলের চারা কদলীর ছায়া পাইয়া অতি অল্প দিন মধ্যে বাড়িয়া উঠিতে পারে। এই প্রণালীতে নারিকেল গাছ রোপণ করিতে হইলে, প্রথমতঃ যথাবিধি জমি তৈয়ার করিয়া দশ হাত অন্তর এক একটী কদলী তেউড় রোপণ করিতে হইবে। অতঃপর এক বৎসর পরে সেই জমিতে প্রত্যেক দুইটী কদলী ঝাড়ের মধ্যস্থলে নারিকেলের চারা রোপণ করিতে হইবে। এক বৎসরের মধ্যেই কলাগাছ ঝাড়বিশিষ্ট হইয়া উহাকে অল্পাধিক ছায়া প্রদান করিবার উপযোগী হয়। নারিকেলের জন্য স্বতন্ত্র ক্ষেত্র করিতে হইলে উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, কিন্তু যদি স্থানে স্থানে অথবা বেড়ার ধারে বা পুষ্করিণীর পাড়ে রোপণ করিতে হয়, তাহা হইলে নারিকেল চারার দুই পার্শ্বে ৩।৪ হাত দূরে

দুইটী কলাগাছ থাকিলে ভাল হয়। যেদে মাটিতে নারিকেল আবাদ করিতে হইলেই যে কলা গাছ প্রভৃতিতে হয় তাহা নহে। যে কোনরূপ জমিই হউক, নারিকেলের ক্ষেত্রে উক্ত প্রণালীতে কলাগাছ রোপণ করিলে যে বিশিষ্ট ফল লাভ হয়, তাহাতে সংশয় নাই। নারিকেলের গাছ বড় হইয়া ফলবতী হইতে ৬।৭ বৎসর সময় লাগে। ইতিমধ্যে সেই কলাগাছে যে আয় হয়, তাহাতে নারিকেল গাছকে ঐ কয়েক বৎসর পালন করিয়াও উদ্যান-স্বামীর লাভ থাকে। যখন দেখা যাইবে যে কলা গাছের নিমিত্ত নারিকেল গাছের অসুবিধা হইতেছে, তখন প্রথমোক্ত গাছ কাটিয়া দিলেই চলিবে।

নারিকেল গাছের ফল নারিকেল কিন্তু ইহার পাঁচটী অবস্থা আছে যথা,—মুচি, ডাব, শাঁসে-জলে, দো-মালা বা ঝুনো ও ঝুনা। নারিকেলের শৈশবাবস্থার ফল,—মুচি। এ অবস্থায় নারিকেলের কোন ব্যবহার নাই উপরন্তু এ অবস্থায় ফল অনেক পড়িয়া যায়। মুচি অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া অপেক্ষাকৃত বড় হইলে তাহাকে ডাব কহে। ডাব অবস্থায় ইহার মধ্যে কেবল জল থাকে। অতঃপর তাহার ভিতরে শাঁস জন্মে। শাঁস যতদিন কোমল থাকে, ততদিন তাহা ডাব। অনন্তর ফলের শাঁস দিন দিন স্থূল ও ঈষৎ শক্ত হইতে থাকে, তখন তাহাকে শাঁসে-জলে নারিকেল কহে। ডাবের অবস্থায় নারিকেলের জল সুমিষ্ট এবং উপকারী। শাঁসে-জলে অবস্থায় শাঁস ও জল মিষ্ট এবং উপকারী। দো-মালা বা ঝুনো অবস্থায় ভিতরের জল অত্যধিক হ্রাস হয়, শাঁসও কঠিন হয় সুতরাং সে জল উপকারী নহে, কিন্তু শাঁস ভোজনের যোগ্য। শেষাবস্থা,—ঝুনা। ইহার জল আদৌ সুপেয় নহে, বরং পান

করিলে অসুখ হইবার সম্ভাবনা। ঝুনার শাঁস প্রাচীন দন্তহীনগণের নিকট অভক্ষ্য। ইহার শাঁস হইতে লাড্ডু, চিনির-পুলি রসকরা প্রভৃতি মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়। ঝুনা নারিকেলের শাঁস কুরুণীতে কুরিলে যে কুরা শাঁস হয় তাহাকে নারিকেল-কোরা কহে। অনেক ব্যঞ্জনে এবং পিষ্টকে নারিকেল-কোরা ব্যবহৃত হয়। ঝুনার শাঁস হইতে নারিকেল তৈল, এবং নারিকেল তৈল হইতে গ্লিসারিণ প্রস্তুত হয়। নারিকেল-শাঁস পেষিত হইলে তৈল উৎপন্ন হয় এবং যে পিষ্টক বা খৈল অবশিষ্ট থাকে তাহা পশুর খাদ্যরূপে এবং কৃষিকার্য্যে সাররূপে ব্যবহৃত হয়। গ্লিসারিণ, পিষ্টক এবং তৈল—এই তিন জিনিস উৎপন্ন করিবার জন্য ভারতবর্ষ, সিংহল, মালয়দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি নারিকেল উৎপাদনকারী দেশ হইতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মণ নারিকেল শাঁস Copra নামে ইউরোপে—বিশেষতঃ জার্ম্মাণীতে—রপ্তানী হইত। রপ্তানীর পরিমাণ ইদানীং এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে নারিকেলের আবাদ সাহেবদিগের নিকট লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে এবং দিন দিন ইহার বিস্তৃত আবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

বাঙ্গালা দেশে নারিকেল তৈলের অনেক ব্যবহার আছে,—রমণী মহলে বিশেষ আদর আছে। মস্তিষ্ক ও শরীর শীতল রাখে বলিয়া বহু পুরুষেও ইহা দ্বারা দেহাদি স্রক্ষিত করেন।

ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহারের জন্য দাক্ষিণাত্যে—বিশেষতঃ মান্দ্রাজ ও মহীশূর প্রদেশে—নারিকেল তৈল ব্যঞ্জনাদি রন্ধনকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। মহীশূর ও মান্দ্রাজে অবস্থানকালে এই তৈলই ব্যবহার করিতাম। ব্যঞ্জনাদিতে নারিকেল তৈলের কোন স্বাদ পাওয়া যায় না। তাতে-পোড়ায় নারিকেল তৈল ব্যবহার করিতে

পারিতাম না, এ জন্য কলিকাতা হইতে দুই-চারি সের সর্ষপ তৈল আনাইয়া রাখিতাম। সে অঞ্চলের অধিবাসীগণ সর্ষপ তৈলের ব্যবহার জানে না, কিন্তু তথায় সর্ষপেরও যথেষ্ট আবাদ হইয়া থাকে।

যে আবরণের মধ্যে শস্য বা শাঁস থাকে তাহার নাম খোল। উহা বজ্র সম কঠিন। উক্ত খোল হুকার জন্য ব্যবহার হয়। অধিক কি, উক্ত খোল না পাইলে হুকা নির্ম্মিত হয় না। খোল হইতে উত্তম ও কঠিন বোতাম নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

খোলের উপরিস্থ তন্তুরাশি বা ছোবড়া হইতে ঘর, বেড়া প্রভৃতি গৃহস্থালী কার্য্যের জন্য রজ্জু প্রস্তুত হয়। জাহাজ বাঁধিবার বা নোঙ্গর করিবার জন্য মোটা মোটা কাছী নির্ম্মিত হয়। অতঃপর উক্ত ছোবড়ায় পাপোষ, গদী প্রভৃতি কত প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা বলিয়া শেষকরা যায় না।

নারিকেল পাতা না হইলে হবিষ্যান্ন পাক করা চলে না। পাতার কাটিতে সম্মার্জ্জনী নির্ম্মিত হয় এবং সেই সম্মার্জ্জনী লক্ষপতির বিলাস গৃহ, মধ্যবিত্তের দৌলতখানা বা মসাফের-খানা, এবং দরিদ্রের কুটীর প্রতিদিন সম্মার্জ্জিত হইয়া থাকে।

পরিপুষ্ট ও সুপক্ক নারিকেল বৃক্ষের কাণ্ড অতিশয় মজবুদ হয়। এইজন্য উহা গৃহাদির আড়া, খুঁটী প্রভৃতি জন্য নিয়োজিত হইয়া থাকে।

নারিকেল তৈল সাবানের অন্যতম উপকরণ, অনেক সুবাসিত তৈলের প্রধান উপাদান বা Base। তাহা ব্যতীত, নারিকেল হইতে জার্ম্মানীতে মাখন প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং তাহা অতি উপাদেয় ও পুষ্টিকর। আলানী কার্য্যে নারিকেল তৈলের ব্যবহার

এদেশে পূর্ব্বে ছিল কিন্তু কেরোসিন, অ্যাসিটালীন, বৈদ্যুতিক আলোকের প্রবর্ত্তন হওয়ায় নারিকেল তৈল বিবাহ বাসর এবং যাত্রা পাঁচালীর আসর হইতে অবসর পাইয়াছে।

নারিকেলের ফল ভিন্ন অন্য কিছুতে চারা জন্মে না। প্রাচীন বৃক্ষের সুপক্ক সুপুষ্ট ঝুনা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কোন ছায়াবিশিষ্ট স্থানে 'পাত' বা হাপোর দিতে হয়। ফলের বোঁটার অংশ উপরে রাখিয়া ঈষৎ হেলাইয়া সমগ্র ফলের তিনভাগ মৃত্তিকামধ্যে পুতিয়া দিবে। মাটি সর্ব্বদা ভিজা থাকিলে ২৫।৩০ দিনের মধ্যে 'কল' উদ্গত হয়। হাপোরে রোপণকালে ফলগুলি পরস্পর সংলগ্ন হইয়া থাকিলে আপাততঃ ক্ষতি নাই, কারণ উহাদিগকে কিছুদিন পরেই স্থানান্তর করা আবশ্যক হইয়া থাকে। চারাগুলির ৩।৪ টী পাতা জন্মিলেই অন্য একটী হাপোরে ঈষৎ অন্তর করিয়া পুতিতে হইবে। বর্ষার মধ্যেই চারা স্থানান্তর করা উচিত। দুই বৎসরের ন্যূন বয়স্ক চারা ক্ষেত্রে বসিবার উপযোগী হয় না। বড় চারার মূল্য অধিক বলিয়া অনেকে এক বৎসরের চারাই রোপণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তত ছোট চারাকে ক্ষেত্রে বসাইলে অনেক মরিয়া যায় সুতরাং তাহাতে সাশ্রয় হয় না।

জমিতে দশ হাত অন্তর নারিকেল গাছ পুতিতে হয়। চারা রোপণের পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে একহাত গভীর এক একটী গর্ত্ত করিয়া তাহাতে চারাটী ঈষৎ বক্র ভাবে বসাইবে। অনন্তর মাটি দ্বারা গর্ত্ত উত্তমরূপে পূর্ণ করিয়া দিবে। মাটির সহিত লবণ ও ছাই মিশাইয়া দিলে গাছে আর উইপোকা আসিতে পারে না,—পরন্তু গাছেরও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

'আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক মাস মধ্যেই জমিতে চারা রোপণের

সময়। বর্ষার প্রথম ভাগে যাহাতে চারা রোপণ করিতে পারা যায়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত, কেন না তাহা হইলে গাছগুলি শীঘ্রই মৃত্তিকায় সংলগ্ন হইয়া যায়। অন্য সময়ে রোপণ করিলে সমধিক যত্ন করিতে হয়। অন্ততঃ দুই বৎসর কাল পর্য্যন্ত চারাগুলিকে বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে নিয়মিতরূপে জলসেচন করা আবশ্যক। নারিকেল সুপারি প্রভৃতি গাছ কঠিন-প্রাণ বলিয়া অনেকে তৎপ্রতি তাচ্ছিল্য করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার ফলে, অনেক গাছ মরিয়া যায়, অপর রুগ্ন হইয়া পড়ে। নারিকেল গাছের গোড়া সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে।

তিন চারি বৎসর মধ্যে গাছের কাণ্ড মৃত্তিকার উপরে দেখা দেয় এবং ষষ্ঠ বা সপ্তম বর্ষে গাছে ফল ধরিয়া থাকে। প্রতি বৎসর গাছের গোড়ায় পুষ্করিণীর পানা বা শেওলার সহিত লবণ সংযুক্ত করিয়া দিলে গাছের তেজ বৃদ্ধি হয় এবং ফলও উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রতি গাছে এক সের লবণ দিলেই চলিবে এবং এই লবণ নিকৃষ্ট জাতীয় হইলে কোন ক্ষতি নাই। লবণের পরিবর্ত্তে সোরা ব্যবহারও প্রচলিত আছে। খৈল, পচা-মাচ, অস্থিচূর্ণ ও পটাস্ নারিকেল গাছের পক্ষে উত্তম সার।

গাছে ফল ধরিতে বিলম্ব হইলে অথবা গাছে ফল না ধরিলে উহার গাত্রে স্থানে স্থানে দুই তিনটী গর্ত্ত করিয়া দিলে গাছে ফল ধরে। এই গর্ত্ত বা ছিদ্র কাণ্ডের দুই দিক্ ভেদ না করে। এইরূপ গর্ত্ত করিয়া দিলে উহার তেজ কথঞ্চিৎ হ্রাস হয়, তন্নিবন্ধন গাছে ফল ধরিয়া থাকে।

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে গাছের মস্তক হাল্কা ও পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। মস্তকের নিম্নভাগে যে সকল পুরাতন ও শুষ্ক পাতা

এবং পুরাতন মোচ ও জালতি থাকে তাহা কাটিয়া দিবে এবং মস্তকোপরি কাক বা চিলের বাসা থাকিলে তাহাও ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিবে। এরূপ না করিলে গাছের মস্তকে জল বসিয়া ঠাণ্ডা লাগে এবং আবর্জ্জনাদি পচিয়া গিয়া উহা পোকা মাকড়ের আবাসস্থান হইয়া গাছের অনিষ্ট করে। যে সকল গাছের গোড়া মাটির উপরে দেখা যায়, তাহাদিগকে সারবান্ মাটি ও পূর্ব্বোল্লিখিত পুষ্করিণীজাত শেওলা দ্বারা মাঘ-ফাল্গুন মাসে উত্তমরূপে ঢাকিয়া দিলে গাছের গোড়া ঠাণ্ডা থাকে এবং তাহাতে ফলের সংখ্যাধিক্য, আকার ও মিষ্টতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

এমন কোন কোন গাছ দেখা যায় যাহাতে প্রচুর ফল ধরিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে জল বা শস্য অতি অল্প থাকে বা অনেক সময়ে থাকে না। এরূপ গাছকে 'ভূয়া' গাছ, এবং ফলকে 'ভূয়া' ফল বলিয়া থাকে। যে গাছে এই প্রকার ফল জন্মে তাহার ডাব পাড়িয়া লওয়া উচিৎ, কারণ এ অবস্থায় সময়ে সময়ে শস্য ও জল পাইলেও পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সেই ডাব পাকিয়া গেলে উহাতে আদৌ কিছু থাকে না। যদি ডাব অবস্থাতেও উহা ব্যবহার্য্য হয়, তাহা হইলে গাছে মোচফুলের কাঁদী বাহির হইলেই দুই তিন বৎসর একবারে কাটিয়া দেওয়া এবং গাছের বিশেষ তদ্বির করা আবশ্যক। এ প্রণালী অবলম্বন করিলে গাছের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া সুফল প্রদান করিতে পারে।

গাছে নারিকেলকে ঝুনা হইতে দিলে ফলন অপেক্ষাকৃত কম হইয়া থাকে কিন্তু ডাব অবস্থায় ফল পাড়িয়া লইলে ফলন অধিক হয়, তাহার কারণ এই যে, ফল অধিক দিবস গাছে

থাকিলে, উহাকে পোষণ করিবার জন্ত গাছের যে শক্তি ব্যয়িত হয়, ডাব পাড়িলে আর তত আবশুক হয় না, সুতরাং তাহা বৃক্ষ শরীর মধ্যে সঞ্চিত থাকে, এবং পরবর্ত্তী ফসলে কাজে আসিয়া থাকে। যাঁহারা ঝুনা নারিকেলের আবশুক বোধ করেন না, তাঁহাদের পক্ষে ডাব পাড়িয়া লওয়া ভাল।

নারিকেল গাছের কাণ্ডে কাট্-ঠোক্‌রা প্রভৃতি পক্ষীতে ছিদ্র করে। ইহাতে গাছের দুর্ব্বলতা আনায়ন করিয়া উহাকে ফলধারণের অনুপযোগী করে এবং অবশেষে গাছ মরিয়া যায়। এজন্ত গাছে ঐ সকল পক্ষী বসিতে দেওয়া উচিত নহে। ইতি-পূর্ব্বে ছিদ্র করিয়া থাকিলে, তাহাতে গোবর ও মাটি দিয়া প্রলেপ দিবে এবং গর্ত্তের মধ্যে ঐ মাটি প্রবেশ করাইয়া দিবে। তদনন্তর উহার উপরিভাগে কয়েক খণ্ড বোতল ভাঙ্গা বা কাচের টুক্‌রা লাগাইয়া দিবে। এরূপ করিলে পুনরায় সেই গর্ত্তে আর পাখীতে ঠুকরাইতে পারিবে না।

নারিকেলের অনেকগুলি জাতি আছে, তন্মধ্যে সচরাচর কয়টী দেখিতে পাওয়া যায়, এ স্থলে তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে।

১ম। এক প্রকার হরিদ্রা বর্ণের নারিকেল জন্মে, তাহাকে ব্রাহ্মণ নারিকেল কহে। ইহার আকার মাঝারি রকমের।

২য়। তাম্রবর্ণের যে নারিকেল হয়, তাহার আকার তাদৃশ বড় নহে। খাইতে মিষ্ট।

৩য়। কচি অবস্থায় সবুজবর্ণের এবং পাকিলে লাল্‌চে রং ধারণ করে। ইহাই সচরাচর বাজারে বিক্রীত হয়।

৪র্থ। ছোট বেলের ন্যায় আকারের এক প্রকার নারিকেল

হয়। যদিও উহা অতিশয় ক্ষুদ্র কিন্তু ডাবের অবস্থায় উহাতে প্রচুর জল থাকে। ইহাকে হাজারি নারিকেল বলে। এক এক কান্দিতে ৭০।৮০টী করিয়া ফল থাকে।

৫। সিঙ্গাপুরে।—এই নারিকেল চারি পাঁচ সের ওজনের হইয়া থাকে।

নারিকেলের আবাদ হইতে একটি স্থায়ী আয় হইয়া থাকে। এক বিঘা জমিতে ৬০ হইতে ৮০ টী গাছ সুশৃঙ্খলে বসিতে পারে। সাধারণতঃ ইহার গাছ প্রতি একটাকা আয় নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইদানীং সকল ফল-পাকুড় এত মহার্ঘ হইয়াছে যে, তাহাতে প্রতি নারিকেল বৃক্ষ হইতে দুই টাকার অধিক আয় ধার্য্য করিলে অন্যায় হয় না। কিন্তু প্রকৃষ্ট প্রণালীতে আবাদ করিলে বিঘা প্রতি ১৫।২০ টাকা খরচ পড়িতে পারে, এবং তাহা হইলে যে উৎপন্ন অধিক পরিমাণে হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। যদি ন্যূন কল্পে বিঘা প্রতি ৬০৲ টাকার ফল পাওয়া যায় এবং আবাদে ২০৲ টাকা খরচ করা হয়, তাহা হইলেও ৪০৲ টাকা লাভ থাকে। এতদ্ব্যতীত পাতা ও কাটি বিক্রয় করিয়া বৎসরে বিঘা প্রতি ৮।১০ টাকা আদায় হইতে পারে। উৎপন্নের পরিমাণ কম এবং খরচের পরিমাণ অধিক ধরিলেও বিঘা প্রতি ৪০৲ প্রতি বৎসর আদায় হইতে পারে।

এক্ষণে মহার্ঘের দিন আসিতেছে, আবাদ রক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি পাই যাছে, জন-মজুরের বেতন বা মজুরী যথেষ্ট বাড়িয়াছে। এরূপ স্থলে, গাছপালা হইতে সাধ্যমত ফসল আদায় করিতে হইবে কিন্তু তাহা করিতে হইলে সকল ফসলেরই প্রকৃষ্ট প্রণালীতে আবাদ করিতে হইবে, প্রত্যেক ইঞ্চ ভূমিকে সারবান ও কোমল করিতে হইবে।

দাড়িম্ব

Pomegranate

দাড়িম্বের অন্য নাম ডালিম বা বেদানা। ইহা রোগীর পথ্য এবং ভোগীর ভোজ্য। ফলের আবরণ বা খোলা শক্ত কিন্তু ভিতরের দানা অতি সুমিষ্ট ও সরস। ডালিম মেওয়া ফলের মধ্যে গণ্য।

আফগানিস্থান ও আরবদেশের বেদানা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বাঙ্গালা দেশ মধ্যে পাটনা অঞ্চলে যে ডালিম জন্মে, তাহাও ব্যবহার যোগ্য কিন্তু অধুনাতন যে সকল ফল নিম্ন বঙ্গে জন্মে, তাহা অতিশয় নিকৃষ্ট শ্রেণীর, তাহার কারণ এই যে, এদেশের মাটি ও জল বায়ু ইহার পক্ষে তাদৃশ অনুকূল নহে।

ডালিম গাছের শিকড় ভাসা অর্থাৎ ইহার শিকড় মাটির ভিতর অধিক দূর প্রবেশ করে না, কিন্তু যথাবিধ পাট না করিলে সেই স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। নিম্ন-বাঙ্গালার মাটি যেমন রসা, আবহাওয়া তদ্রূপ সর্দ্দি-বিশিষ্ট। এই কারণে বাঙ্গালা দেশে ডালিম গাছের আকার বর্দ্ধিত হয় কিন্তু ফল সুমিষ্ট বা সুপুষ্ট হইতে পারে না। তবে বিশেষ যত্ন করিয়া দেখিয়াছি যে, ফলের এই সকল দোষ কিয়ৎ পরিমাণে দূরীকৃত করিতে পারা যায়। নিম্ন-বঙ্গে ডালিম গাছ রোপণ করিতে হইলে প্রতি গাছের জন্ম দীর্ঘে ও প্রস্থে ৪ হস্ত ভূমির দুই হাত গভীর করিয়া মাটি উঠাইয়া ফেলিয়া, সেই

বিস্তৃত গর্ত্তমধ্যে টালি বা ইট পাটকেল প্রসারিত করিয়া গাছ রোপণ করিলে শিকড়গুলিতে তাদৃশ সর্দ্দি লাগিতে পায় না এবং উহারা আর মাটির ভিতরে অধিক দূর প্রবেশ করিতে না পারিয়া উপরি ভাগেই বিস্তৃত হইতে থাকে। বেহার বা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মাটি অতিশয় নিরস এবং রৌদ্র অতি প্রখর, সুতরাং যে সকল দেশে মাটির ভিতরে টালির পাড়ন আবশ্যক হয় না।

যে জমি বর্ষায় ডুবিয়া যায় অথবা অতিশয় ঠাণ্ডা, এরূপ স্থানে কোন মতে ডালিম গাছ রোপণ করা উচিত নহে। ঠাণ্ডা জমিতে ডালিম গাছ রোপণ করিলে তাহাতে কীটের আবাস হয়, তন্নিবন্ধন গাছ রুগ্ন হয় এবং ফলও কীটাক্রান্ত হয়।

গুটী, বীজ, দাবা, জোড়-কলমে ও ডাল কাটিয়া পুতিলে ইহার চারা হইয়া থাকে। বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিতে হইলে ভাল জাতীয় ও সুপক্ক ফলের বীজ রোপণ করা উচিত। ভাল জাতীয় গাছ এদেশে লালিতপালিত হইয়া যে ফল প্রদান করে, তাহার বীজও রোপণ করা উচিত নহে, কেন না তাহাতে ও গাছ খারাপ হইয়া যাইতে পারে, সুতরাং যে সকল স্থানে ভাল ডালিম জন্মে তথাকার বীজ অনাইয়া রোপণ করিলে একবারে ততদূর নিকৃষ্টতা পাইতে পারে না। বীজ হইতে চারা জন্মাইয়া স্থায়ীরূপে ক্ষেত্রে রোপণ করিবার পূর্ব্বে উহার মূল শিকড়টী যত্ন ও সাবধানতার সহিত কাটিয়া গাছটীকে ‘খাসি’ করণান্তর রোপণ করিতে হয়। ইহাতে ফল অধিক হয়। জোড়-কলম করিবার জন্য যে বীজের চারা আবশ্যক হয়, তাহাকেও ‘খাসি’ করিয়া লইতে হয়।

প্রখর গ্রীষ্মকাল ব্যতীত যে কোন সময়েই জোড়-কলম করা যাইতে পারে, আর গুটী ও দাবা-কলমের পক্ষে বর্ষাকালই প্রশস্ত সময়। গাছের অবস্থা বুঝিয়া আষাঢ় মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত গাছ পুঁতিতে পারা যায়।

ডালিম গাছের গোড়া হইতে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ও সরু শাখা বা ফেক্‌ড়ি জন্মিয়া গাছের গোড়া ঘন ও আবৃত করিয়া ফেলে সুতরাং উহাদিগকে সংহার করিয়া গাছের গোড়া পরিষ্কার করিয়া না দিলে, বৃক্ষের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। গাছে শুষ্ক বা রুগ্ন শাখা প্রশাখাদি থাকিলে কাটিয়া দিতে হইবে।

অগ্রহায়ণ মাসে এক ফুট গভীর করিয়া গাছের গোড়া খুঁড়িয়া মাটি তুলিয়া ফেলিতে হয়। এরূপ অবস্থায় ১৫।২০ দিবস রাখিয়া সারমিশ্রিত মাটি দ্বারা গাছের গোড়া ঢাকিয়া দিবে। অন্তর সময়ে সময়ে গাছে জল সেচন করিতে হইবে। গাছে ফুল ধরিলে প্রচুররূপে জল দেওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ গোবর সারই প্রচলিত, কিন্তু আমি উহার সহিত অর্দ্ধেক পরিমাণে পুরাতন রাবিসের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া দিয়া দেখিয়াছি যে, উহাতে ফলের বিশেষ উপকার হয়। রৈইসবাগে অনেক দিন হইতে কয়েকটী বেদানা গাছ ছিল কিন্তু পূর্ব্বে কোনরূপ যত্ন না থাকায় গাছগুলি নিতান্ত রুগ্ন ও কদর্য্য হইয়া গিয়াছিল এবং তন্নিবন্ধন তাহাতে অধিক ফল হইতই না, বরং যাহা হইত তাহাও ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট। কিন্তু এক বৎসর উহাদিগকে যত্ন করিয়া এবং গোবর মিশ্রিত সার দেওয়ায় কেবল যে গাছের অবস্থা উন্নত হইয়াছিল তাহা নহে, অধিকন্তু তাহাতে ফলও অধিক হইয়াছিল এবং তাহার দানা বা শস্যও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল

হইয়াছিল। এইরূপ আরও দুই এক বৎসর তদ্বির করিলে ফলের যে আরও উন্নতি হইত তাহার কোন সংশয় নাই কিন্তু তৎপরে তথা হইতে আমি চলিয়া আসায় তাহাদিগের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারিলাম না।

গাছে ফুল ধরিলে বিস্তর কীট আসিয়া তন্মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, বিশেষতঃ ছায়াবিশিষ্ট স্থানে যে গাছ জন্মে তাহার ফুলে অধিকতর কীট আশ্রয় লয়, এইজন্য ফাঁকা যায়গায় গাছ রোপণ করা উচিত। ফুলের সময় মধ্যে মধ্যে গাছে ধোঁয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। যদি তাহাতে সুবিধা না হয়, তাহা হইলে গাছে ফুল আসিবার পরে এবং ফলগুলি ঈষৎ বড় হইলে সুতীক্ষ্ণ ছুরী দ্বারা ফলের মুখের ফুলটী কাটিয়া ফলটী কাপড় বা চট দ্বারা বাঁধিয়া দিতে হইবে। কঠিনরূপে বাধিলে ফল বাড়িতে পারে না, এজন্য কাপড় বা চট আলগা করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। এইরূপে দালিমকে আবৃত করিয়া দিলে ফল বড় হয় এবং তাহার স্বাদ ও সৌরভ মনোহর হইয়া থাকে।

ফলের বাগানে ফলের জন্য ইহার যেমন আদর, ফুল বাগানে শোভার জন্যও ইহা তদ্রূপ আদরণীয়। ইহার ফুলের বর্ণ উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং এরূপ বর্ণ প্রায় অন্য ফুলে দেখা যায় না। ক্ষুদ্র ও চিক্কণ পত্র থাকায় গাছও দেখিতে অতি মনোহর।

পেশবার অঞ্চলের অধিবাসীগণ প্রতি বৎসর শীতকালে তথা হইতে এই মেওয়া ফল নানা দেশে বিক্রয়ার্থ লইয়া আইসে। ইহার মধ্যে দুইটী জাতি আছে,—বেদানা ও মস্কট। বেদানার দানার বর্ণ লাল। আস্বাদ অতি মিষ্ট ও রসাল, এবং বীজও

অতি ক্ষুদ্র। মস্কটের দানা সাদা এবং শস্তের পরিমাণ ও মিষ্টতা অপেক্ষাকৃত অল্প।

আরবদেশের সামী ও তুর্কী জাতীয় বেদানা অতি উৎকৃষ্ট কাপ্তেন বার্টন বলেন যে, মক্কা (Mecca) ভিন্ন অপর কোন স্থানে সামীর তুল্য বেদানা দেখা যায় না। ইহার বহির্ভাগ লাল এবং খাইতে অতিশয় সুমিষ্ট। ইহার ফল একটী ছোট ছেলের মস্তকের ন্যায় বড় এবং সুগন্ধবিশিষ্ট ও প্রায় বীজশূন্য। তুর্কী জাতীয় ফল বড় ও সুমিষ্ট।

সচরাচর দেখা যায়, এদেশে যে সকল দাড়িম্ব ফলে, তাহাতে শাঁস অল্প থাকে এবং বীজ বড় বড় হয় কিন্তু গাছে সার দিয়া ফলের সময় প্রচুর পরিমাণে জল সেচন করিলে শস্য অধিক হয় ও বীজ ছোট হইয়া থাকে।

নাশপাতি

PYRUS COMMUNIS

PEAR

নাশপাতি দেখিতে যেমন সুন্দর, খাইতেও তেমনি মুখ-রোচক। ইহা উচ্চতন এবং শীত প্রধান দেশের ফল। পঞ্জাব এবং কাবুল হইতে প্রতি বৎসর শীতকালে ভারতের নানা দেশে বিস্তর নাশপাতি রপ্তানী হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের গাছ ব্যবসায়ীগণ নাশপাতির চারা বিক্রয় করিয়া থাকেন,

Firmger's Manual of Gardening.

কিন্তু এতাবৎকাল মধ্যে বঙ্গের কুত্রাপি তাহার ফল হইতে শুনা যায় নাই। মুরসিদাবাদস্থিত রৈইসবাগের জন্য পঞ্জাবের অন্তর্গত রামপুর রাজ্য হইতে কয়েকটী নাশপাতির গাছ আনায়ন করা হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এ পর্য্যন্ত তাহার শাখাপ্রশাখায় আবশ্যক মত পাতাও জন্মে নাই। বলা বাহুল্য যে, যত্নের কোন প্রকার ত্রুটী হয় নাই। যে আট দশটী গাছ আনায়ন করা হইয়াছিল, দুই বৎসর মধ্যে কয়েকটী মরিয়া যায় এবং অবশিষ্ট যে তিন চারিটী জীবিত ছিল তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিয়াও দেখিয়াছি, তথাপি তাহার অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। গাছগুলির শিরোভাগে অল্পমাত্র পত্র ছিল। নাশপাতির গাছে বড়ই নিরাশ হইয়াছিলাম, সুতরাং ইহার বিষয়ে অধিক লিখিলাম না। হায়দ্রাবাদেও নাশপাতি উৎপন্ন করিতে পারা যায় নাই কিন্তু মহিশূরে যথেষ্ট নাশপাতী জন্মে। ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে একবার সাহারাণপুরে গিয়াছিলাম এবং সেখানকার বোটানিক গার্ডেনে ফলপূর্ণ নাশপাতি গাছ দেখিয়াছিলাম, গাছগুলি ফলভরে অবনত। গাছপাকা নাশপাতি অতি মিষ্ট ও রসাল।

লেবু

CITRUS DECUMANA

Pumelo or Shaddok

হিন্দি ভাষায় ইহাকে চকোত্রা এবং বাঙ্গালায় বাতাবী কহে। অনেকে অনুমান করেন যে প্রথমতঃ উহা

এদেশে ব্যাটেভিয়া দেশ হইতে আনীত হয়। যাহাহউক, বাতাবি লেবুর সচরাচর দুইটী জাতি দেখা যায়,—একটীর ভিতরের বর্ণ হরিদ্রাভাযুক্ত শ্বেত এবং অপরটীর গোলাপী। শুষ্ক ও দো-আঁশ অপেক্ষা রসা এঁটেল মাটিতে ইহা ভাল জন্মে।

বীজ, গুটী, চোক ও দাবাকলমে ইহার চারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বর্ষাকাল চারা উৎপাদনের উপযুক্ত সময়। নূতন চারা একবারে যথাস্থানে রোপণ না করিয়া একবৎসর কাল হাপোরে রাখিয়া পালন করিবার পর, বর্ষার প্রারম্ভে নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থায়ীভাবে রোপণ করিলে ভাল হয়। বর্ষাকালে চারা তৈয়ার করিবার সময়।

বাতাবী গাছ ৩০।৪০ বৎসরাধিক কাল জীবিত থাকে এবং ফল প্রদান করে। গাছের বয়োবৃদ্ধিসহকারে ফলনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সচরাচর ৬।৭ হাত অন্তর বাতাবী রোপিত হয়, কিন্তু এত দীর্ঘকাল স্থায়ী ও পল্লব বহুল গাছের পক্ষে সে দূরত্ব যথেষ্ট নহে। গ্রন্থকারের বাড়ীতে ৪০।৪৫ বৎসর বয়সের একটী বাতাবী গাছ আছে। উক্ত গাছটী প্রায় এক কাঠা যায়গা অধিকার করিয়া ছিল কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ ডালপালা ছাঁটিয়া দেওয়ায় অপেক্ষাকৃত অল্পায়তন এবং উচ্চ হইয়াছে। এখনও উহা প্রতি বৎসর পূরা ফসল দিয়া থাকে। যে গাছ এত দীর্ঘজীবি, বৃদ্ধিশীল ও ফলন্ত তাহাদিগকে ২০ হাত অন্তর রোপণ করা উচিত। অন্যান্য গাছের যেরূপ পাট হইয়া থাকে, তাহা হইতে ইহার বিশেষ পাট কিছু নাই, তবে আবাদের তারতম্যানুসারে ফলের ইতরবিশেষ হয়।

কার্ত্তিক মাসের শেষভাগে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া কয়েক দিবস শিকড় বাহির করিয়া রাখিয়া, পরে সার দিয়া গোড়া ঢাকিয়া দেওয়া আবশ্যক। মাঘ মাসে গাছে ফুল আইসে। বাতাবী ফুলের এমন সুগন্ধ যে, যে স্থানে উহা প্রস্ফুটিত হয়, সে স্থানের অনেক দূর ব্যাপিয়া আমোদিত হয়। ইহার ফুল শুভ্র বর্ণের এবং থলো থলো হইয়া থাকে। সাহেবেরা ইহাকে Orange blossom কহেন এবং যথেষ্ট আদর করেন। ইহাদিগের বিবাহ-তোড়া (Bridal বা Wedding boquet) অর্থাৎ বিবাহের সময় যে ফুলের তোড়ার আবশ্যক হয়, তাহা বাতাবী ফুলেও হইয়া থাকে।

ইহার ফল কাঁচা খাওয়া যায় না। শ্রাবণ মাস হইতে গাছে ফল পাকিতে আরম্ভ হয়। গাছ হইতে ফল না পাড়িলে এক বৎসরের অধিক উহা গাছেই ঝুলিতে থাকে কিন্তু পাকিয়া যাইবার পর অধিক দিন গাছে থাকিলে ক্রমে নীরস হইয়া যায়। মদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ সন্ন্যালের মুখে শুনিয়াছি যে, দীর্ঘকাল গৃহমধ্যে সংগৃহীত থাকিলে বাতাবী সমধিক মিষ্ট হয়। তীব্র অম্লময় বাতাবী এইরূপ গৃহমধ্যে ২।৩ মাস থাকিলে সুমিষ্ট হয় ইহা তাঁহার পরীক্ষিত। ইহা হইতে বুঝা যায় উত্তম গাছ-পাকা না হইলে বাতাবী মিষ্ট হয় না।

লোকে বলে, মাঘ মাসে যখন গাছে ফল ধরে, তখন গাছের গোড়ায় লবণ দিলে ফল সুমিষ্ট ও রসাল হয়। বাতাবীর সার লবণ কি না তাহা আমি পরীক্ষা করি নাই, তবে মাটিতে লবণ সংযোজিত হইলে মৃত্তিকান্তর্গত উদ্ভিদ খাদ্যসমূহ অচিরে বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের আহরণোপযোগী হয়।

Citrus Japonica (Kamquat Orange)—কাম্‌কোয়াট লেবু কমলাজাতীয় চীন দেশীয় ফল, কিন্তু এদেশে আজ কাল অনেক হইয়াছে। ফলের আকার গুপারির স্থায়, আস্বাদ তীব্র অম্লাক্ত। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলিয়া থাকে এবং যখন পাকিয়া উঠে, তখন লাল ও হরিদ্রা মিশ্রিত বর্ণের হয় এবং দেখিতে বড়ই সুন্দর হইয়া থাকে। অনেকে এই লেবুর গাছ টবে বা গামলায় রাখিয়া থাকেন। টবে থাকিলে গাছগুলি দুই হাতের অধিক উচ্চ হয় না, কিন্তু জমিতে পুতিয়া দিলে ৬.৭ হাত উচ্চ হয় এবং ঝাড়াল হইয়া প্রচুর ফল ধারণ করে। কলিকাতার উত্তর-উপকণ্ঠে বারাকপুর যাইবার পথে আমার এক বন্ধুর বাগানে কয়েকটী কামকোয়াট গাছ ভূমিতে রোপিত আছে। গাছগুলিতে এত ফল হইয়াছে যে, দেখিলে অবাক হইতে হয়। উহার ফলে জারক-লেবু বা অপর চাটনি হইতে পারে। চীন দেশের লোকে ইহাতে আচার তৈয়ার করে। কমলা জাতীয় লেবুর চারার সহিত ইহার জোড় বা চোক কলম করিতে হয়।

Citrus acida (Lime) কাগজী, পাতি, গোঁড়া প্রভৃতি কয়েক প্রকার লেবু একই জাতির অন্তর্গত এবং উহাদিগের আবাদ প্রণালী প্রায় একই রকম।

এই জাতির অন্তর্গত যে কয় প্রকার লেবু আছে তৎসমুদায়ই টক্ বা অম্লাক্ত। আকার ও গুণভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। গৃহস্থালী ব্যবহারের জন্য সাধারণতঃ কাগ্‌জী ও পাতি লেবুর আবাদ হয়। এতদুভয় লেবু রোগের ঔষধ, অরুচির রুচি এবং সৌখিনের আরামের জিনিস। এই জন্যই ইহাদিগকে লোকে উদ্যানে স্থান দিয়া থাকে। অবশিষ্টগুলি

তাদৃশ প্রয়োজনীয় নহে বলিয়া সচরাচর কেহ রোপণ করে না কিন্তু এই জাতীয় লেবুর গাছ বীজ, জোড়-কলম, ও গুটী বাঁধাতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহা ব্যতীত আধ-পাকা অনতিস্থুল কেঁকড়ি বর্ষাকালে মাটিতে রোপণ করিলে একমাস মধ্যেই তাহাতে শিকড় জন্মে। উক্ত কেঁকড়ির পাদদেশে কাণ্ডের কিয়দংশ (heel) সংলগ্ন থাকিলে শীঘ্র শিকড় উদ্গত হয়। বীজ বা কলম উৎপন্ন করিবার সময়,—বর্ষাকাল। উদ্যানের সাধারণ জমিতেই ইহা জন্মে, কিন্তু যে জমিতে বালির ভাগ অধিক, তদপেক্ষা দো-আঁশ ও দুধে-এঁটেল মাটিতে ভালরূপে জন্মে। এজন্য বেলে মাটি পরিত্যাগ করিয়া শেষোক্ত প্রকারের রসা মাটি নির্বাচন করিয়া ক্ষেত্র বা উদ্যান মধ্যে ৮।৯ হাত অন্তর গাছ রোপণ করিতে হইবে। রোপণ-কালে মাটির সহিত পুরাতন রাবিশের গুঁড়া এবং সার মিশাল করিয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়। লেবু গাছ হেলাইয়া পুতিলে বিস্তৃতাকার ধারণ করে এবং তাহাতে প্রচুর ফল জন্মিয়া থাকে।

কার্ত্তিক-অগ্রহয়ণ মাসে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া শিকড় বাহির করিয়া ১০।১৫ দিবস রাখিয়া পরে যথা নিয়মে গোবর-সার ও মাটি দিতে হইবে। মাঘ মাসে গাছে ফুল ধরে। এই সময়ে গোড়ায় রসাভাব হইলেই ফুল ও ফল ঝরিয়া যায়, এজন্য সপ্তাহে একবার করিয়া জল সেচন করা বিশেষ প্রয়োজন। বৈশাখ মাস হইতে লেবু ব্যবহার করিবার উপযোগী হয়। লেবুর আবাদ করিয়া বার মাস বাজারে উহার আমদানী রাখিতে পারিলে বিশেষ লাভবান হওয়া যায়। শাতি লেবুর

রসে লাইম যুশ (Lime juice) নামক আরক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই আরক অনেক রোগের ঔষধ। কলিকাতা সহরে খ্যাতনামা ডাক্তার ৺কানাইলাল দে রায় বাহাদুর প্রতি বৎসর এই আরক তৈয়ার করিবার জন্য বিস্তর পাতি লেবু খরিদ করিতেন। এই শ্রেণীর কয়েকটী লেবুর বিশেষ বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল ;—

পাতি।—ইহা দুই প্রকারের দেখা যায়। এক প্রকার গোল এবং অন্ত প্রকার বালিশের ন্যায় ঈষৎ লম্বা হয়। আস্বাদ টক।

কাগ্‌জী।—আকার লম্বা ও প্রায় তিন ইঞ্চি বড় হয়। ইহাই সাধারণতঃ বিশেষ আদৃত।

গোঁড়া বা জম্বিরা।—ইহাদিগের আকার গোল বা ঈষৎ লম্বা হয়। অতিশয় টক, অজীর্ণ রোগে ইহার রস বড় উপকারী। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে গোঁড়া লেবু হইতে রস নির্গত করিয়া সেই রসকে অগ্নিকে জ্বাল দিলে গুড়ের ন্যায় এক প্রকার ঘন পদার্থ উৎপন্ন হয়। ইহাকে 'চুক্' বলে। শিশি বা বোতল মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলে উক্ত চুক্ অবিকৃতাবস্থায় বহুকাল থাকিতে পারে। প্লীহা, যকৃত, পুরাতন জ্বর ও অজীর্ণ রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

চীনে গোঁড়া।—গোঁড়া লেবুরই জাতিবিশেষ, তবে উহাপেক্ষা ছোট হয়। ছাল পাতলা ও সুগন্ধযুক্ত।

কামরাঙ্গা।—বড় ও সুন্দর ফল। গোঁড়া লেবুর ধরণে গঠিত। ছাল মসৃণ।

টাবা।—আকার গোল ও বৃহৎ হয়। খোসা কাল।

কমলা।—Citrus Auratum (orange) ভারতবর্ষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কমলা জন্মিয়া থাকে, কিন্তু আসামের খাসিয়া-পাহাড়, ডিব্রুগড় জেলা এবং শ্রীহট্টে যে লেবু জন্মে তাহা এতদঞ্চলের মধ্যে উৎকৃষ্ট। তথাকার কমলার খোসা যেমন পাত্‌লা, আঘ্রাণ তেমনি মনোহর, আস্বাদও সুমিষ্ট। ইহার কোয়া রসে পরিপূর্ণ এবং একটী লেবু খাইলে প্রাণ শীতল হইয়া যায়। অগ্রাহয়ণ মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত কলিকাতায় রাশি রাশি শ্রীহট্ট কমলা আমদানী হয়। কিন্তু সে সকল কমলা সুপক্ক নহে, এইজন্য সুমিষ্ট হয় না। বড়দিন পর্ব্ব উপলক্ষে সাহেবদিগকে উপঢৌকন দিবার এবং আত্মীয় কুটুম্বদিগকে তত্ত্ব-তাবাস করিবার ইহা একটী প্রধান অঙ্গ। এই সময়ে দারজিলিং অঞ্চল হইতে অনেক কমলার আমদানী হয়। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে নাগপুর হইতেও ঐ লেবু কলিকাতায় আসিয়া থাকে। দারজিলিং ও নাগপুর,—উভয় স্থানেরই লেবুর খোসা পুরু এবং রস অম্ল।

উহার খোসা পুরু ও ফাঁপা, এবং কমলার আকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। উদ্যান মধ্যে সকল জাতীয় লেবু রাখিতে হইলে ভাল মন্দ বিচার না করিয়া সকলকেই স্থান দেওয়া উচিত। নাগপুরের সান্তারা জাতীয় লেবু বৎসর মধ্যে দুই বার ফলে,—একবার মাঘ মাসে এবং অন্য বার আষাঢ় মাসে। দুই বার ফল ধারণ করিলে গাছ দুর্ব্বল হয় এবং ফলও পরিপুষ্ট বা মিষ্ট হয় না। স্বতঃই যদি দুইবার ফলে তাহাতে আপত্তির কারণ নাই কিন্তু জবরদস্তি করিয়া দুইবার ফলাইবার চেষ্টা করা উচিত নহে।

সাহারাণপুর হইতে অম্বালা প্রভৃতি স্থানে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ও কমলার যথেষ্ট আমদানী। এখানকার কমলায় শ্রীহট্ট কমলা অপেক্ষা অনেক বড়। তথায় ইহা সান্তারা নামে অভিহিত। পঞ্জাবী সান্তারার কোয়া বড় এবং স্বাদ মধুর। পাইকারী বিক্রয় দর ৫৲ হইতে ৬৲ টাকা, খুচরা দাম ৵১০ হইতে ৶০ আনা যোড়া।

দাক্ষিণাত্যের মধ্যে মহীশূর রাজ্যে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে কমলা পাওয়া যায়। এখানকার কমলা, পঞ্জাবী কমলার সমতুল্য না হইলেও, শ্রীহট্ট কমলা অপেক্ষা বড়, স্বাদ অপেক্ষাকৃত অধিক মধুর। ইহার বিশেষত্ব এই যে, কোয়ার শাঁস, খোসা হইতে সহজে স্বতন্ত্র করিতে পারা যায়।

পাথুরে চুণ ও বেলে পাথরবিশিষ্ট জমি এবং সর্দ্দিময় হাওয়া-বিশিষ্ট স্থানই কমলার প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট স্থান। এ সকলই উল্লিখিত কয় স্থানে মিলে সুতরাং তথায় কমলাও ভাল জন্মে। যে স্থানে বৎসর মধ্যে একশত ইঞ্চ বা ততোধিক বারিপাত হয়, তাহাকে আমরা সর্দ্দিময় স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করি। দারজিলিং ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে উক্ত পরিমাণ বারিপাত হয় সত্য কিন্তু উহার শৈত্যাধিক্যবশতঃ কমলার সেরূপ সুস্বাদ হয় না। নাগপুরেও বৃষ্টির অভাব আছে, এজন্য তথাকার লেবুও সেরূপ রসাল, সুমিষ্ট ও সুতার হয় না। প্রকৃত পক্ষে দেখা যায় যে, যে সকল দেশে উত্তম চা জন্মিয়া থাকে, কমলালেবুও তথায় উত্তম জন্মে।

অনেকে অনেক রকম চেষ্টা করিয়াও বাঙ্গলায় সুচারুরূপে উহার ফল জন্মাইতে পারেন নাই। মুরশিদাবাদের নবাবী আমলে নৌকা বোঝাই করিয়া শ্রীহট্ট হইতে মাটি আনাইয়া তাহাতে

কমলার গাছ রোপিত হইয়াছিল, তথাপি সেরূপ লেবু জন্মাইতে পারা যায় নাই। সকল ফলেরই একটা স্বাভাবিক জন্মস্থান আছে এবং স্ব স্ব জন্ম স্থানে তাহারা বিনা যত্নে উত্তম ফল প্রদান করিয়া থাকে, অথচ স্থানান্তরে গিয়া সহস্র যত্ন পাইলেও সেরূপ করে না। তবে, সকল স্থানে যত্ন বিফল হয় না। সম্পূর্ণ না হইলেও কতক পরিমাণে সাফল্য লাভ হইয়া থাকে। প্রায় ১৭ বৎসর অতীত হইল আমি একবার আসামের পূর্ব্ব সীমান্তর্গত নাগা পাহাড়ে গিয়াছিলাম। সে সময় বৈশাখ মাস। এ সময়ে কোন কোন সাহেবের বাগানে কমলা-লেবুর গাছ দেখি। উক্ত বৃক্ষ সকল তখন সুপক্ব ফলে পূর্ণ। সেই সকল গাছপাকা ফল এত মিষ্ট ও যে, তাহার স্বাদ এখনও ভুলিতে পারি নাই। উক্ত স্থানের নাম মার্গেরেটা এবং তাহার বার্ষিক বারিপাত গড়ে ৪০০ চারিশত ইঞ্চ হইতেও অধিক।

অষ্ট্রেলিয়ার 'নেভাল অরেঞ্জ' নামক কমলা অতি বিখ্যাত। উহার আকার, ও স্বাদ উৎকৃষ্ট। মহীশূরে উক্ত অরেঞ্জ যথেষ্টরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

মুরসিদাবাদের হুমাউন-মঞ্জিল নামক বাগানে অনেক কমলা লেবুর গাছ আছে। তাহাতে ফল হয় সত্য কিন্তু শ্রীহট্টের কমলার ন্যায় পুষ্ট ও আস্বাদবিশিষ্ট হয় না এবং গাছের আকার ও তেমন সুশ্রী নহে। বৈইসবাগে নানাজাতীয় লেবুর গাছ রোপণ করিয়াছিলাম কিন্তু তথাকার মাটি এত নিরস, (অন্ততঃ লেবুর পক্ষে) এবং হাওয়া এত শুষ্ক যে তথায়, লেবুগাছ আদৌ স্ফূর্ত্তিলে বাড়িতে পারে না। অধিক কি, দেশীয় কাগজী বা পাতি লেবুও তথায় ভাল হয় না।

যাহা হউক, ইহার গাছ রোপণ করিতে হইলে কলমের গাছই রোপণ করা ভাল। কলমের গাছও যখন স্থানান্তরে গিয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, তখন বীজের গাছে যে ততোধিক হইবে সে বিষয়ে সংশয় কি? কমলালেবু যখন স্থানান্তরে গেলে স্বীয় প্রকৃতি ভুলিয়া যায়, তখন আমার মনে হয়, স্থানীয় গোঁড়া, পাতি বা কাগজীর সহিত কমলার জোড় বাঁধিলে যে কলম উৎপন্ন হয়, তাহা অন্ত দেশে জন্মিতে এবং তদনুরূপ ফল প্রদান করিতে পারে।

আষাঢ় মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত জমিতে গাছ রোপণের সময়। রোপণের পূর্ব্বে দুই তিন হাত জমির মাটি একহাত-গভীর খনন করতঃ সেই মাটির সহিত উত্তম সার মিশাইতে হইবে। তদনন্তর গর্ত্তমধ্যে কয়েক খণ্ড হাড়ের টুকরা সাজাইয়া তদুপরে গাছ বসাইয়া সেই মাটি দ্বারা গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া দিবে। গাছের গোড়ায় হাড় থাকিলে গাছ সবল হয় এবং ফল সুমিষ্ট হয়। গাছ পুতিবার পরে উহাকে যত্নসহকারে লালন-পালন করিতে হইবে। এক প্রকার পোকায় উহার পাতা খাইয়া ফেলে, এজন্য পাতার উপরে টার্পিন তৈলের ছিটা দিলে কিম্বা ছাই ছড়াইয়া রাখিলে পোকায় আর পাতা খাইতে পারে না।

আশ্বিন মাসের প্রথমভাগে দুই হাত ব্যাস ব্যাপিয়া গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিবে এবং গোড়ার মাটি তুলিয়া গাছের শিকড় বাহির করিয়া দিন পনর রাখিয়া দিতে হইবে। অনন্তর উক্ত নির্দ্দিষ্ট কাল উত্তীর্ণ হইলে মাটির সহিত উত্তম জৈবী সার, মানুষের মল মূত্র বা গোময়ের সহিত অস্থিচূর্ণ মিশ্রণ করিয়া গাছের গোড়ায় দিতে হইবে। গাছে ফল থাকিলে যথেষ্ট

পরিমাণে জল দিবে।

স্থানীয় জলবায়ু যেখানে ইহার অনুকূল, এরূপ স্থানের কমলা লেবুর আবাদ করা উচিত, নতুবা প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া অর্থ বিষয়ে লাভবান্ হওয়া সুকঠিন। সখের বাগানের পক্ষে অর্থের বিবেচনা অতি সামান্য, সুতরাং সে স্থলে আমাদিগের কোন বক্তব্য নাই।

আষাঢ় হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত ইহার কলম বাঁধিবার সময় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহার জোড় বা চোক-কলম করা উচিত। এতদুভয় প্রকার কলমের জন্য দেশী সাধারণ কমলার বীজোৎপন্ন চারা উপযোগী।

সপেটা

Achras Sapota.

SAPOTA

দক্ষিণ আমেরিকার উষ্ণপ্রধান অংশে ইহার স্বাভাবিক জন্ম স্থান। এদেশে অতি অল্প বাগানে সপেটা গাছ দেখা যায়। সপেটা দুই প্রকারের দেখা যায়,—এক গোল, অপর ডিম্বাকার কিন্তু গোল জাতীয়ই সচরাচর দেখা যায়।

সপেটার গাছ বৃহৎ হয় এবং ইহার পাতাগুলি প্রায় লিচু পাতার ন্যায় এবং গাছ দেখিতে অতি সুন্দর। ফলগুলির আকার ছোট গোল আলুর ন্যায়, কিন্তু মিষ্ট ও রসযুক্ত। সাহেবেরা

ইহা বড়ই ভাল বাসেন। সপেটা উত্তমরূপে না পাকিলে খাইতে সুস্বাদ হয় না।

খোলা ময়দান অপেক্ষা চারিদিক বৃক্ষাদি দ্বারা বেষ্টিত স্থানে সপেটার গাছ ভাল হয়। ইহার জন্য দো-আঁশ মাটির আবশ্যক, কিন্তু সকল প্রকার মাটিতেই জন্মে। দো-আঁশ মাটির গাছের ফল অধিকতর সুস্বাদ হয়।

বীজে ও জোড় কলমে চারা হয়। বীজের চারা ফলিতে অনেক বিলম্ব হয়। ক্ষীরণী কিম্বা মহুয়ার চারার সহিত ইহার জোড় কলম বাঁধিতে হয়।

আষাঢ় মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত ইহা ফলিয়া থাকে। ইহার বিশেষ কোন প্রকার পাট নাই। অপরাপর গাছকে যে নিয়মে আবাদ করা যায়, ইহার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

লিচী

Nephelium Lichi

LICHI

চলিত ভাষায় ইহাকে লিচু কহিয়া থাকে। চীন দেশ ইহার আদি উৎপত্তি স্থান কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালের উপযোগী ইহা একটী উৎকৃষ্ট ফল, সুতরাং সকল বাগানেই স্থান পাইবার যোগ্য। বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা মজাফ্ফরপুরে যে লিচু জন্মে তাহা অধিকতর সুমিষ্ট এবং

স্থানীয় জলবায়ু ও মাটির গুণে তথাকার ফল অপেক্ষাকৃত বড় হইয়া থাকে।

লিচু গাছের পাতা ৫।৬ ইঞ্চ লম্বা হয় এবং পাতার বর্ণ ঘোর সবুজ। শাখাপ্রশাখা ও পত্রবিন্যাস অপেক্ষাকৃত ঘন। সেই জন্য গাছগুলি দেখিতে বড় মনোহর, এবং সেই কারণে উদ্যানের মধ্যে রোপিত হইলে স্থানীয় শোভা বৃদ্ধি হয়। আবার, যখন থলো থলো ফল পাকিয়া উঠে, তখন গাছের যে কি মনোহর শ্রী হয় তাহা বর্ণনাতীত। সৌখীনের বৃহদায়তন প্রমোদোদ্যান মধ্যে ঘন ছায়াবৃত পথ বা avenue কিম্বা তৃণমণ্ডল মধ্যে বিরাম বা কেলীকুঞ্জ রচনার্থে লিচুবৃক্ষ বিশেষ উপযোগী। বাজে বিলাতী গাছ অপেক্ষা ঈদৃশ বৃক্ষ রোপণে লাভ আছে।

গুটী ও দাবাতে ইহার কলম হইয়া থাকে। বীজেও চারা হয় কিন্তু বীজ-গাছের ফলের গুণাগুণ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা থাকে, এবং ফলিতে অপেক্ষাকৃত বিলম্ব হয়, এজন্য গুটী বাঁধিয়া সচরাচর চারা উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। আষাঢ় মাসের প্রথমেই গুটী বাঁধিতে হয়। বর্ষার অভাব হইলে গুটী-পিণ্ডের উপরে জল পূর্ণ ছিদ্র কলস বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক। উক্ত পিণ্ড সর্ব্বদা ভিজা থাকিলে একমাসের মধ্যেই উহা কাটিবার উপযোগী হয়। পিণ্ড ভেদ করিয়া শিকড় বাহির হইলে অনেকে সেই পিণ্ডের উপরে দ্বিতীয় বার মাটি দিয়া থাকে, কিন্তু ভালরূপে শিকড় বাহির হইয়া থাকিলে দ্বিতীয় বার মাটি দিবার আবশ্যক হয় না।

দাবা-কলম করিলে তাহাকে সর্ব্বদা ভিজাইয়া রাখা উচিত। কলম তৈয়ার হইলে একবারে না কাটিয়া দুইবার 'ছে' দিয়া পরে একবারে কাটিয়া লইলে কলম অধিক কষ্ট পায় না।

কলম বৈকালে কাটিয়া সমস্ত রাত্রির জন্য পুষ্করিণীতে বা কোন জলপাত্রে ডুবাইয়া রাখিয়া পর দিবস অপরাহ্নে ছায়াবিশিষ্ট হাপোরে পুতিয়া রাখিতে হয়। হাপোরে কলমগুলি পুতিবার অগ্রে গুটীর বন্ধন খুলিয়া দেওয়া উচিত। হাপোরে বসাইবার পরে উহাদিগের আদৌ জলাভাব না হয়, এজন্য যখন তাহাতে জল দিতে হয়, তখন প্রচুররূপে দেওয়া কর্ত্তব্য। হাপোরে কিছু দিন থাকিয়া কলমগুলি সামলাইয়া উঠিলে ক্ষেত্রে রোপণ করা যাইতে পারে। আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে সেই কলম ২৫ হইতে ৩০ হাত অন্তর রোপণ করিতে হয়। পূর্ব্ব বৎসরের কলম তৈয়ার থাকিলে, বর্ষার প্রারম্ভেই জমিতে রোপণ করা উচিত। কেন না, তাহা হইলে সম্মুখে বর্ষা পাইয়া গাছগুলি অল্প দিন মধ্যেই মাটিতে সংলগ্ন হয়। মাটিতে চারা পুতিবার সময় উহার সহিত উত্তম সার মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। প্রথম দুই তিন বৎসর চারা গাছে নিয়মিতরূপে জল সেচন করা উচিত। কার্ত্তিক মাসে গাছের গোড়া কোপাইয়া এবং মাটি চূর্ণ করিয়া গাছের গোড়ায় সার দিতে হইবে, কিন্তু এই সময়ে গাছে ছেঁচে দেওয়া কোন মতে কর্ত্তব্য নহে, কারণ তাহা হইলে গাছে শীঘ্র মুকুল আসিবে না এবং অনেক সময়ে আইসেও না। লিচুর পক্ষে অস্থিচূর্ণ ভাল সার। গাছের তলায় সার প্রসারিত করতঃ মাটিকে দুই তিন বার কোপাইয়া দিলে সার মাটির সহিত মিশিয়া যায় এবং তাহাই করা কর্ত্তব্য। বর্ষার প্রাক্কালই সার প্রয়োগের সময়। গাছের নিম্নভাগে ডাল-পালা ঝুলিয়া থাকিলে, এমন করিয়া কাটিয়া দিতে হইবে যে, গাছ তলায় যথেষ্ট রৌদ্র, আলোক ও বাতাস প্রবেশ করিতে পারে। পৌষ মাঘ মাসে

গাছে মুকুল ধরে এবং সেই মুকুল যখন ফলে পরিণত হইবে তখন গাছের গোড়ায় মাসে দুই তিনবার উত্তমরূপে জল দিবে। এই সময়ে গাছে রসের অভাব হইলে ফল ঝরিয়া যায় এবং যে ফলগুলি গাছে থাকিয়া যায়, তাহার আঁটি বড় হয় ও শাঁস পাতলা হয়। এ ছাড়া ফলে মিষ্টতাও থাকে না।

মুকুল ফলে পরিণত হইলে এবং ফলগুলি ঈষৎ বড় হইলে গাছগুলি জাল দিয়া ঘেরিয়া না দিলে কাক ও অন্যান্য অনেক পক্ষীতে ফল নষ্ট করে। কাটবিড়াল ও ইন্দুরেও অনেক ফল নষ্ট করে, এজন্য লিচুর বাগানে ফল হইবার সময় সর্ব্বদা পাহারা দিতে হয়। কার্য্য সহজ করিবার জন্য ফলের সময়ে লোকে লিচু-বাগানে ফাটা বাঁশ বা টিনের শব্দ করে। এই আওয়াজের ভয়ে কোন জন্তু আর গাছের কাছে যাইতে ভরসা করে না। লিচু-ব্যবসায়ীগণ রাত্রিকালেও সেই স্থান আগুলিয়া থাকে। বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দুই সপ্তাহ মধ্যে লিচু পাকিয়া উঠে। পাকিলে উহার খোসা লালবর্ণ ধারণ করে।

আজকাল নিম্নলিখিত কয়েক জাতীয় লিচু প্রচলিত আছে। চীনে, মজঃফরপুরে, বোম্বাই ও সবজা। ঝারবঙ্গে উত্তম লিচু জন্মে।

সবজা লিচু পাকিলেও তাহার বর্ণ সবুজ থাকে এবং উহা পাকিতে বিলম্ব হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত উহার পাকিবার সময়।

ঝারভাঙ্গার লিচু যেমন শাঁসাল, রসালও মধুর, তেমনি বীজও পাতলা হইয়া থাকে, কিন্তু ফল অধিক দিন স্থায়ী হয় না,

সুতরাং স্থানীয় ব্যবহারের পক্ষে ভাল। মজঃফরপুরের লিচুর এ সকল গুণ ত আছেই, তাহা ব্যতীত অধিক দিন স্থায়ী হয় বলিয়া স্থানান্তরে প্রেরণ করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যত্ন করিয়া রাখিতে পারিলে মাসাধিক কালের অধিক থাকে।

লিচু গাছের পাতায় এক প্রকার রোগ হয় এবং তাহাকে কৌকড়া-রোগ কহে। উক্ত রোগের লক্ষণ এই যে, পাতার নিম্ন পৃষ্ঠে এক প্রকার লাল গুড়াবৎ পদার্থ জন্মে। ইহাতে গাছের পাতা কোঁকড়াইয়া যায়। দুই চারিটী পাতায় এই রোগ দেখা গেলে সেই পাতাগুলি অচিরে ভাঙ্গিয়া না দিলে সেই রোগ গাছময় ব্যাপিয়া পড়ে। ইহাতে গাছ খারাপ হয় এবং ফলে রোগ জন্মে। আক্রান্ত পত্র সমূহে যে গুঁড়াবৎ পদার্থ পত্রসংলগ্ন হইয়া থাকিতে দেখা যায় তাহা কীটাণু বিশেষ। আরাক্নিডা আকারিণা (Aracnida acarina) নামক ক্ষুদ্র পতঙ্গ পত্রে ডিম্ব প্রসব করে। উক্ত লাল গুঁড়া তাহাই। আক্রান্ত পত্রসমূহকে সংগ্রহ করিয়া অগ্নিদগ্ধ করা উচিত।

লিচুর বীজগুলি এক্ষণে অনর্থক নষ্ট হয় কিন্তু উহা ব্যবহারে আসিলে অর্থাগম হইতে পারে। লিচুর বীজ,—তৈলদ। বীজ হইতে তৈল নিষ্ক্রামণ করিয়া লইলে সেই তৈল দ্বারা অনেক কার্য্য হইতে পারে, অতঃপর যে খইল অবশিষ্ট থাকে তাহা গবাদি পশুতে খাইতে পারে।

গোলাপ জাম

EUGINIA JAMBOSA

Rose apple

সুপক্ক গোলাপ জাম দেখিতে যেমন মনোহর, খাইতেও তেমনি সুমিষ্ট। তার ফল ভক্ষণকালে উত্তম গোলাপ-জলের ন্যায় গন্ধ নির্গত হয়। মাঘ মাসে গাছে ফুল ধরে এবং বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ফল পাকিয়া থাকে। কাঁচা অবস্থায় ফলে সবুজ রং থাকে কিন্তু উহা যত পরিপুষ্ট হইয়া পাকিতে থাকে, ততই সে বর্ণ দূর হইয়া গোলাপী বর্ণ ধারণ করে।

বাগানের সাধারণ জমিতেই গোলাপ-জাম জন্মিয়া থাকে। সরস ও অধিকতর উচ্চ ভূমিতে উহা ভাল হয় না। অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া সার দিতে হয় এবং গাছে ফল ধরিলে গোড়ায় সপ্তাহে একবার উত্তমরূপে জল দিলে ফল সুপুষ্ট ও মিষ্ট হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই প্রায় ইহার ফল শেষ হইয়া যায়। তখন ইহার গোড়া একবার কোপাইয়া দিলে বর্ষার জল পাইয়া গাছ সতেজ হইয়া উঠে।

গাছে ফল ধরিলে ফলগুলিকে ছেঁড়া কাপড় বা চট দিয়া বাঁধিয়া দিলে ফলের কোমলতা নষ্ট হয় না, অধিকন্তু আরও সরস ও রসযুক্ত হয়।

গুটি কলমে ও বীজে ইহার চারা জন্মিয়া থাকে। বর্ষাকালে গুটি বাঁধিতে হইবে। প্রতিদিন বৃষ্টি পাইলে অথবা গুটি ভিজা থাকিলে ২০।২৫ দিনের মধ্যে শিকড় উৎপন্ন হয়। বীজও

এই সময় বপন করিতে হয়। বীজের চারা চাপোরে তৈয়ার করিয়া পরে ক্ষেত্রে স্থায়ীরূপে রোপণ করিতে হয়। বীজের হউক বা কলমের হউক, বর্ষা থাকিতে অথবা কার্ত্তিক মাসের মধ্যে গাছ গুলিকে জমিতে বসাইতে হয়।

জামরুল

EUGINIA ALBA

White apple or Star apple

গ্রীষ্মের উত্তাপের দিনে জামরুল বড় আরামের জিনিস। ভাল করিয়া আবাদ করিলে এক একটী ফল বড় সোডার ভাব হইয়া থাকে এবং এতই রসপূর্ণ হয় যে, দুই একটী খাইলেই তৃষ্ণাতুরের তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

চৈত্র মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত ইহাতে ফল হয়। ফল যে একবারেই হয় তাহা নহে। মাঘ মাসে এক দফা ফুল হইয়া বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ফল হয়। সেই সঙ্গে আর এক দফা ফুল হয়, এবং তাহা হইতে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ফল হয়। এইরূপে জামরুল গাছে কয়েক মাস অবিশ্রান্ত ফল হইয়া থাকে। কোন কোন গাছ গ্রীষ্মকালে একবার মাত্র ফল প্রদান করে। দ্বিতীয় প্রকার গাছ গ্রীষ্মকালে বৈশাখ মাসে এবং আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ফল ধারণ করে। শেষোক্ত গাছ দো-ফলী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দো-ফলী গাছের শেষবারের ফল—সংখ্যায় অধিক

হয়, ফলের আকার বড় হয়, ফল রসাল হয় কিন্তু গ্রীষ্মকালের ফলের মত সুমিষ্ট হয় না। যত দিন না সুপক্ক হয়, ততদিন ফলের বর্ণ অল্পাধিক সবুজ থাকে কিন্তু সুপক্ক হইলে শুভ্রবর্ণ ধারণ করে।

জামরুল গাছের বিশেষ কোন তদ্বির নাই, তবে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে গাছের তলায় লাঙ্গল এবং গোড়ায় সার দিলে গাছের উপকার হয়। ফলের সময়ে গোড়ায় জল দিলে ফল বড় হইয়া থাকে।

কেঁকড়ি, বীজ ও গুটী কলমে ইহার চারা হয়, কিন্তু সচরাচর লোকে গুটী কলমেই চারা করিয়া থাকে। বর্ষাকাল—কলম বাঁধিবার সময়। ইহার কলম অতি শীঘ্র জন্মে এবং গাছ অল্প দিন মধ্যেই বৃহদাকার ধারণ করে। কুড়ি হাত অন্তর গাছ রোপণ করিতে হয়।

জামরুলের অন্য এক জাতি আছে, তাহার ফলের বর্ণ লাল কিন্তু স্বাদ সাদা জামরুলের ন্যায় সুমিষ্ট নহে, তবে সৌখীন-গণ রকমের জন্য বাগানে রোপণ করিয়া থাকেন। ইহার সমুদায় পরিচর্য্যা সাদা জামরুলের ন্যায়।

পীচ

AMYGDALUS PERSICA

Peach

পীচ অতি সুখরোচক ফল কিন্তু ভারতবাসীগণের নিকট এখনও ইহার তাদৃশ আদর হয় নাই। ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় ইহার যথেষ্ট আবাদ হয়। সাহেবদিগের সখ ও চেষ্টায় এক্ষণে কতক বাগানে পীচ গাছ দেখা যায়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে পীচ পাকিয়া থাকে। অতিরিক্ত পাকিয়া গেলে খাইতে তত আরাম হয় না, কিন্তু ডাঁশা অবস্থায় কিছু পরে খাইলে উত্তম লাগে। পাকা ফলের অভ্যন্তর সিন্দুরের ন্যায় ঘোর লাল হয়।

বীজ, জোড়কলম ও চোক-কলমে ইহার চারা জন্মিয়া থাকে। বীজের চারা বিলম্বে ফলে এবং ফলেরও পূর্ব্বতন স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা। এই সকল কারণে লোকে ফলের জন্য ইহার বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করে না। বীজের চারা, চোক-কলম ও জোড়-কলম বাঁধিতে আবশ্যক হয়। আষাঢ় মাসে বীজ বপন করিতে হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইতে এক মাস কি দেড় মাস সময় লাগে কিন্তু বীজগুলিকে সাবধানতার সহিত কাটাইয়া মাটিতে রোপণ করিলে অল্পদিন মধ্যে অর্থাৎ ২।৩ সপ্তাহে অঙ্কুরিত হয়। বীজের খোলা অতিশয় কঠিন, এই জন্য অঙ্কুরিত হইতে এত বিলম্ব হয়।

চারাগুলি ঈষৎ বড় ও বলিষ্ঠ হইলে তাহাদিগকে হাপোর হইতে তুলিয়া ছোট টবে বা অন্য হাপোরে পুতিয়া যথা নিয়মে

পালনপালন করিবে। হাপোর হইতে চারা তুলিবার সময়ে উহাদিগের মূলশিকড় সাবধানতার সহিত কাটিয়া দিলে, ভবিষ্যতে গাছ আর মৃত্তিকার নিম্নদেশে অধিকতর শিকড় প্রসারিত করিতে না পারিয়া উপরিভাগের সন্নিকটে থাকে। মাটির নিম্নদিকে অধিকদূর শিকড় প্রবেশ করিলে গাছ লম্বভাব ধারণ করে এবং তাহাতে অধিক ফলও ধরে না।

আষাঢ় মাস হইতে ভাদ্র মাস পর্যান্ত জোড়-কলম ও চোক-কলম বাঁধিবার সময়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই দুই কার্য্যের জন্য বীজের চারা আবশ্যক। চারাগুলির কাণ্ড,—অন্ততঃ কাণ্ডের নিম্নাংশ সুপুষ্ট ও অর্দ্ধ পরিপক্ক না হইলে কলম করিবার সুবিধা পাওয়া যায় না। সংক্ষেপতঃ কলমের জন্য অন্ততঃ দুই বৎসরের পরিপুষ্ট চারার আবশ্যক। টব সমেত চারার সহিত যদি কলম বাঁধা যায়, তাহা হইলে কলম তৈয়ার হইলে উহাকে কাটিয়া আনিয়া আপাততঃ কয়েক দিবস ছায়াযুক্ত স্থানে রাখিয়া দিবে। অনন্তর কলমগুলি সাম্‌লাইয়া উঠিলে জমিতে রোপণ করিতে হইবে। টবের গাছে যদি চোক বসান যায় তাহা হইলে টব ছায়ায় রাখিতে হইবে এবং চোক ফুটিয়া শাখা বাহির হইলে এবং কিঞ্চিৎ বলিষ্ঠ হইলে একেবারে জমিতে পুতিয়া দিতে ক্ষতি নাই। আষাঢ় মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত জমিতে গাছ পুতিবার প্রশস্ত সময়।

বর্ষাকাল অতিক্রম হইলে অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে পীচ গাছের ছায়াগত স্থানের মাটি খুঁড়িয়া শিকড় বাহির করিয়া দিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে গাছের বয়ঃক্রম অনুসারে আধ হাত হইতে এক হাত পর্য্যন্ত গভীর করিয়া মাটি তুলিয়া ফেলিতে হয় এবং মোটা মোটা

শিকড়গুলি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। গোড়া খুঁড়িবার সময় অনেক সূক্ষ্ম শিকড় কাটা যায়, তাহাতে ক্ষতি নাই। এইরূপ অবস্থায় গাছগুলিকে দুই সপ্তাহ হইতে চারি সপ্তাহ পর্য্যন্ত রাখা আবশ্যক। অনন্তর গাছ হইতে পাতাগুলি আপনা হইতেই ঝরিয়া পড়িবে। অতঃপর গাছের শাখাপ্রশাখা ছাঁটিবার (Prunning) সময়। শাখাপ্রশাখা ছাঁটিবার একটি প্রণালী আছে। প্রণালী মত না ছাঁটিয়া যদৃচ্ছাক্রমে ছাঁটিলে গাছগুলির যে কেবল আকার বিশ্রী হইয়া যায় তাহা নহে, ফলনের বিপর্য্যয় ঘটে এবং ফলের আকার ও স্বাদের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। গাছটী ছাটিবার পূর্ব্বে তিনটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই সচরাচর লোকে সে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া আপন ইচ্ছামত গাছের অঙ্গে অস্ত্রচালনা করিয়া থাকেন। গাছের ভাবী আকার, গাছের বর্ত্তমান তেজ এবং গাছের ফলন—এই তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক গাছ ছাটিতে হয়।

সকল গাছকেই নিজের ইচ্ছামত আকারে পরিণত করিতে পারা যায়, এই জন্য যেরূপ আকারে গাছকে পরিণত করিলে গাছের অনিষ্ট না হয় অথচ উহা শ্রীসম্পন্ন হইয়া ফল প্রদান ও উদ্যানের শোভা বৃদ্ধি করে তাহাই করা উচিত। কেহ গাছকে মন্দিরের ন্যায়, কেহবা গম্বুজের ন্যায়, আবার কেহ বা বিস্তৃত আকারের করিতে পছন্দ করেন। যে আকারে করিতে হইবে, সেই সেই আকারে উহার শাখাপ্রশাখা ছাটিয়া দিতে হইবে। প্রথমতঃ শুষ্ক, রুগ্ন, অকর্ম্মণ্য শাখা ও কেঁকড়ি সমুদায় কাটিয়া

ফেলিয়া অপরাপর শাখা সমূহের অর্দ্ধ পরিপক্ক স্থান অবধি রাখিয়া উপরাংশ কাটিয়া দিবে এবং দেখিবে যে ভবিষ্যতে যে শাখাপ্রশাখা নির্গত হইবে, তাহা যেন পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হইয়া গাছকে ঘন করিয়া না ফেলে।

খর্ব্ব ও রুগ্ন বৃক্ষকে অধিক পরিমাণে ছাটিয়া দেওয়া উচিত অর্থাৎ এরূপ বৃক্ষের কতকগুলি শাখা একবারেই কাটিয়া দিতে হইবে এবং অবশিষ্ট শাখা সমূহের প্রত্যেকের একাংশ রাখিয়া বহিরাংশ ছাটিয়া দিতে হইবে কারণ, অল্প শক্তি বশতঃ উহা অধিক সংখ্যক শাখাপ্রাশাখার পোষণোপযোগী রস সঞ্চয় করিতে পারে না।

সুপুষ্ট ও বলবান গাছকে অধিক পরিমাণে ছাটিয়া দিলে ফল বড় হয়, কিন্তু পরিমাণে অল্প হয়; আর অল্প পরিমাণে ছাটিলে ফল অধিক হয় কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত ছোট হয়। এক্ষণে মূল সূত্র কয়টির প্রতি লক্ষ রাখিয়া বিশেষ বিবেচনার সহিত গাছ ছাটিতে হইবে।

গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার তিন চারি সপ্তাহ মধ্যে উহা দিগকে ছাটিয়া দিয়া মাটির সহিত সার মিশ্রিত করিয়া গাছের গোড়ায় দিতে হয়। পীচের পক্ষে খইল, অস্থিচূর্ণ ও তেড়ী সার ইত্যাদি বিশেষ উপযোগী।

মাঘ মাসে পীচ গাছে ফুল আইসে। গাছে যাবৎ না ফল ধরে, তাবৎ মধ্যে মধ্যে অল্প পরিমাণে তাহাতে জল সেচন করিবে, কিন্তু ফল ধরিলে উহার প্রচুর জলের আবশ্যক। জলের অভাব না হইলে ফল বড় ও সুমিষ্ট হয়। পীচ গাছ হইতে সময়ে সময়ে রস নির্গত হয় এবং উহা বায়ু ও আলোক

সংস্পর্শে ঘন আটা হইয়া যায়। গাছের আটা নির্গত হওয়া একটি রোগবিশেষ। যখন গাছে এইরূপ আটা নির্গত হইতে দেখা যাইবে, তখন তীক্ষ্ণ ছুরী দ্বারা সেই স্থানের আটা পরিষ্কার করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে তথায় একটি ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র কীটের আবাস জানিয়া সেই স্থানটি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। তাহাতে যদি অসুবিধা হয় কিম্বা গাছের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সূক্ষ্ম মুখবিশিষ্ট পিচ্‌কারি দ্বারা উহার মধ্যে উষ্ণ জল দিতে হইবে। উহার সহিত তামাকের জল বা সাবানের জল মিশাইতে পারিলে আরও ভাল হয়। এইরূপে বারম্বার পিচ্‌কারি দিলে গর্তমধ্যস্থিত পোকাটী মরিয়া বাহিরে আসিবে। তখন এস্থানে একটি কাষ্ঠের পিন্ বা প্যানা মারিয়া উপরে আল্‌কাতরা মাখাইয়া দিতে হয়।

সচরাচর পীচ গাছে রাশি রাশি ফল হইয়া থাকে। সমগ্র ফল গাছে থাকিতে দিলে ফলের আকার তেমন বড় হইতে পারে না, সুতরাং সিকি হইতে অর্দ্ধেক ফল ভাঙ্গিয়া ফেলিলে ভাল হয়। গাছে ফলগুলি ঈষৎ বড় বড় হইলে কাপড় বা চট্ দিয়া বাঁধিয়া দিলে ফলের আকার বড় হয় এবং আস্বাদ কোমল ও মধুর হয়।

বিশেষ যত্ন করিয়া পীচের আবাদ করিলে বিলক্ষণ লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। ইয়ুরোপীয়গণ ইহার বড়ই পক্ষপাতী।

আজকাল এদেশে অনেক জাতীয় পীচের আমদানী হইয়াছে, তন্মধ্যে ফ্ল্যাট চায়না (Fiat China) জাতীয়ই উৎকৃষ্ট বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। কলিকাতায় ফল ব্যবসায়ী ও নর্সারী-ওয়ালাদিগের নিকট নানাজাতীয় পীচের চারা পাওয়া যায়।

কাঁঠাল

ARTOCARPUS INTEGRIFOLIA

Jack fruit

মলক্কসপুঞ্জ, সিংহল ও ভারতবর্ষ ইহার আদিম উৎপত্তি স্থান। খাজা ও নেয়ো এই দুই জাতিতে কাঁঠাল বিভক্ত। কচি কাঁঠালকে এঁচোড় কহে এবং তাহা রন্ধন করিলে অতি উত্তম তরকারি হয়।

বীজ পুতিয়া কাঁঠালের চারা তৈয়ার করিতে হয়। প্রবাদ আছে যে, কাঁঠালের চারা নাড়িয়া পুতিলে ফল ভুয়া হয় অর্থাৎ তাহার মধ্যে কোয়া জন্মে না। এই কারণে ইহার বীজ স্থায়ীরূপে যথাস্থানে রোপিত হয়। চারা নাড়িয়া পুতিলে ফল ভুয়া হয়, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব আছে। যাহা হউক, ইহার বীজ বপন করিবার পক্ষে বর্ষাকাল প্রশস্ত। সুপক্ক কাঁঠালের কোয়া মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। বীজ হউক বা চারা হউক, ক্ষেত্র মধ্যে পনর হাত অন্তর বপন করিয়া, গাছ গুলি চারি পাঁচ বৎসরের হইলে কিম্বা গাছে গাছে ঘেঁসাঘেঁসি হইবার উপক্রম হইলে, প্রতি তিনটি গাছের মধ্যস্থিত একটী গাছ কাটিয়া দেওয়া উচিত। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত কয়েক বৎসর মধ্যবর্ত্তী জমি বৃথা পতিত না থাকে। ইতিমধ্যে গাছগুলি বাড়িয়া যায় এবং তখন তাহা জ্বালানী কাষ্ঠরূপে গৃহস্থের সংসারে ব্যবহৃত হইতে পারে। যাহারা এরূপ সাশ্রয় করিতে না চাহেন, তাঁহারা ৩০।৩৫ হাত অন্তর একবারে

সংস্পর্শে ঘন আঠা হইয়া যায়। গাছের আঠা নির্গত হওয়া একটি রোগবিশেষ। যখন গাছে এইরূপ আঠা নির্গত হইতে দেখা যাইবে, তখন তীক্ষ্ণ ছুরী দ্বারা সেই স্থানের আঠা পরিষ্কার করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে তথায় একটি ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র কীটের আবাস জানিয়া সেই স্থানটি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। তাহাতে যদি অসুবিধা হয় কিম্বা গাছের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সূক্ষ্ম মুখবিশিষ্ট পিচ্‌কারি দ্বারা উহার মধ্যে উষ্ণ জল দিতে হইবে। উহার সহিত তামাকের জল বা সাবানের জল মিশাইতে পারিলে আরও ভাল হয়। এইরূপে বারম্বার পিচ্‌কারি দিলে গর্ত্তমধ্যস্থিত পোকাটী মরিয়া বাহিরে আসিবে। তখন এস্থানে একটি কাষ্ঠের পিন্ বা প্যানা মারিয়া উপরে আল্‌কাতরা মাখাইয়া দিতে হয়।

সচরাচর পীচ গাছে রাশি রাশি ফল হইয়া থাকে। সমগ্র ফল গাছে থাকিতে দিলে ফলের আকার তেমন বড় হইতে পারে না, সুতরাং সিকি হইতে অর্দ্ধেক ফল ভাঙ্গিয়া ফেলিলে ভাল হয়। গাছে ফলগুলি ঈষৎ বড় বড় হইলে কাপড় বা চট্ দিয়া বাঁধিয়া দিলে ফলের আকার বড় হয় এবং আস্বাদ কোমল ও মধুর হয়।

বিশেষ যত্ন করিয়া পীচের আবাদ করিলে বিলক্ষণ লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। ইয়ুরোপীয়গণ ইহার বড়ই পক্ষপাতী।

* আজকাল এদেশে অনেক জাতীয় পীচের আমদানী হইয়াছে, তন্মধ্যে ফ্ল্যাট চায়না (Fiat China) জাতীয়ই উৎকৃষ্ট বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। কলিকাতার ফল ব্যবসায়ী ও নর্‌সরী-ওয়ালাদিগের নিকট নানাজাতীয় পীচের চারা পাওয়া যায়।

কাঁঠাল

ARTOCARPUS INTEGRIFOLIA

Jack fruit

মলক্কসপুঞ্জ, সিংহল ও ভারতবর্ষ ইহার আদিম উৎপত্তি স্থান। খাজা ও নেয়ো এই দুই জাতিতে কাঁঠাল বিভক্ত। কচি কাঁঠালকে এঁচোড় কহে এবং তাহা রন্ধন করিলে অতি উত্তম তরকারি হয়।

বীজ পুতিয়া কাঁঠালের চারা তৈয়ার করিতে হয়। প্রবাদ আছে যে, কাঁঠালের চারা নাড়িয়া পুতিলে ফল ভূয়া হয় অর্থাৎ তাহার মধ্যে কোয়া জন্মে না। এই কারণে ইহার বীজ স্থায়ীরূপে যথাস্থানে রোপিত হয়। চারা নাড়িয়া পুতিলে ফল ভূয়া হয়, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব আছে। যাহা হউক, ইহার বীজ বপন করিবার পক্ষে বর্ষাকাল প্রশস্ত। সুপক্ক কাঁঠালের কোয়া মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। বীজ হউক বা চারা হউক, ক্ষেত্র মধ্যে পনর হাত অন্তর বপন করিয়া, গাছ গুলি চারি পাঁচ বৎসরের হইলে কিম্বা গাছে গাছে ঘেঁসাঘেঁসি হইবার উপক্রম হইলে, প্রতি তিনটি গাছের মধ্য-স্থিত একটী গাছ কাটিয়া দেওয়া উচিত। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত কয়েক বৎসর মধ্যবর্তী জমি বৃথা পতিত না থাকে। ইতিমধ্যে গাছগুলি বাড়িয়া যায় এবং তখন তাহা জ্বালানী কাষ্ঠ-রূপে গৃহস্থের সংসারে ব্যবহৃত হইতে পারে। যাহারা এরূপ সাশ্রয় করিতে না চাহেন, তাঁহারা ৩০।৩৫ হাত অন্তর একবারে

স্থায়ীরূপে ক্ষেত্রে গাছ পুতিতে পারেন।· বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিবার জন্য দুইটী প্রণালী আছে, তাহা অন্য স্থান হইতে সংগ্রহ করিতাম।

(১) সমস্ত কাঁঠাল পুতিয়া যে চারা জন্মে, তাহা সুপক্ক হওয়া চাই। তৎপরে ক্ষেত্র মধ্যে যে স্থানে স্থায়ীরূপে গাছ থাকিবে, তথায় সমস্ত একটী কাঁঠালের আয়তন মত গর্ত্ত করিয়া, বোঁটা উপরে রাখিয়া, কাঁঠালটী উত্তমরূপে পুতিয়া দিতে হয়। পাছে শৃগাল বা অপর কোন জন্তুতে খাইয়া ফেলে এইজন্য ১০।১৫ দিন সতর্ক থাকিতে হয়, ইতিমধ্যে কাঁটালটী পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তখন সেই কাঁঠালের বৃন্ত বা বোঁটা ধীরে ধীরে টানিয়া তুলিতে হইবে কিন্তু সাবধান, যেন কাঁঠাল পর্য্যন্ত না উঠিয়া আসে। বোঁটা সমেত মেরুদণ্ড বা 'ভুতি' উঠিয়া আসিলে প্রোথিত কাঁঠালের মধ্যে একটী লম্বা গর্ত্ত হয়। সেই গর্ত্তের মধ্য দিয়া কাঁঠালের মধ্যস্থিত যাবতীয় বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। তখন সেই চারা গুলিকে পাট, কলার ছোটা বা অন্য কোন নরম দড়ি দিয়া সাবধানে বাঁধিয়া দিলে অল্পদিন মধ্যে চারাগুলি পরস্পর সংলগ্ন হইয়া একটি কাণ্ডে পরিণত হয়। ঈদৃশ বৃক্ষ অমিত তেজাল ও বৃদ্ধিশীল হয় এবং শীঘ্র ফল ধারণ করে।

(২) অনন্তর বীজটি মধ্যে রাখিয়া দুই বা আড়াই হাত লম্বা একটি বাঁশের নল মাটিতে পুতিয়া, চোঙ্গ মধ্যে অল্প মাটি দিবে। দুই তিন হাত লম্বা গাঁটহীন বাঁশ পাওয়া যায় না, এজন্য ঐ পরিমাণের বংশখণ্ড লইয়া এবং তাহাকে চিরিয়া উহার অভ্যন্তরের গাঁটগুলি পরিষ্কার করিতে হইবে। তখন সেই দুই

* কৃষিতত্ত্ব ও ভারতবন্ধু, ফাল্গুন, সন ১৩০১ সাল।

খণ্ড বাঁশ বীজের উপর ঢাকা দিয়া খণ্ডদ্বয়কে উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিতে হয়। বীজ কয়েক দিবসের মধ্যে অঙ্কুরিত হয় এবং গাছটী নল ভেদ করিয়া উপরে উঠে। তখন চোঙ খুলিয়া লইয়া গাছটীকে শায়িত করিয়া চক্রাকারে ঘুরাইয়া কেবল মাত্র গাছের শিরোভাগ উপরে রাখিয়া মাটি চাপা দিবে। গাছটী আপন স্বভাবে যেমন বাড়িতে থাকিবে, সেই সঙ্গে পাক দেওয়া কাণ্ডটী বাড়িতে থাকিবে। এরূপ গাছে পাঁচ বৎসরেই ফল ধরিয়া থাকে এবং ঘুর্ণীকৃত কাণ্ডে যে ফল জন্মে তাহা অতি মিষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত ফলের সংখ্যাও অধিক হইয়া থাকে। *

কাঁঠালের ভুতুড়িই উহার সার, এজন্য বীজ পুতিবার সময় উহার সহিত কিয়ৎপরিমাণে ভুতুড়ি দিলে চারা তেজাল হয়। কাঁঠালের বীজের জীবনী-শক্তি (Vital power) অধিক দিন থাকে না, এজন্য কাঁঠাল হইতে বীজ বাহির করিয়া রোপণ করিতে অধিক বিলম্ব করা উচিত নহে।

কাঁঠালের জন্য এঁটেল জমির প্রয়োজন। বর্ষাকালে যে স্থানে জল দাঁড়ায় এরূপ স্থানে আদৌ উহা রোপণ করা উচিত নহে। গাছের গোড়ায় জল দাঁড়াইলে কাঁঠাল গাছ মরিয়া যায়।

পাঁচ বৎসরের কমে গাছে কাঁঠাল ফলিতে দেওয়া উচিত নহে। গাছ পুতিয়া অল্পদিন মধ্যেই ফলভোগ করিতে সকলেই ইচ্ছা করেন কিন্তু অল্পবয়স্ক গাছে ফল হইতে দিলে গাছ শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে কাঁঠাল বাগানে হলচালনা করিয়া পরে

* Firminger' Manual of Gardening.

প্রত্যেক গাছের গোড়া খুঁড়িয়া সার দিতে হয়। প্রত্যেক গাছের যতদূর ব্যাপিয়া শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হইয়া থাকে ততদূর ব্যাপিয়া উহার চারিদিক উত্তমরূপে খুঁড়িয়া মাটি চূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। তদনন্তর উহাতে যাহা কিছু ঘাস খড় থাকে, তাহা একবারে বাছিয়া ফেলিয়া দেওয়া চাই। কাঁঠালের পক্ষে খৈল সার প্রশস্ত। পচা খড় ও অশ্বশালার আবর্জনা সমভাগে মিলিত করিয়া দিলেও চলে। গাছ বেশ তেজাল থাকিলে কোন সার দিবার আবশ্যক হয় না, বরং দিলে ফল ফাটিয়া যায় এবং ফলের কোমলতা ও সৌরভ নষ্ট হয়।

গাছে যদি ফল ফাটিয়া যাইতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে উহাকে নিস্তেজ করিবার জন্য গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া বাজে শিকড় কতকগুলি কাটিয়া দিলে ফল আর ফাটে না। বর্ষাকালে ঐরূপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া গর্ত্ত করিয়া রাখিলে তাহাতে জল জমিতে পারে এবং তাহাতে গাছ মরিয়া যাইবারও আশঙ্কা আছে, সুতরাং সে সময়ে যদি ফল ফাটিতে থাকে, তাহা হইলে বৃক্ষের স্থানে স্থানে অস্ত্রাঘাত করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। অস্ত্রাঘাতদ্বারা গাছের গাত্র দিয়া অনেক রস নির্গত হইয়া যায় এবং তন্নিবন্ধন তেজ হ্রাস হইয়া থাকে। আম্রের ন্যায় ইহার গাত্রে আব বা গাঁট জন্মিলে তাহা কাটিয়া দিতে হয়।

অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত গাছে ফুল ধরিয়া থাকে ফুলের সুগন্ধে স্থান আমোদিত হয়। বাস্তবিক ইহার ফুলের গন্ধ জহরী চাঁপা (Magnolia pumila) বা কাঁঠালী-চাঁপার ন্যায়। মাটির ভিতরেও ইহার ফুল ফল হয় ইহা জানিয়া রাখিবার বিষয়।

চৈত্র বৈশাখ মাসে এঁচোড় খাইবার সময়। বৈশাখ মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত কাঁঠাল পাকিয়া থাকে। শাখাপ্রশাখা অপেক্ষা মূল কাণ্ড বা গুঁড়িতে যে ফল জন্মে, তাহা অধিক পরিপুষ্ট ও সুমিষ্ট হয়। আবার মাটির ভিতরে যে ফল জন্মে, তাহা অধিকতর মিষ্ট ও পুষ্ট হয়। মাটির ভিতরে কাঁঠাল জন্মিলে প্রথমাবস্থায় জানিতে পারিবার কোন উপায় নাই, কিন্তু ফল পাকিলেই মাটির উপরিভাগ ফাটিয়া যায় এবং তাহার ভিতর হইতে সুগন্ধ বাহির হয়। তখন উহাকে মাটি খুঁড়িয়া তুলিয়া লইতে হয়।

শৃগাল ইহার পরম শত্রু। কাঁঠাল পাকিলেই উহারা দলে দলে আসিয়া কাঁঠাল চুরি করিয়া লইয়া যায়। অধিক কি, উহারা কাঁধাকাঁধি করিয়া গাছে উঠে এবং ফল পাড়ে। এতদ্ব্যতীত চোরেও অনেক চুরি করে। কাঁঠাল চুরির ন্যায় অন্য কোন ফল চুরি সহজ নহে, কারণ ইহার গুঁড়িতে অনেক কাঁঠাল ফলে, সুতরাং উহা পাড়িতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। যাহা হউক, কাঁঠাল রক্ষা করিবার জন্য গাছে ফল ধরিলেই গোড়া বেষ্টন করিয়া তালপাতা, কুলের কাঁটা প্রভৃতি উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিতে হয়।

গাছের আকার ও বয়ক্রম অনুসারে এক একটী গাছে একশত হইতে পাঁচ-ছয় শত কাঁঠাল ফলিয়া থাকে। সুপক্ক কাঁঠালের আকার ও গুণ অনুসারে মূল্যের তারতম্য হয়। সচরাচর যে সকল কাঁঠাল সাধারণ লোকে খাইয়া থাকে, তাহা শতকরা ১১৲। ১২৲ টাকায় বিক্রয় হয় এবং বড় ও ভাল জাতীয় ৩০৲ হইতে ৪০৲ টাকাতেও বিক্রয় হয়। ইহা পাইকারী দর। খুচরা

দরে এক একটা বড় ও ভাল কাঁঠাল এক টাকা বা পাঁচসিকা দামে বিক্রয় হয়।

খাজা কাঁঠালের গাত্র সহজ এবং পাকিলেও ঈষৎ সবুজ থাকে। উহার কোয়া চিবাইয়া খাইতে ভাল। নেয়ো কাঁঠালের গাত্র কাঁটাবিশিষ্ট এবং পাকিলে বিবর্ণ হইয়া যায়। ইহার কোয়া অতিশয় কোমল, রসপূর্ণ ও সুমিষ্ট। ঘন দুগ্ধ বা ক্ষীরের সহিত নেয়ো কাঁঠালের রস অতি উপাদেয়। কাঁঠাল অতি গুরুপাক ফল। অধিক খাইলে অসুখ হইবার সম্ভবনা। কাঁঠাল খাইয়া ঈষৎ লবণ খাইলে উহা শীঘ্র পরিপাক হইয়া যায়।

অনেকের বিশ্বাস, কাঁঠালের কলম হয় না। বর্ষাকালে কাণ্ডের গাত্র হইতে ত্বক-সমেত ফেঁকৃড়ি লইয়া যথা নিয়মে পালন করিলে নূতন চারা উদ্গত হয়। ফেঁকৃড়ি অঙ্গুলি সদৃশ স্থূল হওয়া প্রয়োজন।

কাঁঠাল গাছে নানাবিধ পোকা লাগিয়া বড় ক্ষতি করে। ইহার প্রধানতঃ দুইজাতীয় পোকা দেখিয়াছি, ১ম,—কৃমিজাতীয় অতি ক্ষুদ্র ; এবং ২য়,—পক্ষবিশিষ্ট পতঙ্গজাতীয়। ইহারা গাছের ত্বক ভেদ করিয়া কাষ্ঠে প্রবেশ করে এবং ক্রমশঃ কাষ্ঠের ভিতর ফোঁপরা করিয়া দেয়, গাছ তাহাতে মরিয়া যায়। পোকা লাগিলে গাছের কাণ্ড বা শাখা হইতে শোনিত সদৃশ লোহিত বর্ণের রস নির্গত হইতে থাকে। গাছে এইরূপ লোহিত দাগ দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে, গাছে পোকা লাগিয়াছে। উক্ত পোকার নাম 'গাড়ার' (Cerambycidœ longicorn)। ইহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্ত পিচকারী সাহায্যে গরম জল সেই ক্ষত স্থলে বারবার দিতে হইবে।

কাঁঠাল বীচি শুষ্ক করিয়া রাখিয়া দিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত এবং অসময়ে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা পোড়া, সিদ্ধ ও তরকারীতে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। আমার মনে হয়, কাঁঠাল বীচি পেষণ করিয়া আটা প্রস্তুত করিলে দুর্ভিক্ষের দিনে অনেক কাজে লাগিতে পারে। তাহা ব্যতীত আরও মনে হয়, কাঁঠাল বীচির গুঁড়া সাগু, আরোরুট ও বার্লির ন্যায় শিশু ও রোগীর আহার বা পথ্যে ব্যবহার হইলেও হইতে পারে। কাঁঠালের বীজ অতি পুষ্টিকর, কিন্তু শেষোক্তরূপে ব্যবহার হইতে পারে কিনা, তাহা চিকিৎসা-শাস্ত্র-ব্যবসায়ীরা বলিতে পারেন। যদি গুরুপাক না হয়, তবে কেন যে উহা ঐরূপে ব্যবহার হইতে পারে না, তাহা বলিতে পারি না। *

কাঁঠালের কাষ্ঠ ঘন শিরাবিশিষ্ট, উজ্জ্বল, দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং মূল্যবান্। গাছ যত পুরাতন হয়, কাষ্ঠ তত মজবুৎ ও কঠিন হয়। ইহাতে বার্ণিশ মাখাইলে মেহগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হয়।

---

* "An excellent flour is made from the seeds. The flour is prepared in the same manner as that of arrowroot flour-making The only additional work is to put the seeds (not dried) after peeling into well boiled water and for a short time. Then proceed in the same manner in which arrow root is prepared. When the seed is being pounded it gives off a smell bad enough to make one feel disgusted to go on with the work. With the flour should be used an admixturet of sugar, eggs, milk and a little salt. Made into biscuits they are exceedingly palatable and nice. Mayflower, December. 1893.

কাঁঠাল কাঠে টেবিল, চেয়ার বাক্স, সিন্দুক, আলমারি প্রভৃতি অনেক জিনিস নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

বিলিম্বি

AVERRHOA BILIMBI

বিলিম্বি পূর্ব্ব-উপদ্বীপ ও মলক্কসের গাছ। দাক্ষিণাত্যেও বিস্তর জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে বিলিম্বি গাছ অতি অল্পই দেখা যায়, কিন্তু এক্ষণে অনেকে বাগানে রোপণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিলিম্বি গাছ প্রায় ৩০।৩৫ ফুট উচ্চ হয় এবং সেই অনুপাতে কাণ্ডও স্থূল হইয়া থাকে। ফলগুলি দুই তিন ইঞ্চ লম্বা হয়। তেলাকুচা ফলের ন্যায় উহার আকার বটে, কিন্তু বর্ণ তত ঘন সবুজ নহে। সুপক্ক ফল অতি কোমল এবং গাত্র তৈলাক্ত, আঙ্গুরের ন্যায় মসৃণ। কাঁচা ফলের আস্বাদ অতিশয় টক, এজন্য অম্বল অথবা চাটনী ভিন্ন অন্য কোনরূপে ব্যবহার করা অসম্ভব। সুপক্ক ফল মাখনের ন্যায় নরম এবং আস্বাদ অম্ল-মধুর।

মাঘ মাসে গাছে থোকা থোকা ফুল ধরে এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ফল পাকিয়া থাকে।

সুপক্ক ফলের বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিতে হয়। বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে [illegible] করিতে হয়। হাল্কা মাটিপূর্ণ গামলায় বীজ পুঁতিয়া যথানিয়মে চারা উৎপন্ন করিতে হইবে। বীজ হইতে চারা জন্মিতে ২০।২৫ দিন সময় লাগে।

চারাগুলি তিন চারি অঙ্গুলি বড় হইলে এক একটী ছোট টবে এক একটী করিয়া চারা পুতিয়া দিতে হইবে অথবা হাপোরেও স্থানান্তর করিলে চলিতে পারে। গাছগুলি অন্ততঃ দুই বৎসরের না হইলে স্থায়ীরূপে জমিতে রোপণ করা উচিত নহে। বর্ষা কাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ছোট ছোট চারাগুলি এরূপ স্থানে রাখিতে হইবে যে, গাছে ঠাণ্ডা না লাগিতে পারে অথচ তথায় উত্তাপ ও বাতাস যথেষ্ট থাকে। ইহার পাট সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিয়ম নাই, তবে সাধারণ নিয়মে তদ্বির করিলেই চলিবে।

আমড়া

SAPONDIAS MANGIFERA

Hog plum

সত্ত তরুণীর না হইলেও আমড়া অতি উপাদেয় ফল বাগানে দুই একটী রাখিতে ক্ষতি নাই। অম্বল, চাটনী, আচার প্রভৃতি অনেক জিনিসে আমড়া ব্যবহার হয়। বাগানের কোন নিভৃত অংশে আমড়া গাছ রোপণ করা উচিত কারণ শীতকালে ইহার সমুদয় পাতা ঝরিয়া গিয়া বাগানের শ্রী নষ্ট করে।

বীজে ইহার চারা উৎপন্ন হয়। পূর্ব্ববৎসরের শাখা রোপণ করিলেও চারা হয়। গাছের বিশেষ তদ্বির করিতে হয় না, কারণ ইহা যেখানে-সেখানে আপনা হইতেই জন্মিয়া থাকে। পৌষ-মাঘ মাসে আমড়া গাছ মুকুলিত হয়, তখন গাছে পাতা

থাকে না। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে গাছে ফল হয় এবং ভাদ্র, আশ্বিন মাসে তাহা পাকিয়া থাকে।

বিলাতি আমড়া

Spondias dulcis

ওটেহীট এবং ফ্রেণ্ডলী দ্বীপে ইহার স্বাভাবিক জন্মস্থান কিন্তু এক্ষণে এদেশে অনেক জন্মিয়াছে। ইহার পাকা ফল অতি মুখপ্রিয়। রন্ধন করিয়া যে অম্বল হয়, তাহাও মন্দ লাগে না। সুপক্ক ফলের সৌরভ অতি মনোহর।

আমড়ার চারার সহিত ইহার কলম বাঁধিলে চারা উৎপন্ন হয়, তাহা ছাড়া বীজেও চারা জন্মিয়া থাকে। সময়ে সময়ে গাছের গোড়া পরিষ্কার করিয়া এবং মাটি কোপাইয়া দেওয়া ভিন্ন বিশেষ কোন পাট নাই। আষাঢ় হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত জমিতে গাছ রোপণ করিবার সময়।

কামরাঙ্গা

AVERRHOA CARAMBOLA

Kamrach

ইহার গাছের পাতা ছোট ছোট এবং গাছ ঘন পত্রবিশিষ্ট বলিয়া বাগানের শ্রীবৃদ্ধিকারক। ইহার ফুলের বর্ণ দুধে-গোলাপী।

ফলের আকার লম্বা ও পল বা খাঁজবিশিষ্ট। সুপক্ক ফলের আঘ্রাণ মিষ্ট। কাঁচা ফল অতিশয় টক্ কিন্তু পাকিলে অপেক্ষাকৃত মিষ্ট হইয়া থাকে।

বীজ ও গুটী কলমে ইহার চারা জন্মিয়া থাকে। বর্ষাকালে গাছ রোপণ করিবার সময়। দো-আঁশ মাটিবিশিষ্ট উচ্চ জমিতে ইহা ভাল জন্মে। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে গাছের গোড়া কোপাইয়া দিবে এবং সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে। জ্যৈষ্ঠ মাসে ফল পাকিয়া থাকে।

ইহার অন্য এক জাতির নাম 'চীনে কামরাঙ্গা'। দেশী হইতে ইহার ফল ছোট এবং পাকা ফলের বর্ণ ঘন সবুজ। দেশী কামরাঙ্গায় অম্লভাগ অধিক থাকে কিন্তু ইহা তত টক্ নহে, বরং মিষ্ট কিন্তু উহার ন্যায় সুগন্ধ বিশিষ্ট নহে। দেশীর সহিত ইহার জোড় বাঁধিলে কলম হইয়া থাকে। বর্ষাকালে গাছ রোপণ করিতে হয়।

বেল

ÆGLE MARMELOS

বেল গাছ হিন্দুদিগের নিকট অতি পবিত্র। ইহার পত্রে দেবসেবা হয়। দেশ বিশেষে ইহার ফলের আকার ছোট বা বড় হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ও দো-আঁশ মাটিতে যে গাছ জন্মে তাহার ফল বড় হয়। মুরসিদাবাদে বেলের আকার বড় হইয়া থাকে। দারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত দলসিং সরাই নামক স্থানের

বেল আকারে যেমন সুবৃহৎ হয়, শাঁসও তেমনি মধুর। বেল ওজনে অর্দ্ধ পোয়া হইতে ৪।৫ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বড় অপেক্ষা মধ্যমাকার বেলের স্বাদ ভাল।

৮.৭ দো-আঁশ মাটির সহিত পাতা-সার মিশ্রিত করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে হাপোর করিয়া বর্ষাকালে বীজ 'পাত' দিতে হয়। চারাগুলি একহাত পরিমাণে উচ্চ হইলে স্থায়ীরূপে ক্ষেত্রে রোপণ করা উচিত। দো-আঁশ গভীর মাটিতে ইহা ভাল জন্মে। গাছের গোড়ায় আগাছা জঙ্গল জন্মিলে অথবা কাণ্ডে ছোট ছোট শাখা জন্মিলে কাটিয়া দেওয়া উচিত। গোড়ায় জঙ্গল থাকিলে অথবা কাণ্ডে ঐরূপ সরু কেঁকড়ী থাকিলে গাছের অবস্থা ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং তাহাতে যে ফল জন্মে তাহার আস্বাদ মন্দ হয়, আকার ছোট হয়। গাছের গোড়ায় যে সকল কেঁকড়ী জন্মে, তাহা শিকড় সমেত উঠাইয়া লইতে পারিলে চারা হইতে পারে।

৮.৮ যে বেলের মধ্যে শাঁস অধিক এবং বীজ ও আটা কম তাহাই ভাল ফল। গ্রীষ্মকালে ইহার সরবত অতি উপাদেয় হয়। বিসূচিকা প্রভৃতি অনেক রোগে বেল ঔষধের কার্য্য করে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার ফল পাকিবার সময়।

কৎবেল বা কয়েৎবেল

FERONIA ELEPHANTUM

Wood Apple

এ দেশে ইহা জঙ্গলের গাছ মধ্যে গণ্য কিন্তু ইহার সুপক্ব অম্ল-মধুর ফল অতিশয় মুখপ্রিয়। ইহাতে অতি উপাদেয় চাট্‌নী হইয়া থাকে। কৎবেলের আকার প্রায় গোল, খোলা বা আবরণ শক্ত ও খসখসে এবং বর্ণ ধূসর। মাঘ-ফাল্গুন মাসে গাছে ফল ধরে এবং তাহা মাস নাগাইত পাকিতে আরম্ভ হয়। পাটের বিশেষ নিয়ম নাই। বীজে ইহার চারা জন্মে। বর্ষাকাল বীজ বপনের সময়।

চাল্‌তা

DELINIA SPECIOSA

চাল্‌তা গাছের আকার বৃহৎ এবং পাতাগুলি প্রায় নয় ইঞ্চ লম্বা চারি হইতে পাঁচ ইঞ্চ চওড়া হয়। গাছের আকার শোভাময়। চাল্‌তা নামে যে ফল ব্যবহৃত হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহা ফল নহে, বীজ কোষের আবরণ বা ফুলমাত্র। ইহার ফুল অতিশয় শুভ্রবর্ণের এবং তাহার আকার ৬ ইঞ্চ ব্যাসবিশিষ্ট। গাছে ফুল ফুটিলে উহার অপূর্ব্ব শোভা হইয়া থাকে। ফলের জন্য না হইলেও শোভার জন্যও এ গাছ উদ্যানে রাখা যাইতে পারে।

কচি অবস্থায় ইহাতে অম্বল হয়, তখন তাদৃশ টক্ রস থাকে না, কিন্তু পাকিলে অতিশয় টক্ হয়, তখন উহার সহিত মিষ্ট না দিলে খাওয়া সুকঠিন। চিনি সংযুক্ত চাল্‌তার অম্বল অতিশয় তৃপ্তিজনক। পাকা চাল্‌তার সুন্দর আচার প্রস্তুত হইয়া থাকে। আচার প্রস্তুত করিবার প্রণালী গৃহস্থ মহিলাগণ ভালরূপই জানেন, এজন্য আমরা আর সে বিষয়ে অনধিকার চর্চ্চা করিব না।

আষাঢ় মাসে গাছে ফুল হয় এবং ভাদ্র আশ্বিন মাসে ফল পাকিয়া থাকে। বাগানের সাধারণ জমীতেই চালতা গাছ রোপণ করিলেই চলিবে। বীজ হইতে চারা জন্মে।

আতা

ANONA SQUAMOSA

Custard apple.

আতা গাছের আদি বাসস্থান এসিয়া কি আমেরিকা খণ্ডে, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। নানা যুক্তি দ্বারা সেণ্ট হিলেয়ার (St. Hilaire) সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ইহার স্বাভাবিক জন্মস্থান এসিয়া। কিন্তু ডাক্তার ভইট (Dr. Voight) বলেন ইহা আমেরিকার উদ্ভিদ। ডাক্তার এণ্ডারসন সহেব, সেণ্ট হিলেয়ারের মত পোষণ করেন। যাহা হউক, বাঙ্গালা দেশে ইহা বনে জঙ্গলে এবং পাহাড়ে প্রচুর জন্মে।

আতা গাছ ৬।৭ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। ইহার ফলগুলি দেখিতে অতি মনোহর এবং আস্বাদ ততোধিক। সুপক্ক আতার ন্যায় আর কোন সুমিষ্ট ফল আছে কিনা সন্দেহ। ইহা খাইতে যেমন সুমিষ্ট, সরস ও কোমল, তেমনি ইহার আঘ্রাণও মধুর। সুপক ফলের শাঁস এতই নরম ও আল্‌গা যে হাতে করিয়া তুলিতে গেলে পড়িয়া যায়।

সুপক্ক ফলের গাছ হইতে চারা উৎপন্ন হয়। গাছ অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া ফল ধারাণাপযোগী হয়। চারি বৎসরেই গাছে ফল ধরে। বর্ষাকালে বীজ পাত দিয়া যথানিয়মে চারা উৎপন্ন করিয়া পর বৎসর বর্ষাকালে স্থায়ীরূপে জমিতে রোপণ করিতে হইবে। সাধারণ দো-আঁশ মাটিতে গাছ পুতিতে হইবে। ফল শেষ হইয়া গেলে গাছ ছাঁটিয়া দিবে। যত দিন না প্রথম ফলন হয়, ততদিন গাছ ছাঁটা উচিত নহে। শীতকালে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া পুরাতন গোবর-সার দিতে হয়। ফসলের সময় গাছে জল সেচন করিতে পারিলে ফল ভাল হয়।

কাক, পক্ষী, কাটবিড়াল প্রভৃতি অনেক জন্তুতে ইহার ফল নষ্ট করে। এজন্য ফলনের সময় গাছে জাল চাপা দেওয়া কিম্বা চট্‌ বা কাপড় দ্বারা প্রত্যেক ফল বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

সাহেবগঞ্জের পাহাড়ে স্বভাবতঃ বিস্তর আতা গাছ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু তাহার ফল অতি নিকৃষ্ট হয়।

নোনা

ANONA RETICULATA

Bullock's Heart

হিন্দিতে ইহাকে রাম-ফল কহে। প্রকৃতপক্ষে নোনা, আতার জাতিবিশেষ, কিন্তু আস্বাদ ও আঘ্রাণে আতা অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। নোনার আকারও প্রায় আতার ন্যায় কিন্তু উহার গাত্র সহজ অর্থাৎ আতার ন্যায় খাঁজবিশিষ্ট বা বন্ধুর নহে।

বীজেই ইহার চারা জন্মে। বিশেষ কোন পাট করিবার আবশ্যক হয় না, তবে সময়ে সময়ে গাছের গোড়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া এবং মাটি কোপাইয়া দেওয়া উচিত। নোনা গাছের ছাল জলে ভিজাইয়া কাচিলে আঁশ বাহির হয়। উক্ত আঁশ বেশ মজবুদ হয় এবং তাহাতে কাগজ তৈয়ারি হয় ও বেড়া বাঁধিবার উপযোগী দড়ি প্রস্তুত হয়।

ফলগুলি পাকিবার সময় সমাগত হইলে গাছে জাল দেওয়া ভাল, কেননা তাহা হইলে কাক, পক্ষী, বাদুড় বা কাটবিড়াল আর ফল নষ্ট করিতে পারে না।

আলুবোখারা

PRUNUS BOKHARENSIS

Bokhara plum

পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশ ও আফগানস্থান অঞ্চলে আলুবোখারার স্বাভাবিক স্থান। তাহা ব্যতীত হিমালয় অন্তর্গত স্থান সমূহে ইহা প্রচুর জন্মে এবং উত্তম ফল প্রদান করে। সেই সকল স্থান হইতে অন্যান্য স্থানে শুষ্ক আলুবোখারা আমদানী হইয়া থাকে এবং সে সকল ফল চাটনীতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ মেওয়া ফল-বিক্রেতাগণ ইহা বিক্রয় করিয়া থাকে। বাঙ্গালা ও বেহারে কোন কোন সৌখীনের বাগানে আলুবোখারার বৃক্ষ আছে কিন্তু কুত্রাপি ফল হইয়াছে তাহা শুনি নাই। ইহার আবাদ প্রণালী নাশপাতীর ন্যায়।

কাশীর-কুল

BENERAS PLUM

যুক্ত-প্রদেশের কুল, কাশীর কুল নামে সুপরিচিত। কাশীর কুল বাঙ্গালার দেশী-কুল এবং নারিকেলী-কুল হইতে স্বতন্ত্র ফল। কাশীর কুলের আকার অনেকটা ঢোলকের ন্যায় ঈষৎ লম্বা এবং উভয় পার্শ্ব চাপা। কাশীর কুল অধিক পাকিলে

তত সুস্বাদ হয় না কিন্তু পূর্ণ ডাঁশা অবস্থায় অতি মুখপ্রিয়।

ফাল্গুন মাসে চোক ও চোঁও কলম করিতে হয়। তদর্থে দেশী-কুলের চারা ব্যবহার্য্য। বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা যুক্ত প্রদেশাঞ্চলে ইহার ফল ভাল হয়। সেখান হইতে নানা দেশে,—বিশেষতঃ কলিকাতায়—ঝুড়ি-ঝুড়ি কুল আমদানী হয়। সে দেশের স্বাভাবিক কুল হইলেও গ্রীষ্মকালে তথায় গাছে প্রচুর জল সেচন করিতে হয়।

মাঘ-ফাল্গুন মাসে নারিকেলী বা দেশী কুলের ন্যায় কাশীর কুল ছাটিয়া গোড়া পরিস্করণ, কুদ্দালন প্রভৃতি কার্য্যে মনোযোগ দিতে হয়। গাছে ফুলের আবির্ভাব হইলে জলসেচন কর্ত্তব্য।

নারিকেলী-কুল

ZIZYPHUS JUJUBA VAR. FRUCTO-OBLONGO

Baer

নারিকেলী কুলের পাট ও অন্যান্য কার্য্য দেশী কুলের ন্যায়, তবে ফসলের সময়ের বিভিন্নতা হেতু পাট করিবার স্বতন্ত্র সময় আছে। বর্ষাকালে গাছে ফুল হয় এবং শীতের প্রারম্ভে অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের শেষভাগ হইতে ফল ব্যবহারোপযোগী হয়। ফলের সময় উত্তীর্ণ হইলে দেশী কুলের ন্যায় নারিকেলী কুলের গাছ গুলিকে ছাটিয়া দিতে হয়। বিগত বৎসরে যে সকল মূল শাখা উদগত হইয়াছে তাহাদিগের নিম্ন

ভাগের একহাত আন্দাজ রাখিয়া উপরিভাগ কাটিয়া দিতে হইবে এবং মাটি চূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। গাছ ছাঁটাই গোড়া কোপান প্রভৃতি কার্য্য মাঘ মাসে শেষ করিতে হয়।

যে যে উপায়ে দেশীয় কুলের চারা উৎপন্ন করা গিয়া থাকে ইহার পক্ষেও তাহাই নিয়ম। চোক, চোঙ্গ, বা জোড় কলম করিতে হইলে দেশীয় কুলের চারার সহিত বাঁধিতে হয়। ফাল্গুন মাসে কলম বাঁধিবার উত্তম সময়।

নারিকেলী কুলের আবাদ লাভজনক। সাহেব ও দেশীয় লোক—সকলেই ইহার আদর করেন। ইহা কুড়ি দরে বিক্রয় হইয়া থাকে।

দেশী-কুল

ZIZYPHUS VULGARIS

Baer

দেশী-কুলের অপভ্রংশ কথা দিশি কুল। ইহার দুইটী জাতি দেখা যায়—একজাতির আকার গোল এবং অন্য জাতির আকার ঈষৎ লম্বা। স্থান ও পাটের বিশেষত্ব হেতু উহার আস্বাদ স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। দেশী-কুলে অম্লরসের প্রাধান্য অধিক। অযত্ন-পালিত গাছের ফল ছোট হয় এবং তাহার আস্বাদ যে কেবল টক্ হয় তাহা নহে, উহা একেবারেই রসনার অপ্রিয় হইয়া থাকে।

সাধারণ দো-আঁশ মাটিতেই কুল গাছ জন্মে। বীজ ও চোজ-কলমে ইহার চারা হয়। বীজোৎপন্ন চারার প্রকৃতি অতিশয় শীঘ্রই পরিবর্দ্ধিত হইয়া যায়, এইজন্য গাছের স্বভাব ঠিক রাখিবার জন্য কলম করা আবশ্যক।

বর্ষাকালে যথানিয়মে কোন স্থানে বীজ পাত দিয়া চারা উৎপন্ন করিতে হয়। চারাগুলি অন্ততঃ দুই বৎসরের হইলে তাহাতে জোড় বাঁধিতে অথবা চোজ বসাইতে হয়। কুলগাছের মূল কাণ্ড ও গোড়া হইতে অনেক ফেঁকড়ি বাহির হয়, এজন্য চারা গাছের গোড়া ঘেঁসিয়া জোড় বাঁধিতে অথবা চোজ বসাইতে হইবে। জোড় বা চোজের নিম্নাংশ হইতে কাণ্ডে যে, শাখা-প্রশাখা জন্মিবে তাহা কাটিয়া দেওয়া আবশ্যক। ফাল্গুন মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত চোক ও চোজ কলম বাঁধিবার উপযুক্ত সময় এবং জোড় কলম আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বাঁধা যাইতে পারে।

কুলের ক্ষেত করিতে হইলে ১০।১২ হাত অন্তর একটী গাছ পুঁতিতে হয়। গাছ যতদিন না মাটির সহিত উত্তমরূপে সংলগ্ন হয়, ততদিন উহাতে যথানিয়মে জলসেচন করা আবশ্যক। চারি বৎসরের মধ্যেই গাছে ফল ধরে। ফল শেষ হইয়া গেলে অর্থাৎ চৈত্র মাসে গাছ ছাঁটিয়া দিতে হয়। মূলকাণ্ডটী রাখিয়া যাবতীয় শাখা কাটিয়া দেওয়াই রীতি। এরূপ করিলে গাছে নূতন শাখা প্রশাখা উদগত হইয়া উত্তম ফল ধারণ করে, কিন্তু গাছ না ছাটিয়া দিলে ফলন অধিক হয় কিন্তু ফল ছোট হয়। এই সময় হইতে যাবৎ না বর্ষা আগত হয় তাবৎকাল গাছে উত্তমরূপে জলসেচন করিবে। কার্ত্তিক মাসে গাছের আবার অনুসারে

দুই হাত হইতে চারিহাত ব্যাপিয়া গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিবে এবং ২০।২৫ দিবস গাছের গোড়া খুঁড়িয়া রাখিয়া পুনরায় মাটি চাপা দিবে। এই সময়ে মাটির সহিত সার মিশাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। পুষ্করিণীর মাটি দিলেও চলিতে পারে।

লম্বা ও গোল ফলের গাছ চিনিবার সহজ উপায় পাতা দৃষ্টে। লম্বা ফলের গাছের পাতা ঈষৎ লম্বা এবং গোল জাতির পাতা গোলাকার প্রায় হয়।

বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কুল আকারে বড় হয় এবং তাহা খাইতেও সুস্বাদ। পশ্চিমে-কুলের সাধারণ নাম কাশীর কুল। ইহার ফল বড় উত্তম।

আঙ্গুর বা দ্রাক্ষা

VITIS VINIFERA

Grape Vine

ভারতবর্ষের নানাস্থানে নানা জাতীয় আঙ্গুর জন্মিয়া থাকে এবং তাহার মধ্যে কিস্‌মিস, মনক্কা, হোঁসানা ও মক্কা নামক কাশ্মীরের কয়েকটী জাতীয় আঙ্গুর অতিশয় উৎকৃষ্ট। আরঙ্গাবাদে একজাতীয় আঙ্গুর জন্মে, তাহার ফলের বর্ণ মশিবৎ কিন্তু খাইতে অতি সুস্বাদ, ভিতরের বর্ণ—পিত্তের ন্যায়। দৌলতাবাদে ইহার প্রভূত আবাদ হইয়া থাকে এবং নানাদেশে বিক্রয়ার্থ চালান হয়।

আফগানিস্থানে প্রচুর আঙ্গুর জন্মে এবং তথাকার ব্যবসায়ীগণ শীতকালে ভারতের নানাদেশে বিক্রয়ার্থ তাহা প্রেরণ করে। শীতপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশের গাছ বঙ্গদেশে ভাল জন্মে না। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি ইয়ুরোপের অনেক দেশে উৎকৃষ্ট জাতীয় আঙ্গুর জন্মে এবং এক্ষণে ভারতের অনেক স্থানে তাহা জন্মিতেছে। কিন্তু ইহার প্রকৃতি এতই পরিবর্ত্তনশীল যে, একদেশ হইতে অন্যদেশে লইয়া গেলে পূর্ব্বের প্রকৃতি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

আঙ্গুর,—লতিকাজাতীয় উদ্ভিদ। বৃহৎ লতা গাছ জাফরী বা মাচায় উঠিয়া প্রতি শাখা প্রশাখায় থলো থলো ফল ধারণ করে। সমস্ত দিবস যে স্থানে রৌদ্র থাকে এরূপ স্থান অপেক্ষা যে স্থানে বৈকালে ঈষৎ ছায়া পড়ে, এরূপ স্থানে আঙ্গুর গাছ রোপণ করিতে পারিলে ভাল হয়। ভারতের সকল স্থানের জলবায়ু সমান নহে, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ফলে বিশেষত্ব আছে। উত্তর-পশ্চিম ও পঞ্জাব অঞ্চলের আঙ্গুরের যেরূপ আস্বাদ, পূর্ব্ব বঙ্গ-বা-আসামজাত ফলে তদ্রূপ হয় না, তাহার কারণ শেষোক্ত স্থানের আবহাওয়া নিতান্ত সর্দ্দিময়। সর্দ্দিময় স্থানের আঙ্গুর সুপক্ক হইতে পারে না এবং তাহা অম্লাস্বাদবিশিষ্ট হইয়া থাকে। বাঙ্গালা ও আসাম দেশে যেমন উৎকৃষ্ট আঙ্গুর জন্মিতে পারে না, তদ্রূপ দাক্ষিণাত্যেও সহজে জন্মে না।

আঙ্গুরের জন্য হালকা ও দো-আঁশ মৃত্তিকাবিশিষ্ট উচ্চ জমিই প্রশস্ত। বর্ষাকালে জমিতে কোনমতে জল দাঁড়াইতে না পারে এজন্য সর্ব্বাগ্রে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া পরে মৃত্তিকা সংস্কারে হস্তক্ষেপণ করা উচিত। মাটি নিতান্ত চটচটে বা এঁটেল

হইলে তাহাতে প্রচুর সার মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে। জমি উত্তমরূপে কোপাইয়া মৃত্তিকা চূর্ণ করতঃ মাটির সহিত সমূহ পরিমাণে সার মিশাইতে হইবে। সাত বা আট হাত অন্তর করিয়া গাছ রোপণ করিতে হয়।

আঙ্গুরের পক্ষে পচা খৈল, পুরাতন গোবর, গলিত আবর্জ্জনা, অস্থিচূর্ণ এবং সোরা স্বতন্ত্রভাবে বা কয়েকটী একত্র মিশ্রিত করিয়া যে সার প্রস্তুত হয় তাহা অতি উৎকৃষ্ট। পচা মাছ, মৃত প্রাণী কষাইখানার রক্ত প্রভৃতিও আঙ্গুরের উৎকৃষ্ট সার। সার ইতি-পূর্ব্বে উত্তমরূপে পচাইয়া গাছের গোড়ায় দেওয়া উচিত, নতুবা গাছের গোড়ায় পোকা লাগিতে পারে।

আঙ্গুর গাছে প্রচুর জল আবশ্যক করে। অতএব যাহাতে উহার ক্ষেত্রে সেঁচ চলিতে পারে এজন্য পয়নালা কাটিয়া রাখা আবশ্যক। আর যেখানে দুই চারিটী গাছ রোপণ করিতে হইবে তথায় পয়নালার পরিবর্ত্তে গাছের গোড়ায় থালা বা মাদা করিয়া দেওয়া উচিত। পয়নালা হউক আর মাদা হউক, বর্ষা-রম্ভে তাহাতে মাটি দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত নতুবা গাছের গোড়ায় অতিরিক্ত জল সঞ্চিত হইয়া গাছকে মারিয়া ফেলে।

ডাল (Cutting) কলমে সহজেই আঙ্গুরের চারা জন্মিয়া থাকে। উক্ত কলমের জন্য সুপুষ্ট নীরোগ ও অর্দ্ধপক্ব বা পূর্ব্ব বৎসরের শাখা নির্ব্বাচন করতঃ দুই তিনটী চোক বা গাঁট সমেত এক একটী কলম কাটিতে হইবে। বর্ষা উত্তীর্ণ হইলে অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে ডাল কলম রোপণ করিতে হয়। ঈষৎ ছায়াবিশিষ্ট স্থানে হাপোর করা যুক্তিসঙ্গত। এই হাপোরের মাটিতে কিঞ্চিৎ

চরের বালি মিশ্রিত করিয়া দিতে পারিলে অল্পদিন মধ্যেই কলমে শিকড় জন্মিয়া থাকে। হাপোর মধ্যে নয় ইঞ্চ ব্যবধানে এক একটী কলম পুতিতে হইবে। এই কলম পর বৎসর বর্ষার প্রারম্ভে স্থায়ীরূপে রোপণ করিতে পারা যায়। দাবা কলমেও চারা হয়। বর্ষাকালে দাবা করিতে হয়।

যে স্থানে গাছ রোপণ করিতে হইবে সে স্থানটী একহাত গভীর করিয়া খনন করতঃ উহার মাটি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সেই মাটির সহিত গোয়াল বা অশ্বশালার আবর্জ্জনা মিশাইয়া কলমটি পুতিয়া দিবে এবং মধ্যে মধ্যে গাছের প্রয়োজন বুঝিয়া জল সেচন করিবে। পীচ গাছ রোপণ করিবার সময় যেমন তাহার তলায় টালি পাতিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে, আঙ্গুর গাছ রোপণ করিবার সময় ঐরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয় কারণ তাহা হইলে উহার শিকড় মৃত্তিকাভ্যন্তরে অধিক দূর প্রবেশ করিতে না পারিয়া উপরিভাগেই প্রসারিত হইয়া থাকে। ইহাতে স্বভাবতঃই অধিক ফল জন্মিয়া থাকে। তাহা ছাড়া অতি সহজে উহাদিগের পাট করা যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, দ্রাক্ষা গাছ,—লতানিয়া সুতরাং তাহার অবলম্বনের জন্য জাফরী বা মাচা করিয়া দেওয়া উচিত। গাছে যত শাখাপ্রশাখা জন্মিবে ততই তাহাদিগকে যত্ন সহকারে মাচায় সংলগ্ন করিয়া দিতে হইবে। মাচায় উঠিয়া শাখাপ্রশাখা পরস্পর জড়াইয়া না যায় এজন্য সময়ে সময়ে গাছের ডগাগুলি এদিক-সেদিকে সরাইয়া পাতলা করিয়া দিতে হয়। ভূমি হইতে মাচান পর্য্যন্ত কাণ্ডাংশে কোন শাখা বা কেঁকড়ি থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। উক্ত অংশ এক-কাণ্ডবিশিষ্ট হইলে

কাণ্ড স্থূল হয়, ফলতঃ গাছ খুব বিস্তৃত হয় এবং তাহাতে ফল অধিক হয়।

পৌষ মাসে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া শিকড় বাহির করিয়া পনর দিবস এইরূপ অবস্থায় রাখিয়া দিতে হয়। এইরূপে কিছু দিবস শিকড় বাহির করা থাকিলে গাছের পাতাগুলি আপনা হইতেই প্রায় খসিয়া পড়িয়া যায়। এইবার গাছটিকে ছাঁটিয়া দিতে হইবে। অন্যান্য গাছ ছাঁটিবার জন্য যে নিয়ম অবলম্বিত হইয়া থাকে ইহার পক্ষেও তাহাই। রুগ্ন ও শীর্ণ শাখাগুলিকে একবারে কাটিয়া ফেলিতে হয়। যে সকল শাখা ফল ধারণ করিয়াছিল এবং পূর্ব্ব বৎসরের শাখা সমুদায়কে অল্প পরিমাণে ছাঁটিয়া দিতে হয় প্রতি শাখার দুই-তিনটী মাত্র গ্রন্থি রাখিয়া উপরিভাগ কাটিয়া দেওয়া নিয়ম। নূতন শাখাপ্রশাখাগুলি একবারে কাটিয়া ফেলিয়া গাছ পাতলা করিয়া দিবে। পরে, গাছে নূতন শাখাপ্রশাখা বাহির হইলে তাহাদিগকেও ঈষৎ পরিমাণে ছাঁটিয়া দিতে হয়। কিন্তু উক্ত নূতন শাখা সকলকে যদি না ছাঁটিয়া স্বভাবতঃ বাড়িতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে গাছে প্রচুর ফল জন্মে, বটে, কিন্তু তাহা অতি নিকৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা ব্যতীত গাছও দুর্ব্বল ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে। অযত্নরক্ষিত গাছ সকল এইরূপে খারাপ হইয়া যায়। সখ করিয়া অনেকে উদ্যানে ইহা রোপণ করেন বটে, কিন্তু উপযুক্ত তদ্বির না করায় উহা অল্পদিন মধ্যেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

যদি কোন গাছ হতাদর হেতু শ্রীহীন, ঘন ও রুগ্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে উত্তমরূপে ছাঁটিয়া পাতলা করিয়া দিতে হইবে। আবশ্যক বুঝিলে, কেবল মাত্র কাণ্ডের অল্পাংশ

রাখিয়া অবশিষ্ট সমুদায় শাখাপ্রশাখা কাটিয়া ফেলিলে কোন ক্ষতি না হইয়া বরং তাহাতে নূতন শাখা নির্গত হইয়া উহাকে সুশ্রী ও ফলবতী করিয়া থাকে।

গাছে অধিক শাখাপ্রশাখা থাকিলে ফল বড় হইতে পারে না, এজন্য রুগ্ন, শীর্ণ ও অনাবশ্যকীয় শাখাগুলি একেবারে ছাটা আবশ্যক। প্রতি শাখায় একটী কিম্বা দুইটী ফলের থলো থাকিতে দিলে ফল বড় হয়। গাছটী যত পুরাতন হইতে থাকিবে তত তাহার পুরাতন শাখাগুলি ক্রমে কাটিয়া দিতে হইবে এবং তাহা হইলে নূতন শাখায় ক্রমশঃ ফল ধরিতে থাকিবে। একই শাখাপ্রশাখায় পুনঃ পুনঃ ফল ধারণ করিতে দিলে ফল তত বড় বা অধিক হয় না, গাছটী অবসন্ন হইয়া পড়ে। পুরাতন মূল ডাল-পালাগুলিকে যত্ন সহকারে রক্ষা করিতে হইবে।

এক প্রকার কীট আঙ্গুর গাছের বিষম শত্রু। ইহারা একবার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে সমুদায় আঙ্গুর গাছগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলে। গাছ এইরূপে কীটাক্রান্ত হইলে গাছটিকে একবারে গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিয়া দেওয়া এবং সেই কীটাক্রান্ত কর্ত্তিত গাছটিকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

আঙ্গুর গাছ যত পুরাতন হইতে থাকে ততই তাহা বহুদূর ব্যাপী হয় এবং তাহতে ফলও সমধিক পরিমাণে জন্মিতে থাকে। অতএব অবিশ্রান্ত ফল পাইতে হইলে প্রথমবারের রোপিত গাছগুলি ৪।৫ বৎসরের হইলে দ্বিতীয়বার গাছ রোপণ করিলে প্রথমবারের গাছ মরিয়া যাইবার পূর্ব্বেই দ্বিতীয়বারের গাছ ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করিবে। দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ

দ্রাক্ষালতা যদি না মরিয়া যায় তাহা হইলে এক একটী লতা সুদীর্ঘকাল—এমন কি শতাধিককাল জীবিত থাকিয়া রাশি রাশি ফল প্রদান করিয়া থাকে।

গত ১৩০৮ সাল হইতে রাজনগরের বাগানে আমি আঙ্গুর রোপণ করি। পর বৎসর হইতেই তাহাতে ফল হইতেছিল। প্রথম বৎসরেই প্রত্যেক গাছে ২৫।৩০টা করিয়া থলো জন্মে. ফাল্গুন চৈত্র মাসে গাছে ফুল ধরে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ফল পাকিয়া উঠে। পুরাতন গাছের ফলন অধিক হয়।

মাদার বা বড়াল

ARTOCARPUS LACOOCHA

দেশ বিশেষে মাদারকে 'ডেও' বা ডেফল কহে। বাঙ্গালা দেশে ইহা সহজেই জন্মিয়া থাকে। ফলের আকার প্রায় গোল কিন্তু অসমতল। কাঁচা অবস্থায় গাঢ় সবুজবর্ণ থাকে এবং পাকিলে ফিকে আলতাবর্ণ ধারণ করে। আস্বাদ,—অম্ল-মধুর এবং মুখরোচক। ফলন,—পর্য্যাপ্ত, কিন্তু লোকে ইহাকে তাদৃশ আদর করে না; সুতরাং, গাছের অধিকাংশ ফলই তলায় পড়িয়া নষ্ট হয়।

বীজ হইতে চারা জন্মিয়া থাকে এবং বর্ষাকালে বীজ পুতিতে হয়। সচরাচর বৃক্ষাদি পালনের যাহা নিয়ম, ইহার জন্য তদ্ব্যতীত অধিক বা স্বতন্ত্র কিছু নাই। পৌষ বা মাঘ মাসে

করমচা

CARISSA CORANDAS

Caranda

করমচা বৃক্ষ অধিক উচ্চ হয় না, সাধারণতঃ ৬।৭ হাত উচ্চ হয় কিন্তু পার্শ্বদেশে ৫।৬ হাত প্রসারিত হয়। শাখা প্রশাখা কণ্টকাকীর্ণ এবং ঘন বলিয়া চৌহদ্দীর পার্শ্বে রোপণ করিলে উত্তম বেড়া হইতে পারে। ফল অতি মনোহর। আকার প্রায় ডিম্বাকৃতি বা গোল দেশী কুলের ন্যায়। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ফল পাওয়া যায়। ইহার আস্বাদ অম্লবহুল। নানাবিধ আচার ও চাটনী প্রস্তুত করিবার পক্ষে উত্তম ফল। ফল রন্ধন করিলে অম্বল হইতে পারে। বর্ষাকালে পাকা করমচা বাজারে আমদানী হয়।

সাধারণ সরস মাটিতে বর্ষাকালে ফেকৃড়ি রোপণ করিয়া কিম্বা বীজ পুতিয়া চারা উৎপন্ন করিতে হয়। ইহার বিশেষ কিছু পাট নাই।

পানিয়ালা

FLACOURTIA CATAFRACTA

পানিয়ালা ফল তীব্র টক্, ইহাতে আচার ও চাটনী প্রস্তুত হয় এবং রন্ধন পূর্ব্বক অম্বল করিয়া খাইতে পারা যায়। জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে শ্রাবণ-ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত ফল পাকিয়া থাকে।

বর্ষাকালে ফেঁকৃড়ি বা ডাল কাটিয়া কিম্বা দাবা করিয়া কলম উৎপন্ন করিতে হয়।

তেঁতুল

TAMARINDUS INDICA

Imli

সংস্কৃত ভাষায় তেঁতুলকে তিন্তিড়ী কহে এবং ইংরাজীতে Tamarind কহে। দাক্ষিণাত্যে, বিশেষতঃ মান্দ্রাজ ও মহিশূরে তেঁতুলের যথেষ্ট আদর। সকল তরকারিতেই প্রচুর তেঁতুল সংযোজিত না হইলে তথাকার অধিবাসীগণ তৃপ্তিলাভ করে না।

যত্ন করিয়া বাগান মধ্যে তেঁতুল গাছ পুঁতিতে কাহাকেও প্রায় দেখা যায় না। যেখানে সেখানে বীজ পড়িলেই আপনা হইতে গাছ জন্মে। গভীর ও এঁটেল মাটিতে ইহা ভাল থাকে। তেঁতুল গাছের হাওয়া অত্যন্ত দূষিত, এজন্য বাসস্থানের নিকটে আদৌ রোপণ করা উচিত নহে। তেঁতুল-গাছের কেহ বড় একটা কোন পাট করে না, কিন্তু যথানিয়মে পাট করিলে ফলে অধিক শাঁস জন্মে এবং তাহা মিষ্ট হয়। মৃত্তিকা ও যত্নের তারতম্যানুসারে ফলের আস্বাদের ইতরবিশেষ হয়।

আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে গাছে ফুল ধরে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ফল পাকিয়া থাকে।

তেঁতুলের অন্য এক জাতি আছে তাহাকে লাল-তেঁতুল কহে। শেষোক্ত তেঁতুলের খোসা লাল হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন উভয় তেঁতুলে কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না।

ইহার বীজ পেষণ করিলে তৈল নির্গত হয়। উক্ত তৈল জ্বালানী কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে।

ফল্‌সা

GREWIA ASIATICA

ইহার ফল অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং বীজ বড় ও শাঁস অল্প। এই জন্য ইহার বিশেষ আদর নাই, কিন্তু ফলের স্বাদ,—অম্লমধুর ও মুখরোচক। চেষ্টা ও যত্ন করিয়া শাঁসের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং বীজের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট করিতে পারা যায়। বীজে ও কলমে চারা জন্মে। গ্রীষ্মকালে ফল পাকিয়া থাকে। ইহার ফলের সরবৎ অতি উপাদেয় হইয়া থাকে।

ব্রেড-ফ্রুট

ARTOCARPUS INCISUS

Bread fruit

'ব্রেড ফ্রুট' শব্দটি ইংরাজী এবং ফলও বিদেশী, সুতরাং বাঙ্গালা ভাষায় ইহার কোন নাম নাই। কিন্তু গাছ ব্যবসায়ীগণ সাধারণের কৌতূহল উদ্দীপনের জন্য হউক বা ইহার একটী বাঙ্গালা নাম হওয়া আবশ্যক মনে করিয়াই হউক 'ব্রেড-ফ্রুট' শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন—'রুটি ফল'। অনুবাদ ঠিকই হইয়াছে কিন্তু ব্যক্তি, বস্তু, বৃক্ষলতা বা স্থান বিশেষের নাম অনুবাদ করায় সাহিত্যের পরিপুষ্টি না হইয়া বরং একটা বিভ্রাট ঘটে।

উক্ত বৃক্ষের স্বাভাবিক জন্মস্থান ব্রহ্মদেশ, পূর্ব্ব উপদ্বীপ খবদ্বীপও মরিচসহর। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে একণে আমদানী হইয়াছে, কিন্তু দুই এক স্থান ব্যতীত কুত্রাপি ফল হইতে দেখা বা শুনা যায় নাই। ইহার ফল কাঁঠালের ন্যায়, কিন্তু খাইতে কিরূপ গ্রন্থকারের সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই, তবে শুনা যায় যে, ফল অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া শাঁস খাইতে রুটির ন্যায়। কলিকাতার ম্যাঙ্গো লেনে (Mango Lane) এবং স্থকিয়া ষ্ট্রীটে লাহা বাবুদিগের বাড়ীর উত্তর-পশ্চিম কোণে বৃহৎ 'ব্রেড ফ্রুট' গাছ আছে। আজ কালের নূতন বাগানে কেহ কেহ উক্ত বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন।

বীজে চারা জন্মে। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক চাপা এরূপ স্থানে গাছ ভাল থাকে। গাছের পত্র সকল প্রায় এক হাত লম্বা এবং দৈর্ঘ্যে আধ হাত হয়।